সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্ব্বিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৪

চতুর্ব্বিংশ ভাগের সূচীপত্র

Printed by—R. C. Mitra at the Visvakosha Press.
9 Visvakosha Lane, Baghbazar, Calcutta.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য

স্বীকার্য্যটি এই ;—

"যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেচ্ছ পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।"

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বীকার্য্য এবং দশম স্বতঃসিদ্ধকে একই তথ্যের অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে। তবে প্রথম স্বীকার্য্য ও দশম স্বতঃসিদ্ধের তাৎপর্য্য—অর্থাৎ, দুই বিন্দুর মধ্যে সরল রেখা অঙ্কনে আমাদের সামর্থ্য এবং দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া একাধিক সরল রেখা অঙ্কনে অসামর্থ্য, যেরূপ যথাক্রমে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধেও তদ্রূপ দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে উক্ত সরল রেখার পরিবর্দ্ধনে সামর্থ্য আলোচিত হইবে।

এই স্বীকার্য্যটিতে সমতলের কোন উল্লেখ নাই। অথচ এই স্বীকার্য্যের প্রয়োগকালে মানিয়া লওয়া হয় যে, সরল রেখাটি যে সমতলে অবস্থিত, সেই সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, সরল রেখার সহিত সমতলের কি সম্পর্ক, তাহা জানা আবশ্যক।

ইউক্লিড সমতলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়াছেন ;—

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় সরল রেখা পরস্পরের সহিত সোজাভাবে অবস্থান করে, তাহাকে সমতল বলে।

এই সংজ্ঞা কোন স্পষ্ট অর্থই প্রকাশ করে না। অপিচ অন্য প্রতিজ্ঞার প্রমাণ-কালেও এই সংজ্ঞাদ্বারা কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। তজ্জন্যই অধুনা সমতলের সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যে তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল রেখা সর্ব্বতোভাবে উক্ত তলে অবস্থিতি করে, তাহাকে সমতল বলে।

নিয়মিত তল মাত্রেরই অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সমরেখা সেই তলে অবস্থিত থাকে। সরল রেখা মাত্রই সমরেখা এবং তদনুযায়ী নিয়মিত তলই সমতল। অতএব

যে কোন সরল রেখা তদনুযায়ী সমতলে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি করিবে। সুতরাং উপর্য্যুক্ত সংজ্ঞার স্থলে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাই যথেষ্ট।

যে নিয়মিত তলের সমরেখা সরল রেখা, তাহাকে সমতল বলে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সরল রেখা মাত্র সমতলেরই সমরেখা। ইহাই সমতল ও সরল রেখার মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক।

সমরেখা মাত্রই হয় সরল রেখা, নয় বৃহৎ বৃত্তের কোন অংশ। অতএব সমরেখার সহিত তৎসংলগ্ন সমরেখার যোগে,—অর্থাৎ উক্ত সরল রেখার সহিত তৎসংলগ্ন সরল রেখার যোগে অথবা বৃহৎ বৃত্তের সহিত তৎসংলগ্ন বৃহৎ বৃত্তের অপর অংশযোগে,—যে সমরেখা জন্মে, তাহাই প্রথমোক্ত সমরেখার বর্দ্ধনে উৎপন্ন সমরেখা। অতএব দ্বিতীয় স্বীকার্য্যটিকে নিম্নলিখিতরূপে আরও ব্যাপক করা যাইতে পারে।

যে কোন সমরেখাকে, উহা যে নিয়মিত তলে অবস্থিত, তাহার মধ্য দিয়া, উভয় মুখে নিয়মিত রেখার পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

একটি সমরেখা তাহার সংলগ্ন সমরেখা-যোগে পরিবর্দ্ধিত সমরেখায় পরিণত হয়। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা,—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা (অর্থাৎ সরল রেখা) বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ কোন বিশেষ সীমা (limit) অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত নিয়মিত রেখার অংশ মাত্রই সমরেখা নামের যোগ্য। অতএব একটি সমরেখা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তাহা উক্ত সীমা পর্য্যন্ত সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং তৎপরেও বর্দ্ধিত হওয়া সম্ভবপর হইলে তাহার নিয়মিত রেখার দৈর্ঘ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। সরল রেখা যতই বর্দ্ধিত হউক, মানব-বুদ্ধিতে তাহা সরল রেখারূপেই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু পরিবর্দ্ধিত বর্ত্তুল রেখা যে উক্ত অনুবন্ধ অতিক্রম করিতে পারে, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষের গোচর। ইহাই দ্বিতীয় স্বীকার্য্য এবং ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের অর্থ প্রসার করিয়া আমি যে তথ্যে উপনীত হইয়াছি, ইহা সেই তথ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ সরলরেখা ও বর্ত্তুলরেখা এই সম্বন্ধে উভয় তথ্যই সম্পূর্ণরূপে সমরেখার সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত। এরূপ অবস্থায় উক্ত স্বীকার্য্যের কোন আবশ্যকতাই থাকিতে পারে না।

ইউক্লিডের সরল রেখা সীমাবদ্ধ। তজ্জন্যই তিনি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে উহার পরিবর্দ্ধন আবশ্যক মনে করিয়া দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা যখন পূর্ব্ব হইতেই সরল রেখার পরিমাণ অসীম ধরিয়া লইয়াছি এবং ইউক্লিডের মতানুযায়ী সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে তাহার অংশ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তখন সরল রেখার পরিবর্দ্ধনের আবশ্যকতা আমাদের পক্ষে আদৌ থাকিতেছে না।

সমরেখা মাত্রই বর্দ্ধিত হইলে তদনুযায়ী নিয়মিত তলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইবে এবং সরল রেখার বৃদ্ধিও তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই ঘটিবে। সরল রেখার পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে এই প্রকারের সীমা ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই প্রতিপাদনের পূর্ব্বে যে যে স্থলে দ্বিতীয় স্বীকার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে, সর্ব্বত্রই এই তথ্যটি বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, বলিতে হইবে। অর্থাৎ ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্যে সমতলের উল্লেখ না থাকিলেও এই কথাটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, সরল রেখামাত্র তদনুযায়ী সমতলের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইউক্লিড সামতলিক জ্যামিতির আলোচনায় প্রায় সর্ব্বত্রই সমতলের অস্তিত্ব ধরিয়া লইয়াছেন, স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই।

এক্ষণে সরল রেখার পরিবর্দ্ধনক্রিয়া সমতলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখার জন্য একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞাটি কি প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, দেখা যাউক।

ঐ প্রতিজ্ঞাটি ও তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ সেই সমতলের বহির্দ্দেশে থাকিতে পারে না।
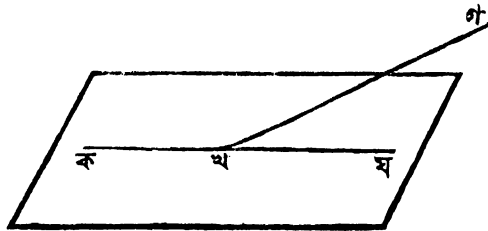
কারণ, যদি সম্ভব হয়, মনে কর, **ক খ গ** সরল রেখার **খ গ** অংশ উক্ত সমতলের বহির্দ্দেশে রহিয়াছে।

তাহা হইলে **ক খ** সরল রেখায় বর্দ্ধনে উৎপন্ন অপর একটি সরল রেখা উক্ত সমতলের অভ্যন্তরে থাকিবে।

মনে কর, ইহা **খ ঘ**।

অতএব **ক খ গ** ও **ক খ ঘ** এই দুইটি সরল রেখার সাধারণ অংশ **ক খ**।

তাহা অসম্ভব। কারণ, যদি আমরা **খ** বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া **ক খ** ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করি, তাহা হইলে সেই বৃত্তের ব্যাসদ্বয় পরিধিকে অসমান ভাবে ছিন্ন করিবে।

অতএব একটি সরল রেখার একাংশ একটি সমতলের অভ্যন্তরে থাকিলে অপরাংশ উক্ত সমতলের বহির্দ্দেশে থাকিতে পারে না।"

খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া অঙ্কিত বৃত্তের পরিধি যে ব্যাসদ্বয় দ্বারা অসমান ভাবে ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হইল, সেই ব্যাসদ্বয় নিশ্চয়ই ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখার অংশ। তবেই স্বীকার করিতে হইবে, খ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এবং ক খ সরল রেখাকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় যে, তাহা ক খ গ ও ক খ ঘ এই দুই সরল রেখার অংশকে ব্যাস করিতে পারে। কিন্তু বৃত্ত সামতলিক ক্ষেত্র। অতএব ক খ গ ও ক খ ঘ এই সরল রেখাদ্বয় একই সমতলে অবস্থান করিতেছে, ইহা স্বীকার করাই হইয়াছে।

এই স্বীকৃত তথ্যটি সূত্রাকারে এই রূপ গ্রহণ করিবে ;—

দুইটি সরল রেখা সংলগ্ন থাকিলে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

ঐ প্রথম প্রতিজ্ঞার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি এই ;—

"যদি দুইটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তবে তাহারা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে ; অপিচ তিন সরল রেখায় যে ত্রিভুজ জন্মে, সেই ত্রিভুজও একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।"

এই প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত পূর্ব্বোক্ত স্বীকৃত তথ্যের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। অথচ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি যে উক্ত তথ্যের সাহায্যে প্রতিপাদিত প্রথম প্রতিজ্ঞার পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে। ইহার প্রতিপাদনেও উক্ত প্রথম প্রতিজ্ঞাটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

কোন দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু থাকিলেই সেই রেখাদ্বয়কে পরস্পর সংলগ্ন বলা হয়। এই সাধারণ বিন্দু উক্ত রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটির আরব্ধি, সমাপ্তি, অথবা অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতে পারে। আমরা সরল রেখাকে অসীম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। আমাদের মতে কোন সরল রেখারই আরব্ধিও নাই, সমাপ্তিও নাই। অতএব দুইটি সরল রেখা পরস্পর সংলগ্ন হইলে, সাধারণ বিন্দু, তাহাদের উভয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবে। দুইটি রেখার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিন্দু উভয়েরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইলে রেখাদ্বয় পরস্পরকে হয় স্পর্শ করিবে, নয় ছিন্ন করিবে। আমরা জ্যামিতিক অভিজ্ঞতা হইতে অবগত আছি যে, সরল রেখাদ্বয় তদবস্থায় পরস্পরকে ছিন্ন করিয়াই থাকে। অতএব উক্ত স্বীকৃত তথ্যটিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের সহিত অভিন্নই ধরিতে হইবে।

কিন্তু ইউক্লিড সর্ব্বত্রই সরল রেখাকে সান্ত আকারে রাখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সরল রেখার পরিমাণ সান্ত রাখিয়া উক্ত স্বীকৃত বিষয়টিকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র আকার দেওয়া যায় কি না, দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা সরল রেখাদ্বয়কে অন্তর্ব্বর্ত্তী বিন্দুতে সংলগ্ন করিয়াছি, এজন্য ঐ তথ্যটি ইউক্লিডের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতে অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন কিন্তু উহাদিগকে প্রান্ত বিন্দুতে সংলগ্ন রাখিয়া সূত্র গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে।

"ইউক্লিডের প্রথম স্বীকার্য্য" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, "কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি কণিকা কোন একটি বিন্দু হইতে অপর একটি বিন্দু পর্য্যন্ত যে পথে গমন করে, অন্য এক সময়ে সেই কণিকা সেই পথের পূর্ব্ববর্ত্তী বিন্দুকে পরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিন্দুকে পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া প্রথমোক্ত বিন্দুতে উপস্থিত হইতে পারে।" অর্থাৎ যে কোন রেখার আরব্ধিকে সমাপ্তি এবং সমাপ্তিকে আরব্ধিরূপে ধরিতে পারা যায়। সাধারণতঃ রেখা মাত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী বিন্দু সেই রেখার আরব্ধি ও সমাপ্তি হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যে সকল রেখার দুইটি মাত্র বিন্দু আরব্ধি ও সমাপ্ত হইতে পারে, তাহাদের উক্ত বিন্দুদ্বয়কে ঐ বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিন্দুকে প্রান্ত-বিন্দু বলা যাইবে।

তাহা হইলে, উক্ত তথ্যটি এই রূপ গ্রহণ করিবে।

দুইটি সরল রেখা কোন প্রান্ত-বিন্দুতে মিলিত হইলে একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

এই প্রতিজ্ঞাটি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার অনুরূপ বটে। অপিচ, ইহা উক্ত প্রথম ভাগ হইতে সহজে বোধগম্যও নহে। এমন অবস্থায় ইহাকে স্বতঃ-সিদ্ধরূপে না ধরিয়া উক্ত ভাগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার পক্ষে আরও একটি গুরুতর আপত্তি আছে।

ইউক্লিড-দত্ত প্রমাণটি এই;—
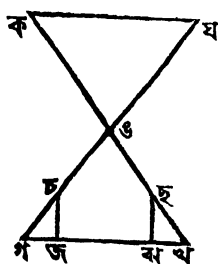
কারণ, "মনে কর, ক খ ও গ ঘ দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিতেছে।

আমি বলি যে, ক খ ও গ ঘ একই সমতলে অবস্থিতি করিবে; এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

কারণ, ঙ গ ও ঙ খ এর অন্তর্ভুক্ত চ ও ছ যে কোন দুই বিন্দু গ্রহণ কর।

এবং চ জ ও ছ ঝ দুইটি সরল রেখা টান।

আমি প্রথমে বলি যে, ঙ গ খ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কারণ, যদি ঙ গ খ ত্রিভুজের অংশ চ গ জ অথবা ছ খ ঝ এক সমতলে অবস্থিত

থাকিয়া অপর অংশ অন্য সমতলে অবস্থিতি করে, তবে ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখার একাংশ এক সমতলে অবস্থিত থাকিয়া অপরাংশ অন্য সমতলে অবস্থিত থাকিবে।

কিন্তু যদি ঙ গ খ ত্রিভুজের চ গ খ ছ অংশ এক সমতলে এবং অপরাংশ অন্য সমতলে অবস্থিত হয়,

তাহা হইলে ঙ গ ও ঙ খ উভয় সরল রেখার একাংশ এক সমতলে ও অপরাংশ অপর সমতলে অবস্থিতি করিবে।

কিন্তু উহা অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। [১১—১

অতএব ঙ গ খ ত্রিভুজ একই সমতলে অবস্থিত।

কিন্তু ঙ গ খ ত্রিভুজ যে সমতলে অবস্থিত, ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখার প্রত্যেকেই সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে;

এবং ঙ গ ও ঙ খ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, ক খ ও গ ঘ সরল রেখাও সেই সমতলে অবস্থিত থাকিবে। [১১—১

অতএব ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিত থাকিবে, এবং প্রত্যেক ত্রিভুজ এক সমতলেই অবস্থিত থাকিবে।"

এই প্রমাণে "ত্রিভুজ মাত্রই একসমতলে অবস্থিতি করিবে" ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য চ গ জ অথবা ছ খ ঝ ত্রিভুজ সমতলে অবস্থিতি করে, ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু উক্ত রূপ প্রমাণের পূর্ব্বে এরূপে মানিয়া লওয়ার ক্ষমতা কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আধুনিক জ্যামিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় প্রতিজ্ঞাই অন্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রথম প্রতিজ্ঞার প্রমাণ অনেকটা ইউক্লিডের অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে,—

সমতলটিকে ক খ ঘ সরল রেখার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিয়া গ বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা হইয়াছে; দেখান হইয়াছে যে, ক খ গ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করায় (প্রথম অধ্যায়ের একাদশ প্রতিজ্ঞার অনুমানের সাহায্যে দুই সরল রেখার সাধারণ অংশ থাকা অসম্ভব হওয়ায়) ক খ গ ও ক খ ঘ সরল রেখাদ্বয়ের ক খ সাধারণ অংশ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ এই;—
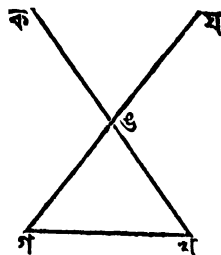
"ক খ ও গ ঘ দুইটি সরল রেখা ঙ বিন্দুতে ছেদ করিতেছে এবং গ খ সরল রেখা ক খ ও গ ঘ সরল রেখার সহিত যথাক্রমে খ ও গ বিন্দুতে সংলগ্ন হইয়াছে। তাহা হইলে—

(১) ক খ ও গ ঘ এই দুই সরল রেখা এক সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(২) ক খ, গ ঘ ও খ গ এই তিন সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(১) মনে কর, ক খ সরল রেখা দিয়া একটি সমতল চালিত হইয়াছে।

এই সমতলকে ক খএর চতুর্দ্দিকে এরূপ ভাবে আবর্ত্তিত কর, যেন সমতলটি গ বিন্দু দিয়া চলিতে পারে।

তাহা হইলে, যেহেতু গ ও ঙ বিন্দু উক্ত সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব গ ঙ ঘ সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

অর্থাৎ ক খ ও গ ঘ সরল রেখা একই সমতলে অবস্থিতি করিবে।

(২) যেহেতু ক খ ও গ ঘ সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিত, খ ও গ বিন্দু সেই সমতলে অবস্থিত আছে।

অতএব খ গ সরল রেখাও উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

উল্লিখিত প্রমাণ দুইটি ইউক্লিডের প্রমাণ অপেক্ষা নিম্নলিখিত তিনটি কারণে উৎকৃষ্ট ;—

(১) প্রথম প্রতিজ্ঞায় এরূপ কোন তথ্যের সাহায্য লওয়া হয় নাই, যাহা পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞায় অন্তর্নিহিত।

(২) দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় যাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকেই প্রমাণের অবলম্বনরূপে ধরিয়া লওয়া হয় নাই।

(৩) ব্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে "বৃত্তমাত্রই ব্যাসদ্বারা দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয়" এই তথ্যটি নিতান্ত অস্পষ্ট ভাবে ও বিনা উল্লেখে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রমাণ কালে আবশ্যক হয় নাই, তজ্জন্যই ইদানীং উহাকে উক্ত সংজ্ঞা হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রমাণদ্বয়ে নিম্নলিখিত তথ্য তিনটি বিনা প্রমাণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

(১) যে কোন সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিতে পারিবে।

(২) উক্ত সরল রেখাকে স্থির রাখিয়া, উক্ত সমতলকে তাহার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করাইয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু দিয়া পরিচালিত করা যাইতে পারে।

(৩) কোন দুই বিন্দু এক সমতলে অবস্থিতি করিলে তাহার যোজক সরল রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করিবে।

নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা হইতেছে। কিন্তু বিশেষ কারণে পারম্পর্য্য ঠিক রাখা হইল না।

(৩) এই সত্যটি দশম স্বতঃসিদ্ধের অনুমানরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যেহেতু আধুনিক সংজ্ঞা (১ পৃঃ) অনুসারে সমতলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন দুই বিন্দুর যোজক সরল

রেখা উক্ত সমতলে অবস্থিতি করে, অতএব উক্ত স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে বিন্দুদ্বয়ের আর কোন যোজক সরল রেখা থাকা অসম্ভব।

সমতলের বাহিরে যে তদ্রূপ সরল রেখা থাকিতে পারে না, তাহাই এতদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব দশম স্বতঃসিদ্ধের এই প্রয়োগটি ঘন জ্যামিতির আলোচ্য বিষয়। আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে উক্ত তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা সমতল ও নিয়মিত তলের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছি। এ বিষয়ে ঘন-জ্যামিতিবিষয়ক আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে আর একটি আলোচনাও আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা খ চিহ্নিত তত্ত্ব। ঘন-জ্যামিতির দশম স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ক আলোচনার অবসর এখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। খ চিহ্নিত তত্ত্বটির আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধেই শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

(২) এই তথ্যে উক্ত আবর্ত্তন ব্যাপারটি উপরিপাতনের প্রকারান্তর মাত্র। কারণ, "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, কোন স্থান অন্যত্র চালিত হইতে পারে না। কোন স্থানের দ্রব্যকে অপর কোন স্থানের উপর পাতিত করার নামই প্রথমোক্ত স্থানকে শেষোক্ত স্থানের উপর পাতিত করা। সেইরূপ কোন স্থান আবর্ত্তন করিতেও পারে না। সমতলের আবর্ত্তনের অর্থে, কোন দ্রব্যকে আবর্ত্তন করিয়া এক সমতলে অবস্থিত কণিকা-সমষ্টিকে অপর সমতলের উপর পাতিত করাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত আবর্ত্তন ব্যাপারের পূর্ব্ব হইতেই সেখানে একটি সমতল অবস্থিতি করে। অতএব দ্বিতীয় তথ্যটিকে স্বীকার করার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত তথ্যটি স্বীকার করিতেই হইবে।

যে কোন সরল রেখা ও যে কোন বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।

তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় সমতলের আবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অর্থাৎ প্রথম প্রতিজ্ঞায় ক খ ঘ সরল রেখা ও গ বিন্দু এই উভয়ের এবং দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় ক খ সরল রেখা ও গ বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিয়াছে; এই কথাটি সমতল আবর্ত্তন না করিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহাতে প্রতিজ্ঞা দুইটিও আরও সহজে প্রতিপাদিত হয়।

আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণে উক্ত প্রবন্ধে উক্ত খ চিহ্নিত তত্ত্বের প্রয়োজন। খ তথ্যটি এই ;—

এক সমতলের অভ্যন্তর একটি সরল রেখাকে অপর একটি সমতলের অভ্যন্তরস্থিত আর একটি সরল রেখার উপরে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমোক্ত সমতলের পৃষ্ঠস্থিত যে কোন পার্শ্ব অপর সমতলের যে কোন পার্শ্বে রাখিয়া সমতল দুইটি মিলান যাইতে পারে।

এই সমতলদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থিত কেবল সরল রেখা দুইটিকে মিলান হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সরল রেখা দুইটিকে মিলাইলেই সমতল দুইটি মিলিত হয় না। তজ্জন্য ইহাদের অভ্যন্তরস্থিত আরও কিছু মিলান দরকার। ২৩শ ভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৬৮ পৃষ্ঠার চিত্রে **ক খ** ও **ক গ** সরল রেখাদ্বয় যথাক্রমে **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখাদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়াতেই ত্রিভুজ দুইটি অর্থাৎ সমতল দুইটি মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখা, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল যাইতে পারিবে। কিন্তু প্রথম তথ্যের অনুযায়ী যে যে সমতল **ঘ** ও **চ** বিন্দুর মধ্য দিয়া চলে, **ঘ চ** সরল রেখা তাহার যে কোনটিতেই অবস্থিত থাকিবে। সুতরাং "**ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখা এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিতে পারিবে" ইহা না বলিয়া কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, **ঘ ঙ** সরল রেখা ও **চ** বিন্দু, এই উভয়ের মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

দ্বিতীয় তথ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া যে নূতন আকারের তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা উক্ত **ঘ ঙ** ও **ঘ চ** সরল রেখার মধ্য দিয়া সমতল চলিবে। কিন্তু কয়টি সমতল চলিতে পারে, তাহার কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অথচ উপরে বলিয়াছি, উক্ত সমতলের সংখ্যা একটি মাত্র হইবে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, "দুই বিন্দু দিয়া একটি মাত্র সরল রেখা চলিতে পারে", সরল রেখা সম্বন্ধে ইহা ঠিক্ বলিয়াই যেরূপ **ক** চিহ্নিত তথ্যের অনুযায়ী একটি সরল রেখার সহিত সরল রেখাকে মিলান যাইতে পারে, তদ্রূপ সমতল সম্বন্ধেও এইরূপ আর একটি তথ্য আছে, যাহার নিমিত্ত **খ** চিহ্নিত তথ্য অনুসারে একটি সমতল আর একটি সমতলের সহিত মিলান যায় এবং এইরূপে পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় তথ্যে সমতলের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই নিম্নোক্ত তথ্যটি উৎপন্ন হইবে। যথা ;—

একটি সরল রেখা ও একটি বিন্দুর মধ্য দিয়া কেবল একটি সমতল চলিবে।

আমরা "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমান সমান বৃত্তের ধনু ও সমান সমান বর্ত্তুলের সমরেখা মিলিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে দুইটি বৃত্ত অথবা বর্ত্তুল সমান হইলেই তাহাদিগকে মিলান যায়। এই সমানতাই ধনু ও সমরেখাগুলি মিলাইবার হেতু। পুনশ্চ সরল রেখা মাত্রই এবং সমতল মাত্রই মিলিত হইতে পারে।

এক্ষণে "দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে যেরূপ সমতলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক জাতিতে এবং সমান সমান বর্ত্তুলে অবস্থিত সমরেখাগুলিকে এক এক জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত সমতলকে এক জাতির এবং সমান সমান যাবতীয় বর্ত্তুলাংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিলে **খ** চিহ্নিত তথ্যটি নিম্নলিখিতরূপে প্রসারিত হইবে।

এক জাতীয় দুইটি নিয়মিত তলের একটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখাকে অপরটির অন্তর্ভুক্ত একটি সমরেখার উপরে স্থাপন করিয়া প্রথমোক্ত নিয়মিত তলকে শেষোক্ত নিয়মিত তলের সহিত মিলান যাইতে পারে।

কোন বর্ত্তুলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখা তাহার সজাতীয় অপর বর্ত্তুলাংশের অভ্যন্তর-স্থিত সমরেখায় স্থাপন মাত্র বর্ত্তুলাংশদ্বয় মিলিয়া যাইবে। কিন্তু দুইটি সমতল মিলাইতে হইলে উক্ত স্থাপিত সমরেখা ব্যতীত আর একটি বিন্দু মিলান আবশ্যক। বর্ত্তুল হইতে সমতলের এরূপ প্রভেদ কেন উপস্থিত হয়, জানা আবশ্যক। আমরা ক্রমাগতই উপরিপাতনের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তদ্দ্বারা একটি নিয়মিত রেখা অপর নিয়মিত রেখার সহিত এবং একটি নিয়মিত তল অপর নিয়মিত তলের সহিত কোন্ অবস্থায় মিলিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্ত উপরিপাতন ক্রিয়ার বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ সকল অবস্থা পাওয়া যায় নাই। নিম্নে উপরিপাতন ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত বিরোধ খণ্ডন করা যাইতেছে।

গ ঙ ঘ
ক খ

ক খ একটি বৃহত্তর সরল যষ্টির উপরে **গ ঘ** একটি লঘুতর সরল যষ্টি মিলিতভাবে রাখা হইয়াছে। **গ ঘ** যষ্টিটি **ক খ** যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া **ক খ** যষ্টির উভয় প্রান্ত পর্য্যন্ত সরাইয়া আনা যায়। কিন্তু **গ ঘ** যষ্টির অন্তর্ভুক্ত একটি কণিকা **ক খ** যষ্টির একটি কণিকার সহিত ঙ বিন্দুতে সংযুক্ত রাখা গেল এখন আর **গ ঘ** যষ্টি **ক খ** যষ্টির সহিত মিলিত রাখিয়া সরান যায় না।

এইরূপে যদি **ক খ** ও **গ ঘ** কাটি দুইটি সরল যষ্টি না হইয়া সমান বৃত্তের ধনুর আকৃতি-বিশিষ্ট হয়, তবে তদ্দ্বারাও পূর্ব্বমত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

আমরা ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্য পাইতেছি,—

(ক) একটি স্থির নিয়মিত রেখার সহিত তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত রেখা মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে এই অবস্থা ঘটিলে শেষোক্ত নিয়মিত রেখাটিও স্থির থাকিবে।*

কোন স্থানে অবস্থিত কণিকা সমষ্টির চালনাকেই সেই স্থানের চালিত অবস্থা বলা যায়। যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে "স্থির" বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিতে পারি।
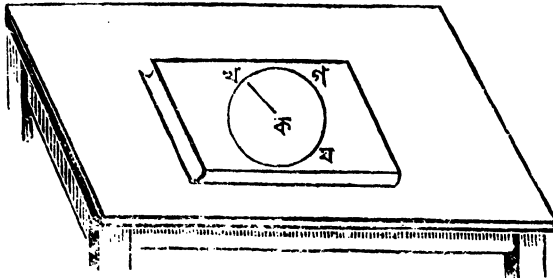
* একটি স্থানে অবস্থিত কণিকাসমষ্টির চালনাকেই উক্ত স্থানের চালিত অবস্থা ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় যে স্থান উক্ত প্রকারে চালিত হইতেছে না, তাহাকে "স্থির" বিশেষণ দ্বারা পৃথক্ করিতে পারি।

এই প্রকারে সমতল সম্বন্ধে পরীক্ষার নিমিত্ত একটি টেবিল ও একখানা পুস্তক গ্রহণ করা যাউক। ইহাদের উভয়েরই পার্শ্বদেশ সমতল।

টেবিলটি স্থিরভাবে আছে। ইহার উপরে একখানা পুস্তক রহিয়াছে। পুস্তকখানা টেবিলের পিঠের সহিত মিলিত রাখিয়া সর্ব্বত্রই সরাইতে পারা যায়।

পুস্তকের পিঠের একটি কণিকা টেবিলের পিঠের একটি কণিকার সঙ্গে **ক** বিন্দুতে সংযুক্ত রাখ।

এক্ষণে আর পুস্তকখানা সর্ব্বত্র সরান যাইবে না।

পুস্তকের পৃষ্ঠস্থ একটি কণিকা গ্রহণ কর।

মনে কর, কণিকাটি **খ** বিন্দুতে অবস্থিতি করে।

ক বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া **ক খ** ব্যাসার্দ্ধ লইয়া **খ গ ঘ** বৃত্ত অঙ্কিত কর।

পুস্তকখানা **ক** বিন্দুতে স্থির রাখিয়া নাড়িলে **খ** বিন্দুতে অবস্থিত কণিকা সর্ব্বদাই **খ গ ঘ** বৃত্তের উপরে থাকিবে।

উক্ত কণিকাটি **খ** বিন্দুতেই স্থিরভাবে রাখ।

এখন আর পুস্তকখানি নড়িবে না।

বর্ত্তুলাংশের উপরেও এইরূপ একই প্রকারের ক্রিয়া দেখান যায়। তবে উক্ত বিন্দুদ্বয় পরস্পর বিপরীত (diametrically opposite) হইলে কেবল সেই অবস্থাতে এই নিয়ম টিকিবে না।

ইহা হইতে এই তথ্য দুইটি পাওয়া যাইতেছে ;—

(খ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া যদি কোন একটি বিন্দুতে স্থির থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত তলটির অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন বিন্দু, স্থির বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া এবং স্থির বিন্দু হইতে সেই দ্বিতীয় বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল মাত্র সেই বৃত্তের যে কোন স্থানে চালিত হইতে পারিবে।

(গ) একটি স্থির নিয়মিত তলের সঙ্গে তাহার সজাতীয় অপর একটি নিয়মিত তল মিলিত হইয়া, পরস্পর বিপরীত নয়, এরূপ কোন দুই বিন্দুতে যদি সংযুক্ত থাকে, তবে সেই অবস্থায় শেষোক্ত নিয়মিত তলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

এইরূপে একটি ইষ্টক অথবা তৎসদৃশ কোন দ্রব্যের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাই ;—

(ঘ) ঘনক্ষেত্রের একটি বিন্দু স্থির থাকিলে, উক্ত ঘনক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত স্থির বিন্দুর দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ নিয়া এবং স্থির

বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া যে বর্ত্তুল আঁকা যায়, একমাত্র তাহার উপরেই অবস্থিতি করিবে।

(ঙ) ঘনক্ষেত্রের দুই বিন্দু স্থির থাকিলে, (১) স্থির বিন্দুদ্বয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত সরলরেখা স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে, (২) অপর যে কোন বিন্দু, তাহা হইতে উক্ত সরলরেখার উপর পতিত লম্বকে ব্যাসার্দ্ধ লইয়া এবং লম্বের পতন-বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া যে বৃত্ত অঙ্কিত হয়, কেবল সেই বর্ত্তুলের উপরেই অবস্থিতি করিবে।

উপরোক্ত অবস্থায় যে সমস্ত বিন্দু স্থির হয় নাই, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত একটিকে স্থির রাখিলেই ঘনক্ষেত্রটি স্থির হইয়া পড়িবে। অতএব—

(চ) এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দু স্থির থাকিলেই ঘনক্ষেত্র স্থিরভাবে অবস্থিতি করে।

যে কোন তলকে ও রেখাকে কোন না কোন ঘনক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতএব চ সত্যটি তল ও রেখার সম্বন্ধেও চলিবে।

সমতলের সমরেখা সরল রেখা, অতএব সমতলের অভ্যন্তরস্থিত একটি মাত্র সমরেখা স্থির থাকিলেই সমতলটি স্থির থাকিবে না। তজ্জন্য উক্ত সরল রেখার বহিঃস্থিত একটি বিন্দুকেও স্থির রাখা দরকার। কিন্তু বর্ত্তুলের অভ্যন্তরে সরল রেখার অবস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় উক্ত বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা কেন, যে কোন তিন বিন্দু স্থিরভাবে অবস্থিতি করিলেই বর্ত্তুলটি স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে।

১০ পৃষ্ঠায় সমতল ও বর্ত্তুলের মিলান সম্বন্ধে যে বিরোধের বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মীমাংসা হইল। কি সমতল, কি বর্ত্তুলাংশ, ইহাদের সম্মিলন সময়ে অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা মিলাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দু মিলাইলেই যথেষ্ট।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধের ক তথ্য অনুযায়ী দুইটি রেখা দুই বিন্দুতে সংযুক্ত রাখিয়া মিলান যায় কি না, তাহা পরীক্ষার প্রণালী উপরোক্ত গ তথ্য হইতেই পাওয়া যাইতেছে। যেহেতু দুই বিন্দু দ্বারা যখন একটি নিয়মিত তল স্থির রাখা যায়, তখন তদন্তর্ভুক্ত রেখাগুলিও স্থির রাখা যাইবে।

ক তথ্যটি যেরূপ সাধারণ রেখাসম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত হইয়াছে, খ তথ্যটিকেও সেইরূপ সাধারণ তলের সম্বন্ধে তথ্যরূপে পরিণত করা যায়। তাহাতে তথ্যটি এই দাঁড়াইবে ;—

একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুকে অপর একটি তলের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিন্দুতে স্থাপনপূর্ব্বক প্রথমোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত অথচ উক্ত বিন্দুর সঙ্গে

একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ অতি নিকটবর্ত্তী অপর দুইটি বিন্দুকে শেষোক্ত তলের অন্তর্ভুক্ত দুইটি বিন্দুতে স্থাপিত করা যায়।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, সমান সমান বৃত্তের ধনু দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে ধনু দুইটি মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থাতেই থাকিতে পারে। সমান সমান বর্ত্তুলের অংশও তিন বিন্দুতে সংলগ্ন হইলে তদ্রূপ মিলিত ও অমিলিত উভয় অবস্থায়ই থাকিতে পারে। কিন্তু দুইটি সরলরেখা যেরূপ দুই বিন্দুতে সংলগ্ন হইলেই পরস্পর মিলিয়া যায়, দুইটি সমতলও সেইরূপ এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ তিন বিন্দুতে মিলিত হইলেই পরস্পর মিলিয়া যাইবে।

ইহা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যটি দাঁড়াইতেছে ;—

এক সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত নয়, এরূপ যে কোন তিন বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি মাত্র সমতল থাকিতে পারিবে।

৮ পৃষ্ঠায় লিখিত "যে কোন সরলরেখা ও যে কোন বিন্দু এই উভয়ের মধ্য দিয়া একটি সমতল চলিতে পারিবে।" এই তথ্যটিকে উপরোক্ত তথ্যের প্রকার ভেদরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। অতএব ঐ উপরোক্ত তথ্যটি দ্বিতীয় তথ্যের শেষ পরিণতি।

একাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রতিজ্ঞার প্রমাণটি এই তথ্যের অনুমান মাত্র।

যেহেতু পরস্পর ছেদকারী সমতলদ্বয়ের ছেদ রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলি দ্বারা একাধিক সমতল চলিতে পারায় তাহারা একই সরল রেখার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ছেদ-রেখাটি সরলরেখা।

(১) এই তথ্য অনুসারে সরলরেখা মাত্রই কোন না কোন সমতলে অবস্থিতি করে। পুনশ্চ ১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, সমতলের পরিচয়ে সরল রেখার আবশ্যকতা। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি, সমতল ও সরলরেখা যথাক্রমে নিয়মিত তল ও সমরেখার বিশেষ জাতি। এমন অবস্থায় এই সাধারণ জাতির সাহায্যে উক্ত সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

নিয়মিত তল দুই জাতিতে বিভক্ত ;—সমতল ও বর্ত্তুল। সমতলের সহিত তাহার সমরেখা যে সরল রেখা,—তাহার কি সম্পর্ক, জানি না। কিন্তু বর্ত্তুলের সঙ্গে তাহার সমরেখা যে বর্ত্তুল রেখা, তাহার সম্পর্ক আমরা অবগত আছি। ইহা বর্ত্তুলের সমদ্বিখণ্ডকারক বৃত্তের অংশ।

আমরা সমতল ও সরল রেখার ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের কোন সম্পর্কই ধরিতে পারিতেছি না। উক্ত প্রথম সত্যে দেখিতেছি, সরলরেখা মাত্রই সমতলে অবস্থিতি করে। সুতরাং সরল রেখার পূর্ব্বে সমতলের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। কিন্তু যে নিয়মিত তলের সমরেখা

সরলরেখা নয়, তাহা সমতলই হইতে পারে না। সাধারণতঃ সমরেখা মাত্রই নিয়মিত তলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অতএব বিশেষ জাতি সমতল ও সরল রেখার এই সম্পর্ক সাধারণ জাতির অনুরূপ বটে। এক্ষণে সাধারণ জাতীয় নিয়মিত তলের সহিত সমতলের এই মাত্র ভেদ যে, ইহার সমরেখা সরলরেখা। তাহা হইলে সমতল ও সরল রেখার প্রকৃতি নির্ব্বাচন অপরাপর সমরেখার সহিত সরলরেখার ভেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সমরেখা মাত্রই সরলরেখা অথবা বৃহৎ বৃত্তের অংশ। অতএব এই বিশেষত্ব বৃহৎ বৃত্ত ও সরল রেখার পার্থক্য বই আর কিছুই নয়।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি,—"দেশ, সমতল ও বর্ত্তুলের সহিত যথাক্রমে সমতল, সরলরেখা ও বর্ত্তুল রেখার একই রকমের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে।" তদবস্থায় এই সম্পর্কদ্বারা, বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তকে, সমতলের অভ্যন্তর-স্থিত বৃত্ত হইতে সরলরেখাকে এবং দেশের অভ্যন্তরস্থিত বর্ত্তুল হইতে সমতলকে পৃথক্ করিতেছে। একই সম্পর্কদ্বারা সাধিত হওয়ায় পার্থক্যও একই প্রকারের হইবে। অর্থাৎ বৃত্তের সঙ্গে সরলরেখার যে পার্থক্য, বর্ত্তুলের সঙ্গে সমতলেরও সেই পার্থক্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৃহৎ বৃত্ত ও সরলরেখার পার্থক্যের অভিজ্ঞতার উপরে, সমতল ও সরলরেখা এই উভয় পদার্থের নির্ব্বাচন নির্ভর করে। সরলরেখা সমতলের এবং বৃহৎবৃত্ত বর্ত্তুলের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিয়মিত রেখা। অতএব উক্ত পার্থক্যের অভিজ্ঞতায় একাধারে সমতল ও বর্ত্তুলের পার্থক্য এবং বৃহৎ বৃত্তের সাধারণ জাতি বৃত্তের ও সরল রেখার পার্থক্য এই উভয়ই আছে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ উভয়দিগের আলোচনায় একই প্রকারের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। অতএব সমতল ও সরলরেখা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মূলে এই তথ্য নিহিত আছে যে, বর্ত্তুলের সহিত বৃহৎবৃত্তের যে সম্পর্ক থাকায় বৃহৎবৃত্তকে বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত অপরাপর বৃত্ত হইতে পৃথক্ করে, সমতলের সহিত সরলরেখার এবং দেশের সহিত সমতলের সেই সম্পর্ক থাকিয়া বৃত্তের সহিত সরলরেখার ও বর্ত্তুলের সঙ্গে সমতলের পার্থক্য সাধিত হইতেছে। অধিকন্তু সমান সমান বর্ত্তুলের অবস্থিত সমরেখাগুলিকে যেরূপ এক এক জাতীয় সমরেখা ধরিয়াছি, সমতলে অবস্থিত সমরেখাকে ঠিক সেইরূপ একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি (২৩শ ভাগ, ২৮১ পৃঃ)। পুনরায় সমান সমান বর্ত্তুলের অংশগুলিকে এক এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া তৎসঙ্গে যাবতীয় সমতলকেও অপর একটি জাতিতে পরিণত করা যায় (৯ পৃঃ)।

এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যাবতীয় নিয়মিত তলের বিভিন্ন পরিমাণ লইয়াই উক্ত বিভাগ পাইতেছি। তবে সমতলের সম্পূর্ণ আকৃতি অবগত না হওয়াতেই তাহাকে বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু একটি বর্ত্তুলের যে কোন পার্শ্ব তাহার সজাতীয় বর্ত্তুলের একটি মাত্র পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হয়; অপর পার্শ্বের সহিত মিলিত হইতে পারে না। সমতল সম্বন্ধে তদ্রূপ বাধা নাই। অর্থাৎ কোন সমতলের যে কোন পার্শ্ব অপর যে কোন সমতলের যে কোন পার্শ্বের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে।

ইহাই বর্ত্তুল হইতে সমতলের প্রধান পার্থক্য। অথচ এই পার্থক্য, বর্ত্তুলের অন্তর্ভুক্ত অপরাপর বৃত্ত হইতে বৃহৎ বৃত্তের যে পার্থক্য, তাহা বই আর কিছুই নহে। অর্থাৎ দেশের অন্তর্গত বৃহৎ বর্ত্তুলই সমতল। পুনরায় তাহা হইলেই সমতলের বর্ত্তুল রেখা সরল রেখা।

"দশম স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইউক্লিডের প্রথম ছাব্বিশটি প্রতিজ্ঞা মাত্র বর্ত্তুলেও প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলি বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রযুক্ত হয় না। সমতলকে বর্ত্তুল জাতির অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ইহা আর একটি বিশেষ অন্তরায়। নিম্নলিখিত উপায়ে আমরা এই আপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইব।

প্রথম প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইবে।
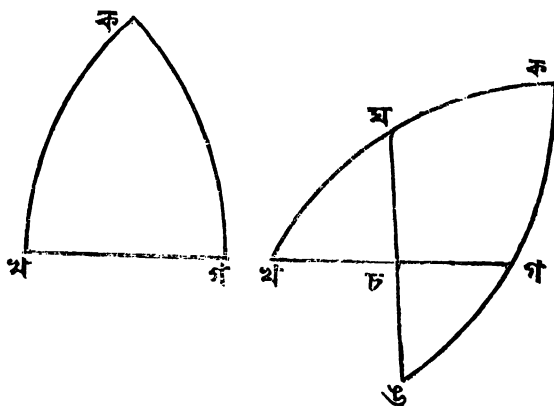
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার ক খ ও ক গ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান। ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্র যোগে দুই সমকোণের সমান হইবে।

(১) যদি ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হয়, (প্রথম চিত্র)
তবে ইহাদের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের অর্দ্ধ অর্থাৎ বৃত্তার্দ্ধের পাদরেখার সমান।
অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণের প্রত্যেকে সমকোণ।
অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

(২) যদি ক খ ও ক গ বাহুদ্বয় অসমান হয়, (দ্বিতীয় চিত্র)
তবে পাদরেখা অপেক্ষা ইহাদের একটি বৃহত্তর ও অপরটি লঘুতর।
মনে কর, ক খ বাহু বৃহত্তর ও ক গ বাহু লঘুতর।
ক খ হইতে ক ঘ পাদরেখা ছিন্ন কর।
ক গ রেখা বর্দ্ধিত করিয়া ক ঙ পাদরেখায় পরিণত কর।

ঘ ঙ এই দুই বিন্দুকে বর্ত্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।

খ গ ও ঘ ঙ এর ছেদ বিন্দু চ।

ক ঘ ও ক ঙ এর প্রত্যেকে পাদরেখা।

অতএব ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

আবার, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

অতএব ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি ক খ ও ক গ এর সমষ্টির সমান।

অতএব ঘ খ, গ ঙ এর সমান।

এক্ষণে ঘ খ চ ও গ ঙ চ দুইটি ত্রিভুজ;

ইহাদের ঘ খ বাহু গ ঙ বাহুর সমান;

অপিচ, খ ঘ চ কোণ গ ঙ চ কোণের সমান;—যেহেতু ইহাদের প্রত্যেকে সমকোণ।

এবং ঘ চ খ কোণ বিপর্য্যস্ত গ চ ঙ কোণের সমান।

অতএব ঘ খ চ কোণ চ গ ঙ কোণের সমান।

কিন্তু চ গ ঙ ও চ গ ক কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একযোগে দুই সমকোণের সমান।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।
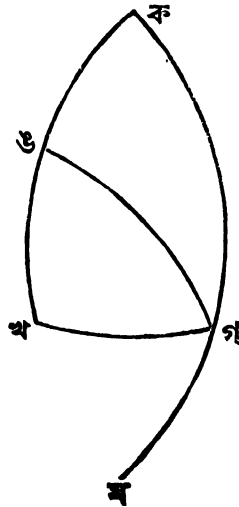
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ। ক খ ও ক গ বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর; ক খ গ ও ক গ খ কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

ক গ বর্দ্ধিত করিয়া ক ঘ এই বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধে পরিণত কর।

ক খ ও ক গ এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব ক খ, গ ঘ অপেক্ষা বৃহত্তর।

ক খ হইতে গ ঘ এর সমান ক ঙ অংশ ছিন্ন কর।

গ ঙ এই দুই বিন্দু বর্ত্তুল রেখা দ্বারা যোগ কর।

ক ঙ, গ ঘ এর সমান।

অতএব ক ঙ ও ক গ এর সমষ্টি ক ঘ বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান।

অতএব ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণ দ্বয়ের সমষ্টি দুই সম কোণের সমান।

খ গ ঙ ত্রিভুজের ঙ খ গ ও খ গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি ক ঙ গ কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

উভয়ে ক গ ঙ কোণ যোগ করিলে

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু ক ঙ গ ও ক গ ঙ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা

একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।
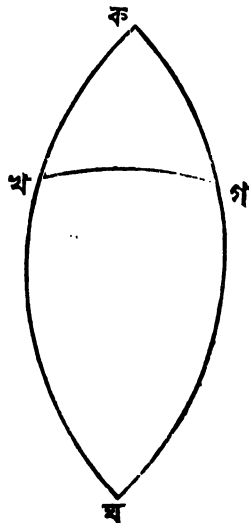
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ, ইহার **ক খ** ও **ক গ** বাহুর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর ; **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

ক খ ও **ক গ** বাহু বর্দ্ধিত করিয়া **ক** বিন্দুর বিপরীত **ঘ** বিন্দুতে মিলিত কর।

ক খ ঘ ও **ক গ ঘ** রেখাদ্বয়ের প্রত্যেকে বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ।

অতএব **ক খ ঘ** ও **ক গ ঘ** রেখাদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের দ্বিগুণ।

ক খ ও **ক গ**এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর ;

অতএব **খ ঘ** ও **ঘ গ** এর সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর।

অতএব **ঘ খ গ** ও **ঘ গ খ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু **ক খ গ** ও **ঘ খ গ** কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান ;

এবং **ক গ খ** ও **ঘ গ খ** কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব **ক খ গ** ও **ক গ খ** কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর।

এই তিনটি প্রতিজ্ঞা হইতে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি নূতন প্রতিজ্ঞা পাইতেছি।

(১) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধের সমান হইবে।

(২) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

(৩) বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের দুইটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টি বৃহৎ বৃত্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

সমতল যদি দেশের বৃহৎ বর্ত্তুল হয় এবং জ্যামিতি শাস্ত্রে যে দৈর্ঘ্যকে অনন্ত রেখা নামে অভিহিত করিয়া জ্যামিতিক ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহা উক্ত বৃহৎ বর্ত্তুলের পাদরেখা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বার্ত্তুলিক প্রতিজ্ঞা তিনটি নিম্নলিখিত সামতলিক প্রতিজ্ঞাত্রয়ে পরিণত হইয়া পড়ে।

(১) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ হইবে।

(২) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

(৩) ত্রিভুজের দুই কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হইলে তাহাদের সম্মুখস্থ বাহুদ্বয়ের সমষ্টির অনন্তার্দ্ধ অপেক্ষা লঘুতর হইবে।

স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, প্রথমটি ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতিতম প্রতিজ্ঞা এবং তৃতীয়টি পঞ্চম স্বীকার্য্য বই কিছুই নয়।
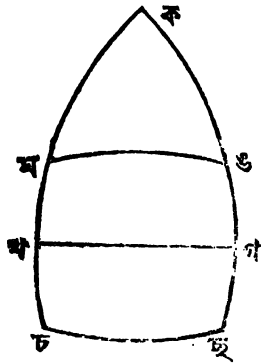
ক খ গ একটি বার্ত্তুলিক ত্রিভুজ। ইহার ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

ক খ ও ক গ রেখাদ্বয়ে ঘ ও ঙ বিন্দু গ্রহণ কর।

ক খ ও ক গ এই দুই রেখাকে চ ও ছ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর।

ঘ ঙ ও চ ছ যোগ কর।

ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান।

অতএব ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর;

এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর।

কিন্তু সামতলিক জ্যামিতিতে এ বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। কারণ, সে ক্ষেত্রে ক খ গ ও ক গ খ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণের সমান হইলে ক ঘ ঙ ও ক ঙ ঘ কোণ-দ্বয়ের সমষ্টি এবং ক চ ছ ও ক ছ চ কোণদ্বয়ের সমষ্টিও দুই সমকোণের সমান হইবে।

এখানে ঘ খ, ঙ গ, খ চ ও গ ছ সরল রেখা ক খ ও ক গ সরল রেখার তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে, ক খ ও ক গ এর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে ক ঘ ও ক ঙ এর সমষ্টি অথবা ক চ ও ক ছ এর সমষ্টিকে অনন্তের দ্বিগুণ ধরিতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। অতএব এ বিরোধকেও বিরোধ বলা চলে না।

উক্ত প্রকারের ক্ষুদ্র জাতীয় রেখাকেই আমরা সান্ত রেখা আখ্যা প্রদান করিয়াছি।

অতএব সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা নিম্নলিখিত আকারে পরিণত হয়;—

কোন ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি অনন্তের দ্বিগুণ হইলে তৃতীয় বাহু সংলগ্ন উক্ত বাহুদ্বয়ের সান্ত অংশদ্বয়ের নাম সমান্তরাল সরল রেখা।

ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশতি প্রতিজ্ঞার পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলিকে বার্ত্তুলিক জ্যামিতিতে প্রয়োগে অক্ষমতার একমাত্র কারণ এই যে, বর্ত্তুলের উপরে সমান্তরাল বর্ত্তুল রেখার অস্তিত্ব অসম্ভব। যেহেতু সমান্তরাল সরল রেখা অবিরামে বর্দ্ধিত হইলেও তাহারা

মিলিত হয় না। কিন্তু বর্ত্তুল রেখা বর্দ্ধিত হইলে বৃহৎ বৃত্তে পরিণত হয় এবং একই বর্ত্তুলস্থিত যে কোণ দুইটি বৃহৎ বৃত্ত, তাহাদের সমদ্বিখণ্ডকারক বিন্দুদ্বয়ে ছিন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু সমান্তরাল সরল রেখার সংজ্ঞা যদি উক্তরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে এই আপত্তি খণ্ডিত হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা সামতলিক জ্যামিতির প্রমাণ কার্য্যেও বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

তাহা হইলে সমগ্র সামতলিক জ্যামিতিটি বার্ত্তুলিক জ্যামিতিরই একটি অংশ হইয়া পড়িল। কারণ, পাদরেখার তুলনায় অনন্ত ক্ষুদ্র বর্ত্তুল রেখাই সরল রেখা এবং বর্ত্তুলের অনন্ত ক্ষুদ্র অংশই সমতলে পরিণত হইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ জরিপ কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেহেতু পৃথিবী বর্ত্তুলাকার হইলেও তাহারই উপরিস্থিত ভূমির মাপ সামতলিক জ্যামিতি দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এমন কি, আদালতের নিতান্ত কূট তর্কেও এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

এক্ষণে দেখিতেছি, প্রথম সত্যটি দ্বারা "বর্ত্তুল রেখা মাত্রই বর্ত্তুলে অবস্থিতি করে," একমাত্র ইহাই সূচিত হইতেছে ; অর্থাৎ এই সত্যটি সূত্রাকারে উল্লেখের কোন প্রয়োজনই নাই।

আমরা ২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, "বর্ত্তুলের অভ্যন্তরস্থিত সমরেখা, যত ক্ষণ তাহার পূর্ণ নিয়মিত রেখা—বৃহৎ বৃত্তের লঘু ধনুর পর্য্যায় অতিক্রম না করে, তত ক্ষণ তাহা সমরেখা নামেই অভিহিত থাকিবে। সমতলের সমরেখা অর্থাৎ সরল রেখা বর্দ্ধমান হইয়া সমরেখার অবস্থাকে অতিক্রম করিবে, ইহা মানব-বুদ্ধির অগম্য।"

এক্ষণে উল্লিখিত বাক্য এবং ইউক্লিডের একাদশ অধ্যায়ের প্রথম প্রতিজ্ঞা, এই উভয় হইতে সরল রেখার পরিবর্দ্ধন-ক্রিয়া নিম্নলিখিতরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে ;—

একটি সরল রেখা যে সমতলে অবস্থিতি করে, সর্ব্বদা তাহার মধ্য দিয়াই পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ পরিবর্দ্ধনে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সান্ত থাকে, তত ক্ষণ উহা সরল রেখা নামেই অভিহিত হইবে। সান্তত্ব নষ্ট হইলে ইহা সরলত্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তুল রেখায় পরিণত হইবে। তথাপি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইলে ইহা অনন্তে উপস্থিত হইবে। রেখাটি যদি পুনরায় এইরূপ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অনন্তের দ্বিগুণিত পরিমাণ স্থানে উপস্থিত হয়, তবে ইহা আর সমরেখা নামে অভিহিত হইবে না। তথাপি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে যে মুখে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার বিপরীত দিক্ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সরল রেখাটির অপর প্রান্তের সঙ্গে একই সরল রেখায় মিশিয়া যাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত

দ্বিজ রঘুনাথের সত্য-নারায়ণের পুথি*

বঙ্গদেশে প্রাচীন ও নবীন অসংখ্য সত্য-নারায়ণের পুথি বা পাঁচালী দৃষ্ট হয়; বোধ হয়, বঙ্গের এমন কোন প্রদেশ বা পরগণা নাই, যেখানে উহার নিজস্ব সত্য-নারায়ণের পুথি না আছে। এই সকল পুথির মধ্যে কোন কোন পুথি মুদ্রিত হইয়া প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির স্থান অধিকার করিয়াছে। মুদ্রিত পুস্তক পাইলে অধিকাংশ লোকেই পুথি হাতে লিখিয়া লওয়ার কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন না,--সুতরাং এই কারণে যে অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনাদর ও তাহা হইতে ক্রমে সেই পুথিগুলির বিলোপ সাধিত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কোন কোন সত্য-নারায়ণের প্রাচীন পুথি প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আমরাও পাঠকবর্গকে সেইরূপ একখানা প্রাচীন সত্যনারায়ণের পুথি উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই পুথিখানা প্রবন্ধ-লেখকের জন্ম-ভূমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে সত্য-নারায়ণের পূজা উপলক্ষে অদ্যাপি সুললিত সুর সহযোগে গীত হইয়া থাকে। মনসার ভাসানের ন্যায় সত্য-নারায়ণের পুথি এ ভাবে গীত হইতে বড় দেখা যায় না; তদ্ভিন্ন এই পুথিখানার রচনা-নৈপুণ্যেও অন্যান্য পুথি হইতে যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। কলাবতীর বিলাপ, বারমাসী ও চৌত্রিশ-অক্ষরী স্তোত্র দ্বিজ রঘুনাথের রচনা-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ। রঘুনাথ কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, আমরা স্থির করিতে পারি নাই; তবে রঘুনাথ যে অন্ততঃ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি, তাহা নিশ্চিত জানা গিয়াছে। 'ক' চিহ্নিত পুথিখানার শেষে 'ইতি সন ১২৪৩ সন তারিখ ১৫ ফাল্গুন সন ১২২২ সনের পুথি শ্রীরামচন্দ্র দত্ত সাকীম কেওঢালা' লিখিত থাকায় ক পুথি ও উহার আদর্শ পুথির লিপি-কাল যথাক্রমে ১২৪৩ ও ১২২২ সাল জানা যাইতেছে। রামচন্দ্র দত্তের বংশধরগণ অদ্যাপি আমাদিগের স্বগ্রামের সন্নিহিত কেওঢালা গ্রামে বাস করিতেছেন। ক পুথিখানা তাঁহাদিগের পুরোহিত শ্রীযুক্ত রাজমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথির সহিত সংযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের জ্ঞাতি বৈদ্যনাথ দত্ত কর্ত্তৃক ১২৪৫ সালে লিখিত দ্বিজ রামকৃষ্ণের রচিত আর এক সত্য-নারায়ণের পুথি আছে। কেওঢালা গ্রামে সেই পুথিখানাই পূজাপ্রসঙ্গে পঠিত হইয়া থাকে। আমাদিগের স্বগ্রামের 'খ' চিহ্নিত পুথিখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উহা বাঙ্গালা ১২৮৬ সালে অন্য একখানা আদর্শ পুথি দৃষ্টে নকল করা হইয়াছিল। খ পুথিখানা 'সাত নকলে আসল খাস্তা' এই প্রাচীন প্রবাদ-বাক্যের যথার্থতার প্রমাণ করিতেছে। উহাতে লিপিকর-প্রমাদে বহু ভুল ও ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছে; মূলের পৃষ্ঠার নীচের পাঠান্তরগুলি দেখিলেই উহা প্রতীত হইবে। তথাপি খ পুথিখানা স্থানে স্থানে প্রকৃত পাঠ-নির্ণয়ে আমা-

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ক পুথির সহিত স্থানে স্থানে খ পুথির পাঠের এরূপ বৈষম্য দেখা যায় যে, তাহাতে একখানা পুথিকে অন্যখানার পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মনে না করিয়া পারা যায় না। আমরা প্রাচীনতর 'ক' পুথিখানাকেই অধিকতর প্রামাণিক ও পরিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ স্থলে উহার পাঠই মূলে গ্রহণ করিয়াছি—কচিৎ কোন স্থলে 'খ' পুথির পাঠও সমীচীন বোধে গৃহীত হইয়াছে। এই পুথিখানার বিভিন্ন ছন্দগুলি যেরূপ বিভিন্ন স্বর-যোগে গীত হয়, তাহার নমুনা স্বরূপ প্রত্যেক ছন্দের দুই একটি কলির স্বর-গ্রাম করিয়া দিতে পারিলে—উহাদিগের মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ বুঝা যাইত, কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং স্বরগ্রাম প্রকাশ করিলেও তাহা সাধারণ পাঠকের কোন কাজে আসিবে না বলিয়া আমরা আপাততঃ অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে স্বর-গ্রাম করাইয়া প্রকাশ করার চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। এই পুথিখানার কোন কোন প্রাচীন বা প্রাদেশিক শব্দের অর্থ বোধে অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনায় পাদ-টীকায় দুরূহ শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইল।

ওঁ নমো গণেশায় নমঃ।

বন্দো দেব গণপতি মূষিক বাহনে গতি
এক-দন্ত বিঘ্ন-বিনাশন।
লম্বোদর স্থূল-কায় সিন্দুরে মণ্ডিত গায়
চতুর্ভুজ গজেন্দ্র-বদন॥
প্রমথ১ দানব সাথে প্রণমহ ভূত-নাথে
বৃষারূঢ় শ্মশান-বেহারী।
পরিধান ব্যাঘ্র-ছাল গলায় হাড়ের মাল
ভালে ইন্দু শিরে সুরেশ্বরী॥
ভূমিগত হৈয়া কায় বন্দো দেবী মহামায়
মৃগরাজ-পৃষ্ঠে অবস্থিতি।
একমন চিত্ত হৈয়া শক্তিগণ সঙ্গে লৈয়া
সর্ব্ব দেবে যারে করে স্তুতি॥
বন্দো মাতা ভাগীরথী হরি-পদে উতপতি
নিজ-নাথ-জটা-বিলাসিনী২।
ভগীরথ-তপ-বলে প্রকাশিত ভূ-মণ্ডলে৩
দ্রবময়ী কলুষ-নাশিনী॥

১। 'প্রথম' খ পুথি। ২। 'নিবাসিনী' খ পুথি। ৩। 'প্রকাশিত' ইত্যাদি স্থলে 'আসিলে অবনিতলে' ক পুথি।

একচিত্ত করি মন   বন্দো দেব নারায়ণ
কমলা-সেবিত পদ যার।
নরসিংহ-রূপ ধরি   হিরণ্যকশিপু মারি
খণ্ডাইলে পৃথিবীর ভার॥
বন্দিব৪ ভারতী-পায়   শুভ্র৫ সুবর্ণ-কায়৬
বাক্যময়ী সুমতিদায়িনী।
বন্দো পড়ি ভূমি-তলে   বসন বান্ধিয়া গলে
কমলা কমল-বিলাসিনী॥
রাজহংস রথে গতি   বন্দো দেব প্রজাপতি
ব্রহ্মাণী গায়ত্রী করি সঙ্গে।
ভাবিয়া যাহার পদ   মুনিগণে গায় বেদ
চতুর্ম্মুখ লোহিত সর্ব্বাঙ্গে৭॥
ঐরাবত-রথে গতি   শচী সঙ্গে সুর-পতি
মহিষ-বাহনেতে শমন৮।
প্রণমহ ভক্তি-মনে   অজ-রথ৯ হুতাশনে
কৃষ্ণসার-বাহনে পবন॥
বন্দো সিন্ধু-সুত-পায়১০   ষোল-কলা পূর্ণ-কায়
রুহিণ্যাদি নক্ষত্র-সংহতি।
গমন অরুণ রথে   নব গ্রহ করি সাথে
প্রণমহ দেব দিন-পতি॥
দীন-হীনজন-বন্ধু   ভকত-করুণা-সিন্ধু
শ্রীগুরু-চরণ বন্দো মাথে।
ভূমিগত হৈয়া কায়১১   বন্দি কবিগণ১২-পায়
বিরচিত দ্বিজ১৩ রঘুনাথে॥
সবে হৈয়া বিনিপুণ১৪   শোন সত্য-দেব-গুণ১৫
কলি-যুগে যেমতে প্রকাশ।

৪। 'বন্দিয়া' খ। ৫। 'শুদ্ধ' ক। ৬। 'সুপ্রসন্নকায়' খ। ৭। 'চতুর্ম্মুখ' ইত্যাদি স্থলে 'চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারী' খ। ৮। 'মহিষ' ইত্যাদি স্থলে 'মহিষবাহনে যমরাজ' খ। ৯। 'দিব্যরথ' খ। ১০। 'কায়' খ। ১১। 'তায়' খ। ১২। 'করিগণ' খ। ১৩। 'কবি' ক। ১৪। 'একমন' খ। ১৫। 'সত্যদেব-গুণ' স্থলে 'সর্ব্ব দেবগণ' খ।

অন্য১৬ যুগে নাহি ছিল তেই সে পুরাণে নৈল১৭
কবিগণে নানা মতে ভাষ১৮ ॥
পূর্ব্ব কাশীপুর নাম ব্রহ্মপুত্র-কূলে গ্রাম
ব্রাহ্মণাদি-বসতি প্রচুর ।
তথায় বসতি করি সদানন্দ নাম ধরি
ছিল এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর ॥
নিত্য সেই বিপ্র জন গ্রাম করি পর্য্যটন
নিজোদর করয়ে পালন ।
আরো১৯ দিন বিপ্র-রায় গ্রাম-পর্য্যটনে যায়
তাহে দেখে২০ একটি ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণে বলেন ভিক্ষু চলিয়াছ কোন দিক্ষু*
দুঃখী কেনে দেখি অতিশয় ।
সদানন্দ শুনি বাণী যোড় করি দুই পাণি
নিজ কথা বিশেষিয়া কয় ॥
শুনি প্রভু দয়াময় তাহে২১ উপদেশ কয়
সেব তুমি সত্য-নারায়ণ ।
বহু মন্ত্র-তন্ত্র২২ নয় সেবিলে বিভূতি হয়
সত্য সত্য কহিল বচন ॥
সোয়া পরিমাণ করি আতব-তণ্ডুল-গুড়ি
রম্ভা দুগ্ধ২৩ ইক্ষুর২৪ মিশ্রিত ।
প্রতিবাসী যত ধনী২৫ সন্ধ্যাকালে ডাকি আনি
নারায়ণে করি নিবেদিত ॥
সত্য-নারায়ণ প্রতি সবে করি স্তুতি২৬
যার যেই মানস করিয়া ।
ভক্তি করি রম্ভা-পাত লইবেক যুড়ি হাত
প্রসাদ খাইবে তাহে২৭ নিয়া ॥

১৬। 'সত্য' খ। ১৭। 'তেই' ইত্যাদি স্থলে 'কলিতে প্রকাশ হৈল' খ। ১৮। 'কবিগণে' ইত্যাদি স্থলে 'দারিদ্রেরে করিতে উল্লাস' খ। ১৯। 'আর' খ পুথি। ২০। 'দেখা' খ। * দিক্ষু—(সংস্কৃত 'দিক্ষু'=দিক্‌সমূহে) দিকে। ২১। 'তাথে' খ। ২২। 'তন্ত্রমন্ত্র' খ। ২৩। 'যুক্ত' খ। ২৪। 'ইক্ষুক' ক। ২৫। 'ধানি' ক। ২৬। 'ভকতি' খ। ২৭। 'হাতে' খ।

সদানন্দ তুষ্ট হৈয়া নগরে গেলেক ধাইয়া
বৃদ্ধ বিপ্র করিয়া নমন২৮।
সেই দিন ভিক্ষা করি যথা দ্রব্য যোগ্য হরি২৯
ঘরে আসি করিল পূজন ॥
বিধি মতে সেবা৩০ করি সভা ভরি৩১ বলে হরি
তুষ্ট হৈয়া প্রভু অধিষ্ঠান।
উচ্চারিয়া বিষ্ণু-বীজ স্তবন করিলা দ্বিজ
বর দিলা সত্য-ভগবান্৩২ ॥
খণ্ডিবে দারিদ্র্য-দুখ ঐহিকে পাইবে সুখ
পারত্রিকে৩৩ আমার সস্থান৩৪।
এহা বলি দয়াময় আর করি দিব্যচয়৩৫
তথা হৈতে হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
সেই বর প্রকাশিল দুঃখ শোক৩৬ দূরে গেল
ভূতি৩৭ হৈল কুবের সমান।
দ্বিজ৩৮ রঘুনাথে কয় সেবিলে বিভূতি হয়
সেব সবে সত্য-ভগবান্৩৯ ॥

খর্ব্ব ছন্দ।

এক দিন অতি ক্ষীণ কাঠরিয়াগণ।
কাষ্ঠ কাটিবারে হাটি৪০ করিল গমন ॥
কর্ম্ম-ফলে রৌদ্র-জালে তৃষ্ণা-যুক্ত হৈয়া।
কত দূরে কাশীপুরে উত্তরিলা গিয়া ॥
বিপ্র দেখি বলে দুখী৪১ জল কর দান।
সদানন্দ পায়্যানন্দ করাইল পান৪২ ॥
ভক্তিমন্ত দেখি শান্ত৪৩ জিজ্ঞাসিল তারে।
কি কারণ পাল্যা ধন কহত আমারে৪৪ ॥
বিপ্র বলে কোন ছলে দিলেন ঈশ্বর।
পর্য্যটনে দরশনে এক বিপ্রবর ॥
সত্য-দেব তুমি সেব ঘরেতে যাইয়া।
ভিক্ষা করি দ্রব্যাহরি সুসজ্জ করিয়া ॥
ভিক্ষা-পথে সেই মতে শুনিয়া বিধান।
ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে ভগবান্ ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা বিভূতি পাইল।
উপকার করি সার৪৫ তোমাকে কহিল ॥

২৮। 'মনন' খ। ২৯। 'যথা' ইত্যাদি স্থলে 'যত দ্রব্য সমাহরি' খ। ৩০। 'পূজা' খ। ৩১। 'করি' ক। ৩২। 'নারায়ণ' খ। ৩৩। 'পারত্রিকে' খ। ৩৪। 'সমান' খ। ৩৫। 'আর' ইত্যাদি স্থলে 'দিয়া নিজ পরিচয়' খ। ৩৬। 'সব' খ। ৩৭। 'বৃদ্ধি' খ। ৩৮। 'কবি' ক। ৩৯। 'নারায়ণ' খ। ৪০। 'কাষ্ঠ' ইত্যাদি স্থলে 'কাষ্ঠ কাটি বার আটি' ক। ৪১। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'দেখে বিপ্র আছে ক্ষিপ্র' ক। ৪২। 'জলপান' খ। ৪৩। 'ভক্তিমন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'ভক্তিপক্ষ কাষ্ঠ তক্ষ' ক। ৪৪। 'কি' ইত্যাদি স্থলে 'দুঃখ দূর হৈল তোর কিমত প্রকারে' খ পুথি। ৪৫। 'উপকার' ইত্যাদি স্থলে 'আদি অন্ত সব বৃত্তান্ত' খ।

শুনি ছিত আনন্দিত কাঠুরিয়াগণ।
ঘরে যাইয়া তুষ্ট হৈয়া পূজে নারায়ণ৪৬ ॥
তুষ্ট-মনে নারায়ণে তারে দিলা বর।
দুঃখ গেল ধন হৈল বিভূতি বিস্তর ॥
তার শেষে সর্ব্ব দেশে হইল প্রকাশ।
সত্য-দেবে পূজি সবে দুঃখ কৈল নাশ ॥
যোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন।
দুঃখ হর কৃপা কর৪৭ সত্য-নারায়ণ ॥

ত্রিপদী।

রত্নপুর৪৮ নামে গ্রাম সর্ব্ব-গুণে গুণ-ধাম
তাথে বৈসে সাধু লক্ষপতি।
ভার্য্যা তার লীলাবতী রূপে গুণে মহামতি৪৯
ঘরে তার নাহিক সন্ততি ॥
এক দিন সেই জন বাণিজ্য করিতে মন
কাশীপুরে কৈলা৫০ অধিষ্ঠান।
তথাতে কামনা করি ঘরে আইলে৫১ সাধু-তরি
এক কন্যা হৈল উপদান* ॥
রাখি কলাবতী নাম পাত্র আনি অনুপাম
শঙ্খপতি তাহান বিধান৫২।
শুভ লগ্নে ক্ষণ করি বহু দ্রব্য সমাহরি
কন্যাকে করিল সম্প্রদান ॥

খর্ব্ব ছন্দ।

বর সঙ্গে মন-রঙ্গে তুষিয়া সুন্দরী।
শাস্ত্র-মতে পতি-হাতে ঘরে নিল ধরি ॥
দুই জনে এক-মনে বিধি মিলাইল।
মহাসুখে সকৌতুকে রজনী বঞ্চিল ॥
এহি মতে আনন্দেতে সাধু কন্যা পাইলে।
সত্য-দেবা নৈলে সেবা৫৩ সাধু কর্ম্মফলে ॥
কত৫৪ দিনে সাধু৫৫ মনে বাণিজ্যে যাইতে।
সপ্ত তরি সজ্জ করি জামাতা সহিতে ॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে৫৬ নৌকা-আরোহণ।
উচ্চ-রব মাল্লা সব করে ঘন ঘন ॥
সর্ব্ব পথে নানা মতে দেখি তীর্থগণ।
প্রণমিয়া প্রবন্ধিয়া৫৭ করিল৫৮ তর্পণ ॥

৪৬। 'শুনি' ইত্যাদি পংক্তি-দ্বয় স্থলে 'কাঠুরিয়া সেই বাক্য শুনি সাবধানে। ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজিল বিধানে ॥' ক। ৪৭। 'দুঃখ' ইত্যাদি স্থলে 'তুষ্ট হৈল বর দিল' খ। ৪৮। 'রত্নপুর' খ। ৪৯। 'মহাসতী' ক। ৫০। 'হৈলা' খ। ৫১। 'আইল' খ। * উপদান=উৎপত্তি। ৫২। 'রাখি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুঁথিতে নাই। ৫৩। 'সত্য' ইত্যাদি স্থলে 'সত্য দেব নৈলে সব' খ। ৫৪। 'এক' খ পুথি। ৫৫। 'হৈল' খ। ৫৬। 'শুভ' ইত্যাদি স্থলে 'শুভক্ষণে সুলগনে' ক। ৫৭। 'করে যাত্রা' খ। ৫৮। 'স্নান যে' খ।

তার পরে সে৫৯ সফরে রাজা সত্যবান্।
রাজ-ভেটে সন্নিকটে সাধু অধিষ্ঠান॥
আজ্ঞা পায়্যা বাসা লয়্যা ছান্দিল দোকান।
পূর্ব্ব ফলে প্রকাশিলে সত্য-ভগবান্॥
রাজ-ঘরে যায়্যা চোরে সর্ব্বস্ব হরিল।
সেই সর্ব্ব যত দ্রব্য সাধু মূল্য দিল৬০॥
চরগণ অনুক্ষণ রাজ-আজ্ঞা পায়্যা।
হয়্যা মত্ত করে তত্ত্ব সদা ফিরে ধায়্যা॥
নারায়ণে কুপ্ত-মনে৬১ বৃদ্ধ বিপ্র হৈয়া।
মুক্তা কাণে সাধু পানে৬২ দিলা দেখাইয়া॥
স্বর্ণ-বর্ণ মুক্তা-কর্ণ সাধু শঙ্খপতি।
চোর করি৬৩ আনে ধরি শ্বশুর সংহতি॥
কর্ম্মফলে বন্দিশালে রৈলা দুই জন।
গৃহে এথা শোন কথা যেমত লক্ষণ॥
জামাতার বহুকাল৬৪ শ্বশুর সংহতি।
দেখি৬৫ লীলা দুঃখশীলা সদত রোদতি॥
সত্য-কোপে কোনরূপে৬৬ হরি নিল ধন।
কত মৈল পলাইল দাস-দাসীগণ॥
দিন দিন ভাগ্য-হীন সত্যের কপটে।
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি বড়ই সঙ্কটে॥
উপবাসে বেলা-শেষে৬৭ সাধুর কুমারী।
ভিক্ষা জন্তে গেল কন্তে৬৮ ব্রাহ্মণের বাড়ী॥

সন্ধ্যা-বেলা নিজ শালা পূজে নারায়ণ।
কলাবতী দুঃখ-মতি পুছিল কারণ॥
পূজা মত বিধি যত শুনিয়া বিশেষ।
ভাগ্য মানি দ্রব্য আনি পূজে হৃষীকেশ॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু নারায়ণ।
সত্যবানে নিজ-কাণে কহিলা সপন॥
নিদ্রা হৈতে উঠি প্রাতে কহে৬৯ পাত্র স্থানে।
বন্দিযুক্ত দুই মুক্ত৭০ সেই ক্ষণে আনে॥
তুষ্ট মনে দুই জনে করাইল স্নান।
নিতি কর্ম্ম যথা৭১ ধর্ম্ম বস্ত্র-পরিধান॥
দুই জন আলিঙ্গন করি নৃপ-বর।
মিষ্ট ভাষি৭২ দ্রব্যরাশি দিল বহুতর॥
অশ্ব গজ বানা৭৩ ধ্বজ নানান প্রকার।
রেসমী পসমী আদি বস্ত্র ভারে ভার॥
হীরা মতি নানাজাতি প্রধান৭৪ যতেক।
সপ্ত তরি দিল ভরি লিখিব কতেক॥
নানাবিধি তৈজসাদি কহন না যায়।
গন্ধদ্রব্য দিল সর্ব্ব ভরিয়া নৌকায়॥
বানিয়াতি নানাজাতি লঙ্গ তেজপাত।
জাতিফল নিয়াছল এলাচি গুজরাত৭৫॥
নিজ পুরী শূন্য করি দিল৭৬ নানা ধন।
যোড়-কর৭৭ পরিহার করয়ে রাজন॥

৫৯। 'সু' ক। ৬০। 'নিল' ক। ৬১। 'ক্রোধমনে' খ। ৬২। 'মুক্তা' ইত্যাদি স্থলে 'মুক্তা চুলে সাধুগলে' খ। ৬৩। 'বলি' খ। ৬৪। 'জামাতার' ইত্যাদি স্থলে 'জামাতারে কারাগারে' খ। ৬৫। 'শুনি' খ। ৬৬। 'সত্য-কোপে' ইত্যাদি স্থলে 'দৈবযোগে কর্ম্ম-ফলে' ক। ৬৭। 'উপবাসে' ইত্যাদি স্থলে 'এক দিন অতি ক্ষীণ' ক। ৬৮। 'ভিক্ষা' ইত্যাদি স্থলে 'ভিক্ষা অর্থে গ্রামপথে' ক। ৬৯। 'নিদ্রা' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি সপ্ন কহে প্রশ্ন নিজ' ক। ৭০। 'সাধু' খ। ৭১। 'যত' খ। ৭২। 'রাশি' খ। ৭৩। 'দিব্য' খ। ৭৪। 'প্রচুর' ক। ৭৫। 'বানিয়াতি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় ক পুথিতে নাই। ৭৬। 'দিয়া' ক। ৭৭। 'করযোড়ে' খ।

দৈবাধীনে৭৮ ক্রোধ-মনে দুঃখ দিল তোমা। পড়ি ভূমি পদ নমি কৈলা সম্ভাষণ৮০ ॥
বিনা দোষে কৈল৭৯ রোষে এবে কর ক্ষমা ॥ মৃদুভাষে রাজ-পাশে হইয়া বিদায়।
রাজ-কষ্ট শুনি তুষ্ট হৈলা দুই জন। করি নতি গণপতি চড়িলা৮১ নৌকায় ॥

ত্রিপদী।

আনন্দে চড়িয়া৮২ নায় সদাগর দেশে যায়
হরি বলে৮৩ দাড়ি মাঝিগণ।
হেন কালে ধীরে ধীরে৮৪ বিপ্ররূপে নদীতীরে৮৫
আসিলেন সত্যনারায়ণ ॥
পুছিলা সাধুর তরে কি দ্রব্য নৌকার পরে
পরিহাসে৮৬ সাধু কহে কথা।
তুমি ভিক্ষু৮৭ হীনবল শুনি ইহা কিবা ফল
ভরিয়াছি তরু লতা পাতা ॥
শুনিয়া সাধুর বাণী হাসিলেন চক্রপাণি৮৮
এবমস্তু বলিলেন ছলে।
নৌকায় যত ধন ছিল সব লতা পাতা হৈল৮৯
ভাসিয়া উঠিল সব জলে৯০ ॥
দেখি সাধু অচেতন করে বহু বিলাপন৯১
হেন কালে কহে শস্থপতি।
আমার বচন ধর বিপ্রকে স্তবন কর৯২
তবে তোমার ঘুচিবে দুর্গতি ॥
সদাগর শুনি কথা নৌকা লাগাইয়া তথা
জামাতার সহিতে গমন।

৭৮। 'দৈব দিনে' খ। ৭৯। 'কৈলা' খ। ৮০। 'রাজ-কষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ যথা,—'রাজ-বাণী সাধু শুনি হৈল হরষিত। তুষ্ট হৈল প্রণমিল পড়িয়া ভূমিত ॥' ৮১। 'উঠিলা' খ। ৮২। 'চলিলা' খ। ৮৩। 'ধ্বনি' খ। ৮৪। 'ধীরে ধীরে' স্থলে 'নদীতীরে' খ। ৮৫। 'বিপ্র' ইত্যাদি স্থলে 'বৃদ্ধরূপে ধীরে ধীরে' খ। ৮৬। 'উপহাস্যে' খ। ৮৭। 'বিপ্র' খ। ৮৮। 'যদুমণি' খ। ৮৯। 'নৌকায়' ইত্যাদি স্থলে 'নৌকার যতেক ধন আচম্বিতে বিনাশন' ক। ৯০। 'সব জলে' স্থলে 'সপ্ত তরি' খ। ৯১। 'করে' ইত্যাদি স্থলে 'হাহাকার ঘন ঘন' খ। ৯২। 'বিপ্রকে' ইত্যাদি স্থলে 'পরিহার দ্বিজবর' খ।

নতশির গদগদ ধরিয়া বিপ্রের পদ
করিলেন অনেক স্তবন ॥
সাধু যদি মিনতিলা৯৩ শুনি দ্বিজ৯৪ তুষ্ট হৈলা
নৌকা কাছে করিলা গমন।
দয়া কৈলা নরহরি ধনপূর্ণ হৈল তরি
নমি সাধু চলিলা তখন৯৫ ॥
বাহ বাহ সাধু ডাকে মাল্লাগণ বাহে ঝাকে
নাহি করে বিলম্ব বিশ্রাম।
পবন-সঞ্চারে৯৬ ধায় আস্তে ব্যস্তে নৌকা যায়
সন্ধ্যাবেলা পায় নিজ গ্রাম ॥
গৃহে লীলাবতী ধনী পুরোহিত ডাকি আনি৯৭
পূজা করে সত্য-নারায়ণ।
হেন কালে বলে চরে লক্ষপতি আইল ঘরে
মায় ঝিয়ে হৈল অচেতন ॥
আস্তে ব্যস্তে পূজা সারি শীঘ্রগতি সাধু-নারী
নদীতীরে করিলা গমন।
কলাবতী শুনি কথা প্রসাদ ফেলিয়া তথা
ধায়্যা গেল পতি দরশন ॥
এথা ঘাটে সদাগরে নানা সুমঙ্গল করে
লাগাইয়া সপ্তখানা তরি।
বাদ্যভাণ্ড উতরোল৯৮ নাহি শোনে কার বোল
ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ খঞ্জরি ॥
কলাবতীর অপরাধ তাহে ঘটে পরমাদ৯৯
কোপে প্রভু১০০ করিলেন ছল।
উদিত নির্ম্মল১০১ শশী শঙ্খপতি ছিল বসি
নৌকা সমেত ঘাটে হৈল তল ॥
হেন কালে সদাগরে নানা সুমঙ্গল করে
নৌকা হইতে উঠিলেক তটে।

৯৩। 'প্রণতিলা' খ। ৯৪। 'প্রভু' খ। ৯৫। 'নমি' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণমিয়া করিল গমন' খ। ৯৬। 'গমনে' খ। ৯৭। 'গৃহে' ইত্যাদি স্থলে 'এথা প্রিয়াগমসিলা প্রতিবাসি ডাকি লীলা' ক। ৯৮। 'উচ্চ রোল' খ ৯৯। 'তাহে' ইত্যাদি স্থলে 'দেখি প্রভু জগন্নাথ' ক। ১০০। 'কোপে প্রভু' স্থলে 'কুপ্ত হৈয়া' ক। ১০১। 'লিখন' খ।

সাধু আদেশিলা লোকে শীঘ্র আন জামাতাকে
নৌকা সহ নাহি দেখি ঘা'ট ॥
আহা প্রভু জগন্নাথ কিবা হৈল বজ্রাঘাত
প্রাণ-সম জামাতা কোথায়।
লীলাবতী শুনি বাণী শিরেতে পাষাণ হানি
অচেতনে পড়িয়া তথায়১০২ ॥
হেন কালে কলাবতী ধায়্যা আসি শীঘ্রগতি
কথা শুনি হৈলা অচেতন১০৩।
ক্ষেণেকে চেতন পায়্যা ধরা-তলে লোটায়্যা
সকরুণে করিছে রোদন ॥

লাচারি*।

কান্দে নারি কলাবতী আহা প্রভু প্রাণপতি
অভাগিনী ডাকিছে তোমারে।
কোন অপরাধে মোরে পাসরিলা প্রাণেশ্বরে
কি কারণে তেজিলে আমারে ॥
সপনেহ তোমা বিনে অন্য নাহি মোর মনে
তবে কেনে নির্দ্দয়া হইলা।
প্রফুল্ল সময় পায়্যা মধু-পান না করিয়া
কেনে পুষ্প বিসর্জ্জন কৈলা ॥
চন্দ্র-হীন১০৪ নিশি-শোভা সূর্য্য বিনা যেন দিবা
শিখী যেন বিনা কাদম্বিনী।
মণি-হারা যেন ফণী শশী বিনা কুমুদিনী
কাদম্বিনী বিনা সৌদামিনী ॥
জল বিনা যেন মীন সরোবর পদ্মহীন
পদ্ম যেন বিনা মধুকর।

১০২। 'অচেতনে' ইত্যাদি স্থলে 'ভূমে পড়ে অচেতন হৈয়া' খ। ১০৩। 'হেন কালে' ইত্যাদি পংক্তি দুইটি খ পুথিতে নাই,—লিপিকর-প্রমাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

* এই লাচারির কলিগুলি ভাটিয়াল সুরে তেওট তালে গীত হইয়া থাকে এবং মাত্রা পূরণের জন্য প্রয়োজন মতে শব্দগুলির মাঝে মাঝে 'হে', 'ওহে', 'আরে' ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। ১০৪। 'তারা-হীন' ক।

রাজা-হীন যেন ভূমি　　তোমা বিনে তেন আমি
শোকানলে হৈয়াছি কাতর১০৫ ॥
পরবাসে ছিলে১০৬ তুমি　　সতত চিন্তিত আমি
আগমনে পূরিবে বাঞ্ছিত।
দ্বাদশ বৎসর পরে　　যদি বা আসিলা ঘরে
তাহে বিধি ক রল বঞ্চিত ॥
কোন অপরাধে মোরে　　বিধি বিড়ম্বনা করে
কিবা মোর লিখিল ললাটে১০৭।
কোন জন্মে ছিল পাপ　　কেবা দিল ব্রহ্ম-শাপ
তে কারণে পতি ডুবে ঘাটে১০৮ ॥

বারমাসী।

ইহ ত বৈশাখ মাস　　তুহিন১০৯ হইল নাশ
প্রচণ্ড যে হইল তপন১১০।
বসন্ত আগত দেখি　　ডাকয়ে কোকিল পাখী১১১
আমি তাহে দুঃখিত বিমন ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে চণ্ডারুণ১১২　　গ্রীষ্ম হৈল সুদারুণ১১৩
পক্ক আম্র হইল মিলন।
ফুটিল বকুল জাতি　　তাহে মোর নাহি পতি১১৪
কাল যাবে করিয়া কেমন ॥
আষাঢ়েতে ঘন বৃষ্টি　　শ্রাবণে বরিষা সৃষ্টি
ভাদ্র মাসে পক্ক তালগণ।
আশ্বিনেতে দশভুজা　　ত্রিভুবনে করে পূজা
তাহে আমি পতিহীন জন ॥

১০৫। 'শোকানলে' ইত্যাদি স্থলে 'তোমা বিনা না রহে জীবন' খ। ১০৬। 'পরবাসে ছিলে' স্থলে 'বিদেশে আছিলা' খ। ১০৭। 'কিবা' ইত্যাদি স্থলে 'কিবা ছিল ললাটে আমার' খ। ১০৮। অতঃপর খ পুথিতে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত পংক্তিদ্বয় দৃষ্ট হয়, যথা—

'ষোড়শ বয়স বালা　　বিষম মদন-জ্বালা
চিত্ত মোর করয়ে দাহন।'

১০৯। 'তব হিন' খ। ১১০। 'প্রচণ্ড' ইত্যাদি স্থলে 'প্রফুল্ল যে হইল পবন' খ। ১১১। 'বসন্ত' ইত্যাদি স্থলে 'যে জীবে যেমত ভাগ সেই মত অনুরাগ' ক। ১১২। 'চন্দ্রারোল' খ। ১১৩। 'সুধারোল' খ। ১১৪। 'ফুটিল' ইত্যাদি স্থলে 'তাহে মোর নাহি পতি আমি নবকুল জাতি' ক।

কার্ত্তিকে শরত কাল নিশি-শোভা অতি ভাল১১৫
মার্গশীর্ষে নবীন ভোজন।
পৌষ মাসে দিবা-হ্রাস দীর্ঘ রাত্র অভিলাষ
তাহে মোর পতির মরণ॥
মাঘ মাস মহাধন্য স্নানদানে মহাপুণ্য
সুমধুর১১৬ তাম্বুল চর্ব্বণ।
ফাল্গুনেতে মন্দ শীত চৈত্রে নারী হরষিত১১৭
তাহে মোর পতির নিধন॥
এহি মতে কলাবতী বিলাপ করিয়া অতি
উচ্চস্বরে১১৮ করিছে রোদন।
কাতর করুণা* শুনি দয়া কৈলা দেবমণি১১৯
দ্বিজ রঘুনাথের বচন॥

থর্ব্ব ছন্দ।

লক্ষপতি শুদ্ধমতি করে হাহাকার।
হেন কালে পড়ি গেলে শব্দ হুহুঙ্কার॥
শোন সাধু তোর বধূ কহুক কন্যারে।
ভূমিগত প্রসাদ১২০ তুলিয়া খাইবারে॥
এত শুনি সাধু-মণি হৈল হরষিত।
মৃত দেহে হৈল তাহে জীব সঞ্চারিত১২১॥
আচম্বিতে সচকিতে সাধু লক্ষপতি।
ভার্য্যা লীলা আদেশিলা অতি হৃষ্টমতি॥
লীলাবতী শীঘ্রগতি কন্যাকে কহিল।
সাধু-কন্যা মানি ধন্যা১২২ প্রসাদ খাইল॥
তুষ্ট হৈলা বর দিলা প্রভু গদাধর।
নৌকা ঘাটে ভাসি উঠে জলের উপর॥
লক্ষপতি শীঘ্রগতি জামাতা আনিল।
নারীগণে শুভক্ষণে ঘরে নিয়া গেল॥
বারেবার অঙ্গীকার পূজা করিবার।
তুষ্টমনে দুই জনে আরম্ভিলা তার॥
নিমন্ত্রণ নিবেদন করি সদাগর।
চারি পাশে দেশে দেশে পাঠাইলা চর॥
বাদ্যকার নাট্যকার বিদ্যাধরগণ১২৩।
যত১২৪ প্রজা সাধু রাজা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ॥

১১৫। 'কার্ত্তিকে' ইত্যাদি স্থলে 'উষ্য মাসে দেবরাস দশ ইন্দ্র পরকাশ' ক। ১১৬। 'লজযুক্ত' খ। ১১৭। 'চৈত্রে' ইত্যাদি স্থলে 'চৈত্র মাসে বসন্তত' ক। ১১৮। 'উচ্চারিয়া' ক। *করুণা=কাতর-উক্তি। ১১৯। 'কৈলা' ইত্যাদি স্থলে 'কৈয়া দৈববাণী' খ। ১২০। 'প্রসাদ যত' খ। ১২১। 'এত' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে—

'এত শুনি সাধুমণি হৈলা অচেতন।
তপ্ত স্থল দিলা জল কোন মহাজন॥' ক।

১২২। 'সাধু' ইত্যাদি স্থলে 'ব্যস্ত হৈয়া শীঘ্র যাইয়া' খ। ১২৩। 'বিদ্যাধরীগণ' খ। ১২৪। 'সঙ্গে' ক।

প্রতিবেশী দাসদাসী আসিয়া মিলিল১২৫।
সন্ধ্যা বেলা নিজ শালা পূজা আরম্ভিল॥
দুগ্ধ গুড় রম্ভা আর আতব তণ্ডুল।
নানাবিধি ফল আদি কর্পূর তাম্বুল॥
নিয়মিত দ্রব্য যত সোয়া পরিমাণ।
উপহার ভারে ভার বিবিধ বিধান॥
মিশ্রী চিনি খাজা ফেণী মতিচুর খাসা।
রসকরা মনোহরা জিলাপী বাতাসা॥
কন্দ গাঠা জজীমিঠা১২৬ এলাচির দানা।
রাশি রাশি আনারসি তক্তি পেড়া ছানা॥
মিষ্ট দ্রব্য দিল সর্ব্ব কত কব তারে১২৭।
ফল আদি নিরবধি দিল ভারে ভারে॥
সভা করি সারি সারি বসি চতুর্ভিতে।
নারীগণ১২৮ আগমন জয়ধ্বনি দিতে॥
স্বর্ণ-পীঠে স্বর্ণ১২৯ঘটে করিয়া স্থাপন।
বেদ-মুখ্য স্বস্তি-বাক্য করে দ্বিজগণ॥
উত্তরাস্যে অপ্রকাশে স্মরি বিষ্ণু-বীজ।
ধ্যানান্তরে পূজা করে পুরোহিত দ্বিজ॥
ঢোল ডম্ফ জগঝম্প খঞ্জরি মৃদঙ্গ১৩০।
তাম্বুরা মন্দিরা আর তবল প্রচঙ্গ॥
সপ্তস্বরা সেতারা আর সারিন্দা পিনাক।
বাঁশী বীণা আদি নানা বাদ্য লাখে লাখ॥
উচ্চ রব করি সব বাজায় সম্মুখে।
বেশ করি বিদ্যাধরী নাচয়ে কৌতুকে॥
সুস্বরিত১৩১ গায় গীত গাথক সকল।
নানা মতে চতুর্ভিতে হৈল সুমঙ্গল॥
হাতে হাত ধরি যত কুলের কামিনী।
স্বর পুরি১৩২ ঘুরি ঘুরি দিচ্ছে জয়ধ্বনি॥
যোড়-হাতে রঘুনাথে করে নিবেদন।
দুঃখ হর কৃপা কর সত্যনারায়ণ॥
দীনহীনে তুমি বিনে আর নাহি বন্ধু।
কৃপা-মন নারায়ণ তার১৩৩ ভবসিন্ধু॥

স্তব অক্ষর চৌতিশ*।

করি যোড় পাণি   কহে স্তুতি-বাণী১৩৪
কাতর কলুষ-ত্রাসে।

১২৫। 'প্রতিবেশী' ইত্যাদি পংক্তি চারিটির স্থলে ক পুথির পাঠ, যথা—'সেবা-দ্রব্য করি ভব্য যত আয়োজন। সন্ধ্যাকালে আরম্ভিলে করি শুভক্ষণ॥ গোরস ইক্ষুক রম্ভা আতব তণ্ডুল। বাটা ভরি সজ্জ করি গুবাক তাম্বুল॥' ১২৬। 'কন্দ' ইত্যাদি স্থলে 'নকুলাদি নানাবিধি' খ। ১২৭। 'মিষ্ট' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে 'যত সর্ব্ব নানা দ্রব্য দিল সদাগর। লিখিতে কহিতে হয় গ্রন্থ বিস্তর॥' ক। ১২৮। 'নারীগণ' ইত্যাদি স্থলে 'মধ্যাজনে বিদ্যাসনে বেদবিধি মতে॥' ক।

১২৯। 'পূর্ণ' ক। ১৩০। 'ঢোল' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ যথা—'ঢাক ঢোল লাখে লাখে মৃদঙ্গ খঞ্জরি। তাম্বুরা সারিন্দা বীণা শানাই ভেউরি॥ সপ্তস্বরা সেতারা কাড়া মন্দিরা পিনাক। বাঁশী রোসনচকি বাজে লাখে লাখ॥'

১৩১। 'সুস্বরেতে' খ। ১৩২। 'স্বর পুরি' স্থলে 'সব নারী' খ। ১৩৩। 'নারায়ণ তার' স্থলে 'গদাধর তরাও' খ। * এই স্তবের কলিগুলি রামকেলি রাগিণী ও একতালা তালে গীত হইয়া থাকে। ১৩৪। 'করি' ইত্যাদি স্থলে 'করি স্তুতি-বাণী করযোড় পাণি' খ।

কৃষ্ণ কৃপাময় কেশি-কংস-জয়১৩৫
ক্লেশ-ক্ষয় কর দাসে১৩৬ ॥
খল-তাপ-কারী খল-ক্ষয় করি
খিতি ধরিছ আপনে।
খীরোদ-নিবাসী খগেন্দ্র-বিলাসী
খেমা কর খিন জনে ॥
গোলক ছাড়িয়া গোপ-গৃহে যায়্যা
গোবর্দ্ধন-গিরিধারী।
গোপ-শিশু লয়্যা গো-ধেনু চরায়্যা
গোপী-চিত্ত কৈলা চুরি ॥
ঘোর ভবার্ণবে ঘূর্ণিত এ সবে
ঘেরিছে শমন-দূতে।
ঘরের সেবক ঘুচাও বিপাক১৩৭
ঘোষণা রবে১৩৮ জগতে ॥
উৎপত্তি-কারী উনমত্ত-ঐশ্বর্য্য
উদ্ভিষ্যায় অবস্থিতি।
উক্তি-মুক্তি-দাতা উমাপতি ধাতা১৩৯
উদ্দেশিয়া করে স্তুতি ॥
চণ্ডী-চক্রেশ্বর১৪০ চতুর্ভুজ-ধর
চন্দ্রচূড়ার্দ্ধাঙ্গ-মাথা১৪১।
চারু চন্দ্র-বর১৪২ চরণে নখর১৪৩
চূড়ায় ময়ূর-পাখা ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-কারী শ্রীপতি শ্রীহরি
শ্রদ্ধা স্নেহ অবতীর্ণ।
ছিল দশ-মুণ্ড ছত্র নব দণ্ড
ছলে কৈলা ছিন্ন ভিন্ন ॥
জয় জনার্দ্দিন জাদব-নন্দন
জয় জগন্নাথ-স্বামী।
জগত-কারণ জগত-পালন
জগত-নাশনে জামী১৪৪ ॥
ঝলমল মুখ ঝলকে ত্রিলোক
ঝলমল বন মালা।

১৩৫। 'কশিক হৃদয়' খ। ১৩৬। 'ক্লেশ দিলা দীন দাসে' খ। ১৩৭। অপদে' খ। ১৩৮। 'করে' খ। ১৩৯। 'উক্তি' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ১৪০। 'চণ্ডেশ্বরী' খ। ১৪১। 'চন্দ্র'-ইত্যাদি স্থলে 'চন্দ্রচূড়াঙ্গনা মাথা' খ। ১৪২। 'চন্দ্রধর' খ। ১৪৩। 'চরণে নখর' স্থলে 'চরণ নির্ম্মল' খ। ১৪৪। 'জগত'—ইত্যাদি স্থলে 'জগত-সংসার-কর্ত্তা তুমি' খ। 'জামী' (সংস্কৃত—'যামী')= প্রহরী।

ঝাপনে১৪৫ কলুশ ঝঙ্কারে মানুষ
ঝাটে হয়১৪৬ যম-জ্বালা ॥
নিয়মিত-কর্ত্তা নিয়মিত-ভর্ত্তা
নিয়তস্বরূপ তুমি।
নিয়মিত-বন্ধু নিস্তার-মুকুন্দ
নিদানে পরিছি আমি১৪৭ ॥
টুটাইছে যমে টোনসরোসমে(?)
টঙ্ক*-ধারী অনুচরে১৪৮।
টঙ্কারহ ধনু টলমল তনু১৪৯
টুটাও ভব কিঙ্করে ॥
ঠাকুর নিকটে ঠেকেছি সঙ্কটে
ঠাইট নাহি মারে দাসে১৫০† ।
ঠেকিয়াছি ঘোরে ঠাণ্ডা কর মোরে
ঠাই দিয়া পদ পাশে ॥
ডাহিনে বামেতে ডাঙ্গ‡ বাণ হাতে
ডংসিছে¶ শমন-দূতে।
ডর নাহি তাকে ডাকিয়া তোমাকে
ডঙ্কা মারি** রবিসুতে ॥
ঢাক ঢোল আদি ঢক্কা নানাবিধি১৫১
ঢল ঢল কাঁসী বাজে।

১৪৫। 'ঝলকে' খ। ১৪৬। 'নাশ' খ। ১৪৭। 'নিয়মিত' ইত্যাদি চারি পংক্তির স্থলে খ পুথির পাঠ, যথা—'নিয়ত-কারণ নিমিত্ত-পূরণ
নির্ধন জনের বন্ধু।
নিরঞ্জন রূপ নির্ব্বিকার-স্বরূপ
নিত্য নিত্য ভব-সিন্ধু ॥'

* 'টঙ্ক'=পাষাণ-ভেদকারী যন্ত্র-বিশেষ। ১৪৮। 'টুটাইছে' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় স্থলে খ পুথির পাঠ যথা— 'টলমল নীরে টুটিয়া গম্ভীরে
টুটাইলা ভূমি-তলে।'

১৪৯। 'টঙ্কারহ' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয় খ পুথিতে নাই। ১৫০। 'ঠাইট' ইত্যাদি স্থলে 'ঠাই দেও দীন দাসে' খ। † 'ঠাইট' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—(সুবিবেচক প্রভু) দাসকে ঠাইট অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মারে না অর্থাৎ কিঞ্চিৎ লঘু শাস্তি দিয়াই ছাড়িয়া দেয়। ‡ 'ডাঙ্গ'=অঙ্কুশ-আকার অস্ত্রবিশেষ। ¶ 'ডংসিছে'=পীড়ন করিতেছে; (এখানে দংশন অর্থ সঙ্গত হয় না; বিদ্যাপতির পদাবলির 'দমন-লতা জনু দমসল হাতি' ইত্যাদির সহিত তুলনীয়)। ** 'ডঙ্কা মারি'=বিজয়-সূচক ডঙ্কা-ধ্বনি করি। ১৫১। 'ঢাক' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির স্থলে ক পুথির পাঠ, যথা—'ঢুলু ঢুলু নেত্র ঢুলু ঢুলু গাত্র ঢল ঢল কাঁশী বাজে।
ঢমুক লইয়া ঢমুক বাজায়্যা ঢম্প করিয়া সাজে ॥'

ঢোলে বাজে তাল ঢোলে বন-মাল
ঢুলু ঢুলু আঁখি সাজে ॥
অনন্ত-সংস্থিত অনন্ত-বেষ্টিত১৫২
অনন্ত তোমার নাম।
অনন্ত-শয়ন অনাদি-নিধন
অনাথে না হৈয় বাম ॥
ত্রিলোক-তারক১৫৩ ত্রিগুণ-ধারক
তভু তোমা১৫৪ কেবা জানে।
তাপিত তনয় ত্রাসিত-হৃদয়
ত্রাণ কর নিজ-গুণে১৫৫ ॥
স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি স্থিতি যম
স্থূলাস্থূল১৫৬ ভূমণ্ডলে।
থরথর১৫৭ ভয় থকিত-হৃদয়
স্থান দেও পদতলে ॥
দনুজ-দলন দৈবকি-নন্দন
দুষ্ট কংসাসুর-বৈরি।
দীনহীন বন্ধু দয়াময় সিন্ধু
দরিদ্র-তরণে তরি১৫৮ ॥
ধরাধর ধরি ধরণী উদ্ধারি
ধন্য করিলে মহিমা১৫৯।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে ধাতা ত্রিলোচনে
ধ্যানেতে না পায় সীমা১৬০ ॥
নম নারায়ণ নম জনার্দ্দন
নরসিংহ-অবতারী।
নম সনাতন নম নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি১৬১ ॥

১৫২। 'ব্যাপিত' খ। ১৫৩। 'ত্রিগুণ-পালক' খ। ১৫৪। 'তভু তোমা' স্থলে 'তব গুণ' খ। ১৫৫। 'নিজ-গুণে' স্থলে 'দীন জনে' খ। ১৫৬। 'স্থান রেখ' খ। ১৫৭। 'থরসুর' খ। ১৫৮। 'দরিদ্র জনের তরি' খ। ১৫৯। 'ধন্য' ইত্যাদি স্থলে 'ধারণ করেছ অঙ্গে' খ। ১৬০। 'ধর্ম্মাধর্ম্ম' ইত্যাদি স্থলে

ধরি গোবর্দ্ধন ধন্য ত্রিভুবন
ধরিলা চরণ-তরঙ্গে।—খ পুথি।

১৬১। 'নম নারায়ণ' ইত্যাদি স্থলে—

'নমো নমো নম নমো নরোত্তম
নমো নৃসিংহ অবতারী।
নমো নারায়ণ নমো নিরঞ্জন
নমো নম নরহরি ॥'

পরম কারণ পতিত-পাবন
পতিত জনের বন্ধু।
পতিত কিঙ্করে পাপিষ্ঠ পামরে[১৬২]
পার কর ভব-সিন্ধু॥
ফণি-বৈরি-কন্ধে ফিরহ[১৬৩] আনন্দে
ফণি-সজ্জা ফণি-পতি।
ফণি-মণি গলে ফণি-রূপ ছলে
ফণায় ধরিছ ক্ষিতি॥
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী বিপিন-বিলাসী
বৃন্দাবনে বংশীধারী।
বক বধিবারে বসুদেব-ঘরে
বলভদ্র-অবতারী॥
ভারাবতারণে ভুবন-পালনে
ভৃগুরাম অবতার।
ভব-ভয়ে ভীত[১৬৪] ভকতি-বঞ্চিত
ভবার্ণবে কর পার॥
মোহিনীর ছলে মোহি দৈত্যকুলে
মায়াতে করিলা নষ্ট।
মুকুন্দ মুরারি মধুকৈটভারি
মহিমা বেদ-অস্পষ্ট॥
যজ্ঞ-যোগ্য-কারী যজ্ঞ-যম-হারী
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞবিধি[১৬৫]।
যোগ-নিদ্রা-রূপ যোগেন্দ্র-স্বরূপ
যোগমায়াময় নিধি॥
রাম-রূপ ধরি রাবণ সংহারি
রক্ষা কৈলা সুর-লোকে।
রবির তনয় রিপু দুরাশয়
রক্ষিতা হও সেবকে॥
লয়্যা তব নাম লঙ্ঘি সিন্ধুধাম
লঙ্কা-জয়ী হনুমান।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন লক্ষ্মী-নারায়ণ
লক্ষ্মীপতি ভগবান॥
বামন হইয়া বলিকে ছলিয়া
ব্রহ্মাণ্ডে[১৬৬] লইলা ভিক্ষা।

১৬২। 'পতিত' ইত্যাদি স্থলে 'প্রণত কিঙ্করে পড়িয়া পাথারে' খ। ১৬৩। 'ফিরয়ে' খ। ১৬৪। 'ভব' ইত্যাদি স্থলে 'ভয়ভীত-চীত' ক। ১৬৫। 'যজ্ঞ' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের স্থলে ক পুথির পাঠ যথা,—'জয় শ্রীমুরারি, জয় জয় হরি, যজ্ঞেশ্বর বেদ-বিধি।' ১৬৬। 'ব্রাহ্মণে' খ।

বরাহ-রূপেতে বসিয়া বনেতে১৬৭
বসুমতী কৈলা রক্ষা ॥
শক্তি-শূলধর শঙ্খচক্রেশ্বর
শম্ভু স্বর স্বরূপিণে১৬৮।
শর-বাহু ঐরি শশি-কলা ধরি
শাক্তানন্দ প্রদাইলে১৬৯ ॥
ষড়্‌গুণাশ্রিত ষট্‌কর্ম্ম-বর্জ্জিত
ষষ্ঠীরাত্র-নির্ব্বন্ধিতা।
ষড়্‌ভুজ-ধারী ষড়্‌রিপু-হারী
ষোড়শ-কলা-পূর্ণিতা* ॥
সর্ব্ব-বেদ-বিধি সর্ব্ব-গুণ-নিধি
সর্ব্ব জীবে তুমি ভর্ত্তা।
সৌখ্য-মোক্ষ-দাতা সংসার-পালিতা
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব-কর্ত্তা ॥
হাস্য-লীলা করি হৈলা হর-হরি
হলধর অবতীর্ণ।
হিরণ্যকশিপু হৈয়া তার রিপু
হেলায় করিলা চূর্ণ ॥
ক্ষত্রিয় সকলে ক্ষয় কৈলা ছলে
ক্ষেত্রপাল-রূপ ধরি।
ক্ষীণ দীনহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি জন১৭০
ক্ষমা কর নরহরি ॥

স্তব শুনি দেব-মণি হৈলা অধিষ্ঠান।
তুষ্ট হৈলা বর দিলা হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
পূজা সাঙ্গে হৃষ্ট-অঙ্গে সাধু লক্ষপতি।
নিমন্ত্রিত বিদায়িত কৈলা যথামতি১৭১ ॥
কত দিনে কালহীনে কালপূর্ণ হৈল।
লীলাবতী সঙ্গে করি স্বর্গপুরে গেল ॥
ভক্তি-ভাবে যেই সবে পূজে চিরকাল।
ধনবংশে নিজ অংশে বাড়ে ঠাকুরাল † ॥
সত্য-দেব মনে ভাব গুরু-দত্ত নাম।
সমাপ্ত হইল পুথি করহ প্রণাম ॥
দ্বিজ রঘুনাথে কহে সত্য-দেব স্মরি।
সত্য-নারায়ণ-প্রীতে বল হরি হরি১৭২ ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

১৬৭। 'বামেতে' খ। ১৬৮। 'স্বরূপিণী' খ। 'শম্ভু' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ বোধ হয় এই যে—শম্ভু-স্বরূপ তুমি স্বর অর্থাৎ স্বরোদয়-শাস্ত্র স্বরূপ অর্থাৎ নির্ণয় করিয়াছ। ১৬৯। 'প্রদাইনী' খ। * 'পূর্ণিতা'=পূরয়িতা অর্থাৎ পূর্ণ-কর্ত্তা। ১৭০। 'ক্ষীণ' ইত্যাদি স্থলে—'ক্ষীণ হীন জনে ক্ষুদ্র রুদ্র জ্ঞান' খ। ১৭১। 'বিদায়িত' ইত্যাদি স্থলে 'লোক যত যায় যথা তথি' খ। † 'ঠাকুরাল'=ঠাকুরালি অর্থাৎ প্রভুত্ব। ১৭২। 'দ্বিজ' ইত্যাদি অন্তিম কলিটি ক পুথিতে নাই।

"সংবাদসাধুরঞ্জন"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে সংবাদ-প্রভাকরের ফাইলের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদসাধুরঞ্জনের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।

যে সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার তারিখ সোমবার, ১৫ই চৈত্র ১২৬০ সাল; ২৭ মার্চ ১৮১৪ সাল। উপরে ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। মাসিক মূল্য ।০ আনা মাত্র বলিয়া লিখিত আছে।

পত্রের নাম "সংবাদসাধুরঞ্জন"। আকার তৎকালীন প্রাত্যহিক সংবাদ-প্রভাকরের মত ১১"×৮॥"। ৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভ্রমক্রমে এই পত্রের নাম "সুধীরঞ্জন" বলিয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য সংখ্যা হইতে দেখা যায়, তাহা ঠিক নয়। সুধীরঞ্জন সংবাদপত্র নহে, গদ্যপদ্যময় একখানি পুস্তক, গুপ্তশিষ্য কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারি-প্রণীত। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৬২ সালের সংবাদ-প্রভাকরে সুধীরঞ্জন সম্বন্ধে দ্বারকানাথ অধিকারী স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে,—"মদ্রচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত এই অভিনব পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রভাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রন্থ ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, যে কোন মহাশয়ের গ্রহণেচ্ছা হয় মূল্য সহকারে এই যন্ত্রালয়ে অথবা কৃষ্ণনগরে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন, মূল্য এক তঙ্কা মাত্র।"

'সংবাদসাধুরঞ্জনে"র আলোচ্য সংখ্যার কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বঙ্গপদ্যানুবাদ দৃষ্ট হয়,—

> "প্রচণ্ডপাষণ্ডতরুপ্রভঞ্জনঃ। সমস্তসল্লোকমনোহনুরঞ্জনঃ॥
> সদা সদালোচনলোচনাঞ্জনঃ। প্রকাশতে সংপ্রতি সাধুরঞ্জনঃ॥
> প্রচণ্ড পাষণ্ডরূপ তরুপ্রভঞ্জন। সমস্ত সজ্জনগণ মানসরঞ্জন॥
> সদা সৎ আলোচন লোচন অঞ্জন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরঞ্জন॥"

এই সংবাদপত্র সাপ্তাহিক ছিল। পত্রের শেষ পৃষ্ঠার শেষ কলমের অন্তভাগে লিখিত আছে —"এই সাধুরঞ্জন পত্র প্রতি সোমবার প্রভাকর যন্ত্রে প্রকাশ হয়। মাসিক মূল্য ।০ আনা, অগ্রিম বার্ষিক ২॥০ টাকা।" এবং পত্রের শেষে ইংরাজিতে—"Printed and Published by Hurrinarain Bose, at the Probhakur Press for the Proprietor."

আলোচ্য খণ্ড ৩৪১ সংখ্যা বলিয়া পত্রের কণ্ঠদেশে উল্লিখিত হইয়াছে। "সাধুরঞ্জন" পত্রের আবির্ভাব সাপ্তাহিক "পাষণ্ডপীড়নের" মৃত্যুর পর *। ১২৫৪ সালের ভাদ্র

* পাষণ্ডপীড়নের প্রচারকাল ৭ই আষাঢ় ১২৫৩ হইতে ভাদ্র ১২৫৪ পর্য্যন্ত। (সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ দ্রষ্টব্য)।

মাসে (সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭ খ্রীঃ অঃ) হইতে প্রথম প্রচার হয়। উল্লিখিত সংখ্যা হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

আলোচ্য সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা সংবাদপ্রভাকরের প্রথম পৃষ্ঠার ন্যায় আদ্যন্ত বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক পৃষ্ঠা প্রভাকরের মত তিন কলমে বিভক্ত। এই পৃষ্ঠায় ৪টি বিজ্ঞাপন আছে। (১) প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বাক্ষরিত প্রভাকরের মূল্যাদি প্রেরণ সম্বন্ধে গ্রাহকগণের প্রতি বিজ্ঞাপন। (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন যে, তাঁহার চারুপাঠ ও দুই ভাগ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে, লালবাজারে রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে এবং পটলডাঙ্গায় চিপ লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (৩) শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে, "খ্রীষ্টীয়ান বিরোধি" নামক যে "মাসিক পুস্তক" ষষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় "আগামি মাস অবধি প্রকাশিত হইবে"। উপরোক্ত পুস্তকালয়ে অধিকন্তু প্রভাকর যন্ত্রালয়ে কিম্বা নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে প্রাপ্তিস্থান। "অতএব দেশহিতৈষী হিন্দু মহাশয়দিগের প্রতি প্রকাশকের নিবেদন এই যে, তাঁহারা স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে কিছুমাত্র কৃপণতা না করেন।" (৪) গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স স্বাক্ষরিত নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি নামক পুস্তকের দোকানের বিজ্ঞাপন। ঠিকানা "মেছুয়াবাজারে সিন্দুরিয়াপটির ৬৭ নং ভবনে।"

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে প্রথমেই "হালিসহর নিবাসি বিচক্ষণ চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু বামাচরণ বরাট মহাশয় আমারদিগের যন্ত্রালয়ে অবস্থান করিতেছেন"। তিনি অনেক উৎকট রোগ আরাম করিয়া থাকেন, এইরূপ বিজ্ঞাপন। তৎপরে এই কলমের মধ্যভাগ হইতে পত্রের আরম্ভ। এইখানে ১৫ই চৈত্র শকাব্দাঃ ১৭৭৫, এইরূপ তারিখ দেওয়া আছে। প্রথমে দোলের সময় ভবানীপুরে কোন ভদ্রলোক পথিকগণের প্রতি আবির নিক্ষেপ করিবার সময় ভ্রমক্রমে "মেং টরেন্স জজ সাহেবের কোনও চাকরের গাত্রে" ফাগ নিক্ষেপ করেন ও কালীঘাটের দারোগা কর্ত্তৃক তজ্জন্য বাবুর গ্রেপ্তার ও ২০০৲ টাকা জামিনে খালাসের সংবাদ। "কিন্তু তাহার মোকদ্দমা এ পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, অতএব এই আবিরের আমোদে কি পর্য্যন্ত অমোদ হইবেক তাহা বলা যায় না।" এই সংবাদবিবরণ ২ পৃষ্ঠার ২য় কলমের মধ্য পর্য্যন্ত। তৎপরে ২য় কলমের মধ্যভাগ হইতে ৩য় কলম, ৩য় পৃষ্ঠার প্রথম কলম ও ২য় কলমের কিয়দংশ পর্য্যন্ত কোন অজ্ঞাতনামা পত্রপ্রেরকের বিদ্যাশিক্ষার শ্রেষ্ঠতা ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্তী গদ্যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। নমুনা যথা—"মানববৃন্দের চিত্তস্বরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে বিদ্যানাম্নী কল্পবৃক্ষের বীজ রোপিত হইলে জ্ঞানরূপ তদঙ্কুর উন্মীলন হইয়া যত্নাম্বু সেচন করণে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হওত তরুণতরু সমূহেতে ঔদার্য্য ধৈর্য্য গাম্ভির্য্য শৌর্য্য তৌর্য্যাদি সুগন্ধি সুন্দর কুসুমাদিতে সুরম্য চিত্ত ক্ষেত্রে সুশোভিত করে। এবং সেই মনোবন অরণ্যানি অভ্যন্তরে সতত মনোমধুপ মনানন্দে মকরন্দ পানে নিমগ্ন থাকে। এবং সেই

নিকুঞ্জমধ্যে কোকিলকুলকলালাপ তুল্য সদা সদালাপ উৎপাদন হয়।" ইত্যাদি। তৎপরে ছয় লাইন বিলাতি সংবাদপত্র হইতে স্যার জে বাইগন সম্বন্ধে খবর।

৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমের মধ্যভাগ হইতে ৪র্থ পৃষ্ঠার ১ম কলমের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত "ছাত্র হইতে প্রাপ্ত" শীর্ষক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ। বিষয় "করুণাময় বিশ্বাধিপ"এর গুণকীর্ত্তন ও তৎসমীপে প্রার্থনা। ভাষা পূর্ব্বোদ্ধৃত নমুনার মত। প্রবন্ধের শেষে "কস্যচিৎ বলাগড়ি বিদ্যালয়স্থ ছাত্রস্য" স্বাক্ষর।

তৎপরে ৫র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলমের মধ্য হইতে উক্ত পৃষ্ঠার ৩য় কলমের অর্থাৎ পত্রের শেষ পর্য্যন্ত "কস্যচিত হুগলীশাখা পাঠশালাস্থ চাত্রস্য। সাং কাঞ্চনপল্লী" স্বাক্ষরিত নামহীন দীর্ঘ কবিতা। কবিতার শিরোভাগে এইরূপ লিখিত আছে—"মহাশয় মদীয় নিম্নস্থ কতিপয় পদ্যপংক্তি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর ভবদীয় সাধুরঞ্জন পত্রৈকপ্রান্তভাগে স্থান দানে উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা হইবেক।" কবিতাটি গুপ্তকবির কবিতার অনুকরণে লিখিত, বিশেষত্ব কিছুই নাই। আরম্ভ যথা—

"উঠরে কামিনী প্রাণ যামিনী পোহালো। গবাক্ষের দ্বার দিয়া আসিতেছে আলো॥"

বিষয়—নায়িকাসম্বোধনে প্রভাতবর্ণন ও নায়িকার মানভঞ্জন। আধুনিক মাপকাটীতে মাপিলে রুচি বিশেষ মার্জ্জিত নহে। "বদন খুলিয়া প্রাণ, তোষ হে মদন। অথবা রদন দিয়া করহ দংশন" প্রভৃতি পাঠকের মনোজ্ঞ না হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় এই কবিতার আর বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে বক্তব্য, এই "সাধুরঞ্জন" পত্র গুপ্তকবির সম্পাদকতায় এককালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ইহার প্রচার ১২৬২ সালে রহিত হয়। ঈশ্বর-গুপ্তের শিষ্যসম্প্রদায়ের রচনাসমূহ এই পত্রে প্রকাশিত হইত। কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকা-নাথ অধিকারী, হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুকলেজের দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ইহাতে কবিতাদি লিখিয়া লিপিনৈপুণ্যের অভ্যাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দীনবন্ধুর সাহিত্যে "হাতে খড়ী" এই সাধুরঞ্জন পত্রে। দীনবন্ধুর সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত কতিপয় কবিতাবলী তাঁহার "পদ্যসংগ্রহে" (১৮৬৬) সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "মানব-চরিত্র" শীর্ষক উক্ত পত্রে প্রথম প্রকাশিত কবিতার বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

সেই জন্য পরিশেষে সবিনয় অনুরোধ এই যে, যদি কোন মহোদয়ের নিকট সংবাদ-সাধুরঞ্জনের অন্য কোনও সংখ্যা থাকে, তবে তিনি যদি তাহা অনুগ্রহ করিয়া পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে পাঠাইয়া দেন, তবে তাহা বিশেষ যত্নের ও আদরের সহিত রক্ষিত হইবে।

শ্রীসুশীলকুমার দে

ভদ্রার্জ্জুন *

ভদ্রার্জ্জুন নাটক শকাব্দ ১৭৭৪ (ইং ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশিত। অনেকের মতে (যথা—রাজনারায়ণ বসু, গঙ্গাচরণ সরকার ইত্যাদি) ইহা বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে গঠিত সর্ব্বপ্রথম নাটক। সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে ইহার যে মূল সংস্করণ রক্ষিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এ অপূর্ব্ব নাটকের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়াই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহার পরিচয়পত্র বা title page এইরূপ,—

ভদ্রার্জুন | অর্থাৎ | অর্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ। | শ্রীতারাচরণ শীকদার কর্তৃক প্রণীত। "মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা। | সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা" ॥ | কলিকাতা | চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। | শকাব্দ ১৭৭৪। |

পুস্তকের আকার ৭"×৭"।

ইহার পর ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপন অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহাতে নাট্যকার এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার উদ্দেশ্য, তাঁহার ভাষাপ্রয়োগ, রচনাপ্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং দীর্ঘ হইলেও ইহার সমস্তটাই (পত্রাঙ্ক সহিত) এইখানে উদ্ধৃত হইল।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। ভদ্রার্জ্জুন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় "নারায়ণে" (১ম বর্ষ, ১৩২১-২) "বাঙ্গালা আদি নাটক" এবং "প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং উক্ত নাটকেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমালোচনা নহে; উক্ত দুষ্প্রাপ্য নাটকের বিস্তৃত বিবরণ শরৎবাবু দেন নাই, এখানে তাহাই দেওয়া হইল। শরৎবাবুর প্রবন্ধে উল্লিখিত হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতী চিত্তবিলাস" ১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ রচিত, এইরূপ কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় আছে। ইহা কোন মতেই ভদ্রার্জ্জুন নাটকের পূর্ব্বে রচিত বলা যায় না। উক্ত পত্রিকায় শরৎবাবুর "বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের পূর্ব্বকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত "রমণী নাটক"এর উল্লেখ আছে। এই "নাটকের" এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে আছে; এ সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক। ইহা একখানি বিদ্যাসুন্দর ধরণের অথচ তদপেক্ষা বিকৃতরুচির পরিচায়ক কাব্য, নাটক নহে; দীনেশবাবু বোধ হয়, ইহার নাম দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রমণী নাটকের পরিচয় পত্র বা title page এইরূপ:—"শ্রীশ্রীকালী। / ভরসা। / রমণী নাটক। / নামক গ্রন্থ। / কলিকাতা শ্যামপুষ্করিণীনিবাসি / শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক গৌড়িয় সুসাধু সরল / বঙ্গভাষায় পয়ারাদি / বিবিধ প্রকার অভি / নব ছন্দে দিব্য ২ / নব্য কাব্য স / হিত বির / চিত হ / ইয়া। / ভে বেনুর্জী এণ্ড কোংদিগের ইষ্ট / ইণ্ডিয়ান্ নামক ছাপা যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল। / সন ১২৫৪ সাল শকাব্দাঃ ১৭৬৯ / ইং ১৮৪৮ সাল। / এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক শ্যাম / পুষ্করিণীর নং ৪৩ ভবনে তত্ত্ব করিলে / পাইতে পারিবেন॥ / মূল্য ১ টাকা মাত্র। /" উক্ত পঞ্চানন ও অরুণোদয় পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন কি এক ব্যক্তি?

[১] বিজ্ঞাপন

"মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধন লাভকে প্রধান জ্ঞান করেন ; কাহারও বা অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে ; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্য করে না। প্রাগুক্ত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জন্য পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্যসমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তারদিগেরও মানস চন্দ্রমা তুচ্ছ লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয় ; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, [২] অবশ্যই তাহার একপ্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও সূক্ষ্মদর্শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।

"আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কিয়দ্দিন পরে কতিপয় বিজ্ঞবর বিদ্বান্ বন্ধুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম ; তাঁহারা সকলেই ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এতাদৃশ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে গ্রন্থকর্ত্তাকে কোনক্রমেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবেক না। এবং ইঙ্গরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যায় নিপুণ কৃরাব্যা * যে রচনা পাঠ করিয়া মনোরম জ্ঞান করেন তাহা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিবার আর সন্দেহ থাকে না ; অতএব আমি এই সাহসে সাহসী হইয়া ঈদৃশ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থখানি পাঠক মহাশয়দিগের আদরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কি অনাদৃত হইয়া তাঁহারদিগের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিতি করিবে, ইহার কিছুই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না ; কিন্তু এই মাত্র সাহস করি, যাহা দশজন মহোদয় পণ্ডিতের মনোনীত হইয়াছে, তাহা কখনই সাধারণের অগ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

[৩] "কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করা অতি দুঃসাধ্য, যেহেতু সর্ব্বমনোরঞ্জক কোন পদার্থ এই জগন্মণ্ডলে অদ্যাপি জন্মে নাই। অধিক কি কহিব, যিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া যথানিয়মে প্রতিপালন করিতেছেন, সেই বিশ্বপিতা জগদীশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করেন। অতএব অতি অকিঞ্চিৎকর এই পুস্তক দ্বারা কি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব? বিশেষত: বাঙ্গালা ভাষা এখনও নবীনা ও অলঙ্কারপরিহীনা, এবং তাঁহার দারিদ্রাবস্থারও শেষ হয় নাই। সংস্কৃত হইতে উপযুক্ত অলঙ্কারাদি আহরণ না করিলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী করা যায় না। যাহা পাঠ করিলে পাঠকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছা আবির্ভাব হয়, ইহাকেই সুভাষা কহা যায়। কেবল কোমল কিম্বা অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই যে ভাষার

* ব্যক্তিরা। এইরূপ ছাপার ভুল আছে।

চিত্তাকর্ষণী শক্তি জন্মে এমন নহে ; কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ অর্থ সৌন্দর্য্য না থাকিলে সকলই নিষ্ফল। অতএব তাহার প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দর্য্যকে অধিকতর জাজ্জল্যমান করাই কর্ত্তব্য ; তাহা হইলে নাটকাদি গ্রন্থ সকল সমীচীনরূপে রচিত হইতে পারে।

[৪] "বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শন শ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহার দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমত নহে ; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্ত্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

[৫] "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে, অতএব তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই ; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইউরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে ; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটকে তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চী-পুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন, যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত [৬] হইত, তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটক নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়। ইওরো-পীয়েরদিগের স্বতন্ত্র নেপথ্যের প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলবগণের

ন্যায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জাদি করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে না। অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

"বিজ্ঞবর মহোদয়গণের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতবচনে প্রার্থনা করিতেছি, যদিও এই গ্রন্থ নবীন নীতিতে প্রণীত হইল, তথাপি একবার ইহার আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়া দোষ গুণ বিচার করিলেই কৃতার্থ হইয়া শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।

শ্রীতারাচরণ শীকদার

শকাব্দ ১৭৭৪।১০ আশ্বিন।

ইহার পরে পয়ারচ্ছন্দে রচিত "আভাস" শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাবনা (পৃঃ ৭—৯) আছে। ইহা নটনটীর উক্তি নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং ছন্দোবন্ধে সামান্যভাবে গল্পাংশের সূচনা করিতেছেন। প্রথমে নাটক-রচনার প্রশংসা, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বৈরিভাব বর্ণনা, পঞ্চ পাণ্ডবের পাঞ্চাল নগরী গমন, পার্থের লক্ষ্যভেদ, জননী-আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদীর সহিত বিবাহ, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজপুরী নির্ম্মাণ ও যথাবিধি রাজ্যশাসন,—

"যথাবিধি রাজকার্য্যে ত্রুটি নাহি তায়।
নারদ আসিয়া মধ্যে ঘটাইলা দায়॥
যাজ্ঞসেনী সহবাসে নিয়ম স্থাপিয়া।
সুরপুরে দেবঋষি গেলেন চলিয়া॥
নারদের নিয়মেতে দেখ কিবা গুণ।
তীর্থযাত্রা করি ভদ্রা হরিলা অর্জ্জুন॥" (পৃ ৯)

ইহার পরে রীতিমত নাটকের আরম্ভ। নাটকখানি ১—১৩২ পৃষ্ঠায় ৫ অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথমেই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা, যথা—(কোন পৃষ্ঠাঙ্ক নাই।)

নাটকসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম

ধৃতরাষ্ট্র	হস্তিনার বৃদ্ধ রাজা
যুধিষ্ঠির	অধিপতি
ভীম	যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ
অর্জ্জুন	
নকুল	
সহদেব	
দুর্য্যোধন	ধৃতরাষ্ট্রের তনয় ও যুবরাজ
দুঃশাসন	ঐ
ভীষ্ম	শান্তনুর তনয়
কর্ণ	দুর্য্যোধনের সখা

বসুদেব	যুধিষ্ঠিরের মাতুল
কৃষ্ণ	বসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র
বলদেব	বসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নারদ	দেবঋষি
দারুক	সারথী

———•———

সত্যভামা	কৃষ্ণের প্রধান মহিষী
রুক্মিণী	কৃষ্ণের দ্বিতীয়া মহিষী
দ্রৌপদী	পাণ্ডবগণের স্ত্রী
সুভদ্রা	কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী
সহচরী	
প্রতিবাসিনী	
অন্যান্য কুলকামিনীগণ	

দূত, দ্বারী, প্রহরী, এক মত্তপ, বাতুল ও পথিকগণ ইত্যাদি।"

প্রথম অঙ্ক—(পৃঃ ১—১৯)

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ১—১০) ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। সভায় যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃগণ সহিত আসীন। নারদ বীণা-যন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। এইখানে একটি গান দিয়া নাটকের সূচনা। তারপর নারদ ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; অন্যান্য পাণ্ডবগণ উপস্থিত থাকিলেও তাঁহারা কোন কথাবার্ত্তা করেন নাই। পাঁচ ভাইএর এক স্ত্রী বলিয়া নারদের ভয় হইয়াছে যে, পাছে এই ব্যাপার লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আপনি একি আজ্ঞা করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে, এ পঞ্চ মধ্যে বিরোধাঙ্কুর উৎপত্তির বীজ কোথায়।" (পৃঃ ৪) নারদ কহিলেন—"ইহার বীজ আপনাদিগের গৃহ মধ্যেই আছে।" বলিয়া সুন্দ উপসুন্দের কথা পয়ারছন্দে বর্ণনা করিলেন (পৃঃ ৬—৯)। এবং ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণের উপায়স্বরূপ পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে কৃষ্ণাসহবাসের জন্য এক নিয়ম স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। "তোমরা এক এক জন দ্রৌপদী সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ তীর্থপর্য্যটন করিতে হইবেক; নতুবা সে পাপ ধ্বংস হইবেক না।" (পৃঃ ১০) তাঁহারা সকলে এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল—(পৃঃ ১১—১৫) রাজপুরীর সিংহদ্বার। দস্যুগণ কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; তিনি আসিয়া অর্জ্জুনের শরণাপন্ন। অর্জ্জুন বলিলেন—"প্রভো, ক্ষণেক বিলম্ব কর।" মহারাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত গৃহমধ্যে বিরাজ

করিতেছেন ; অস্ত্রাদি সেই গৃহেই আছে ; কিন্তু তিনি তথায় প্রবেশ করিতে অক্ষম। ব্রাহ্মণ এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হইলে অর্জ্জুন অগত্যা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর হইলেন। এই দৃশ্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগই অধিক ; সর্ব্বত্র পয়ার, কেবল অর্জ্জুন যেখানে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন, (পৃঃ ১৪—১৫) সেখানে দীর্ঘ ত্রিপদী ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দৃশ্যের শেষভাগে এইরূপ নাট্যসঙ্কেত বা Stage-direction আছে,—

"[এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া তস্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জুনকে আশীরাশি প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন।]"

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১৫—১৯) যুধিষ্ঠিরের শয়নাগার। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে অর্জ্জুন প্রবেশ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ও বিশেষতঃ দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে অনেক নিবারণ করিলেন, পরে ভীম আসিয়া সেই অনুযোগে যোগদান করিলেন ; কিন্তু অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে অশক্ত। "অর্জুন ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।" (পৃঃ ১৯)। এই দৃশ্যে গদ্য পদ্য (পয়ার) দুই ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পয়ার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

"দ্রৌপ। অর্জুন কি বলিতেছে।
যুধি। তীর্থেতে যাইবে।
দ্রৌপ। কিরূপ সম্ভবে ইহা।
অর্জ্জু। অন্যথা নহিবে।
দ্রৌপ। কি কারণে হেন উক্তি।
অর্জ্জু। সন্ধি লঙ্ঘিয়াছি।
দ্রৌপ। লঙ্ঘিয়াছ তাহাতে কি।
অর্জ্জু। দোষী হইয়াছি।
দ্রৌপ। কিসে সন্ধি ভঙ্গ হলো।
অর্জ্জু। তোমার গৃহেতে।
যবে তুমি ছিলে ধর্ম্মরাজের সনেতে।" ইত্যাদি (পৃঃ ১৬—১৭)

দ্বিতীয় অঙ্ক—(পৃঃ ১৯—৩০)

প্রথম সংযোগস্থল, দ্বারকা, বসুদেবের শয়নাগার। বসুদেব আসীন, দেবকী ও রোহিণীর প্রবেশ। সুভদ্রাকে যৌবনস্থা ও বিবাহযোগ্যা দেখিয়া দেবকী ও রোহিণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা। আইবুড়ো মেয়ে বড় হইলে মায়ের মনে উদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত স্বামীকে তাহার বিবাহের জন্য

তাগাদা, এই বাঙ্গালী গৃহের অনুরূপ চিরপরিচিত গার্হস্থ্য চিত্রটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।—

"দেব। তুমিত হে সংসারের কিছুই জান না।
বসু। সংসার করিতে হয় কি রূপে বল না॥
দেব। দুই সন্ধ্যা চতুর্ব্বিধ রসেতে ভোজন।
রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন॥
ইহাই করিলে যে সংসার করা হয়।
মনেতে জানিও ভাল কিছু তাহা নয়॥
বসু। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।
ও কথা বুঝিতে আমি শক্তি নাহি ধরি॥
দেব। কে কি অবস্থায় আছে মনে বিচারিয়া।
পারিবারাদিকে দেখ কটাক্ষ করিয়া॥
রোহি। দিদী, কি বলিতেছ ?
দেব। আমার মাথা,—সুভদ্রার ভাবনাতেই আমার নিদ্রাহার দূর হইয়াছে।
রোহি। বটে,—আমিও ঐ চিন্তামূলে শয়ন করিয়াছি। হা!—বসুদেব কি স্বপ্নেও একবার মনে করেন না।
বসু। তোমরা দুইজনেই যে আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছ, আমি সুভদ্রাকে কি দুরবস্থায় রাখিয়াছি ?
দেব। সুভদ্রার উত্তমোত্তম দ্রব্য ভক্ষণের ভাবনা নাই, পরিধেয় বস্ত্রেরও ভাবনা নাই; রত্নালঙ্কারেরও ভাবনা নাই বটে—। (বলিতে ২ মৌনাবলম্বন করিলেন)
বসু। এতদ্ব্যতীত আর কিসের ভাবনা।
রোহি। তুমি যেন এ কথার কিছুই জান না॥
বসু। আর কি জানিতে হবে স্পষ্ট করি বল।
রোহি। রহস্তে নাহিক কায যাও মেনে চল॥
বসু। কি কথায় রহস্য পাইলে তুমি টের।
রোহি। তোমার নাহিক দোষ মম ভাগ্য ফের॥
বসু। তোমাদের কথা আমি বুঝিতে অক্ষম।
রোহি। তোমারে কি দোষ দিব আমাদেরি ভ্রম॥
বসু। ছন্দোযুক্ত বাক্য ছাড় কহ করি স্পষ্ট।
রোহি। সমান ভাবিও মনে সকলের কষ্ট॥
বসু। সকলের ক্লেশ আমি দেখি সমভাবে।
রোহি। তাহাই দেখিলে পর সব টের পাবে॥

বসু। আমি এ রহস্য বাক্যের মধ্যে নাই।
আনন্দেতে থাক আমি বাহিরেতে যাই ॥
(গমনোদ্‌যোগ করিলেন)
দেব। কটু বাক্য কহে নাই কেন কর ক্রোধ।
অবোধ হইলে তুমি কেবা দিবে বোধ ॥
(বসুদেবের হস্ত ধরিলেন)
বসো ২ কোথা যাও কথাগুলা শুন।
বুঝিতে পারিবে পরে কার মন্দ গুণ ॥
বসু। দেখহে দেবকি আমি না জানি শঠতা।
আমার সহিত কেন কর কপটতা ॥
স্পষ্ট করি বল যাহা বলিবার হয়।
মিছামিছি ছেঁদো কথা গায়ে নাহি সয় ॥
রোহি। করি নাই আমি নাথ তোমারে রহস্য।
তোমার কাছেতে কিবা আছে অপ্রকাশ্য ॥
সুভদ্রারে ঘেরিয়াছে সম্পূর্ণ যৌবন।
হৃদয়েতে সরোরুহ কলিকা দর্শন ॥
এমন যুবতী কন্যা যাহার আগারে।
নিশ্চিন্ত থাকিতে আর নাহি সাজে তারে ॥
অনূঢ়া তনয়া ঘরে বড়ই বালাই।
কখন কি হয় আমি সদা ভাবি তাই ॥” (পৃঃ ২০—২৩)

বসুদেব তখন আশ্বাস দিলেন যে, কাল সকালে কৃষ্ণ বলদেবকে ডাকাইয়া ঘটকাদি আনাইয়া ইহার ব্যবস্থা করিবেন। এখন রাত্রি অধিক, “নিদ্রায় নয়ন ভারি আর না জাগিতে পারি জাগিতে কি প্রয়োজন আর। ভাবনা ত্যজিয়া দূরে চল যাই শয্যাপুরে কল্য প্রাতে হবে প্রতিকার।” (পৃঃ ২৪)

“(অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিন জনেই আপন আপন শয্যাগারে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন।)”

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ২৫—৩০), বসুদেবের উপবেশনাগার। বসুদেব বলদেবকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। “তোমার জননীরা গত রজনীতে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন”। বলদেব বলিলেন,—উপযুক্ত পাত্রের অভাব কি। দুর্য্যোধন রহিয়াছেন। তবে কৃষ্ণকে এ কথা জানান হইবে না; কারণ, দুর্য্যোধন তাঁহার মনোনীত হইবে না। বসুদেব ইহাতে আপত্তি করিলেন; কৃষ্ণকে না জানাইলে প্রমাদ ঘটিতে পারে। বলদেব বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি সমস্ত ঠিক করিবেন, কোনও গোলযোগ হইবে না। বসুদেব তাহাতে উত্তর

করিলেন যে, তিনি বৃদ্ধ, এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই সমস্ত ভার। তবে এমন কার্য্য কর, যাহাতে কৃষ্ণের সহিত কলহ না হয়। প্রথমাংশে গদ্য থাকিলেও শেষটা সমস্ত পয়ার।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৩১—৪০), যদুপুরীর অন্তঃপুর। দেবকী, রোহিণী, সহচরী ও প্রতিবাসিনী প্রবেশ করিল।" রোহিণী শুনিয়াছেন যে, দুর্য্যোধনের সহিত সুভদ্রার সম্বন্ধ ঠিক হইতেছে। ইহাতে দেবকীর আপত্তি। কারণ, দুর্য্যোধন দুশ্চরিত্র ও তাঁহার বাপ ধৃতরাষ্ট্র কাণা।

"দেব। ওমা, সে কি, একটা কাণা বেয়াই হইবে। একে দুর্য্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে। ওমা সেটা বড় লজ্জার কথা।

রোহি। ভাল তাতে বাধা কি ?

দেব। কাণা বেয়াই হইলে লোকে কি বলিবে? তাতে কুটুম্বিতার সুখ হবে না। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সে আজি পর্য্যন্ত চক্ষু মেলে চায় না। বেয়াই বেয়ানের মধ্যে কেহই বধূর মুখ দেখিতে পাবে না, এ কি খাট দুঃখের কথা ?

রোহি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, তাহাকে কি যে সে কাণা কাণা বলিতে পারে ? ধৃতরাষ্ট্র কাণা বটেন্। কিন্তু তাহাতে দুর্য্যোধনত অন্ধ হইবে না আর গান্ধারী মনোদুঃখে চক্ষুরোধ করিয়াছে, এ হেতু সুভদ্রাকে ত নয়ন মুদিয়া থাকিতে হইবে না। অতএব ইহাতে দোষ কি ?

সহ। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা, অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে, তুমিই বিবেচনা কর দেখি ? ছেলের বাপের যদি কোন অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্রত সে দোষে দোষী হয় না।

প্রতি। হাঁ গো বোন্, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী রোহিণী, উহারা ত সেদিনকার মেয়ে। আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত দিয়া দেখিয়াছি।

সহ। ভাল ওঁর বেয়াই কাণা, তাতে ওঁর কি আটক থাবে। বেয়াএর সঙ্গেত ওঁদের কাহারো দেখা হবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে উনি এত খেদিত হইতেছেন কেন।

প্রতি। হাঁ তাইত বটে, বেস বলেছিস্, সুভদ্রার বরটির অঙ্গহীন না হইলেই হয়, সেটির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলেই ভাল। তার বাপ কাণাই হউক, বা খোঁড়াই হউক—তাহাতে ওঁদের ত কিছু বাধিবে না।

সহ। ভাল কথা বলিয়াছ, তাই জিজ্ঞাসা কর দেখি। উনি যে কাণা কাণা করিয়াই হেয় জ্ঞান করিতেছেন।

প্রতি। হাঁ হইতে পারে বেয়াইএর সঙ্গে তামাসার সম্পর্ক। কাণা হইলেত সেটি হবে না।

দেব। তোমরা রহস্য করিতেছ, কর। আমি এ শ্লেষোক্তির মধ্যে নাই আমার কৌতুক করিবার সময় নহে।

প্রতি। ভাল গো, কথার কথা একটা কহিলেই কি রাগ করিতে হয়। তোমাদের মেয়ের বিয়া, তোমরা যাহা করিবে তাহাই হবে; যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর। এ স্থলে আমার থাকিবার প্রয়োজন কি? আমি এখন ঘরে চলিলাম! (প্রতিবাসিনী গমন করিল)" ইত্যাদি। পৃঃ ৩৩—৩৪।

তার পর অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সুভদ্রার যেখানে ভবিতব্য, সেইখানেই হইবে। বিধাতার নির্ব্বন্ধ যাহা তাহা কে অন্যথা করিবে?

এ দৃশ্য সমস্তটাই উদ্ধৃত হইবার যোগ্য, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাহা হইতে বিরত হইলাম। ভদ্রার্জ্জুন নাটকে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য;—প্রথম, ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা। মহাভারতীয় গুরু-গম্ভীর কথা অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইহার ভাষা সর্ব্বত্র নিতান্ত খেলো না হইলেও সরল ও অনাড়ম্বর। পয়ারাদি ছন্দ ব্যবহৃত হইলেও কঠিন বা "সাধু" ভাষা প্রয়োগেচ্ছার উদাহরণ দু-এক স্থল ভিন্ন বিরল।* উপরোদ্ধৃত নাট্যকারের বিজ্ঞাপনেও তিনি তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, ইহার চরিত্রগুলি বেশ সজীব। যদিও বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি মহাভারতোক্ত চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার সর্ব্বদা স্বকীয় জীবনের ও মানব-চরিত্রের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে দেবকী, রোহিণী ও তাঁহাদের সখীবৃন্দের কথোপকথন বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের মধ্যে বিবাহের "ঘোট" যেরূপ হয়, সেইরূপ করিয়াই অঙ্কিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ ভাষা ও চরিত্র-চিত্রাঙ্কণ প্রাত্যহিক জীবনের আদর্শের কাছাকাছি রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক। (পৃঃ ৪০—৫৩)

প্রথম সংযোগস্থল। প্রভাস তীর্থ, অর্জ্জুনের আগমন। দারুক, প্রহরী ও একজন সেনা অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিয়া, তাঁহার আগমন-সংবাদ কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাওন। সমস্ত কথোপকথন গদ্যে।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল। (পৃঃ ৪৩—৪৫) কৃষ্ণের সভা। দারুক প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ রথ আনিতে ও সমস্ত পুরজনকে অর্জ্জুনের অভ্যর্থনার্থে রৈবত পর্ব্বতে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত গদ্যে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৫—৪৭)। প্রভাস তীর্থ, কৃষ্ণ ও দারুক কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা। সমস্তটা গদ্যে রচিত।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ৪৭—৫৩)। পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। সত্যভামা সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের কথা ও পূর্ব্ব-ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রৈবতকে মহোৎসবের

---

* অবশ্য অনেক স্থলে কাব্যোৎকর্ষ বিধান করিবার জন্য ভারতচন্দ্রাদির অনুকরণে কবি কৃত্রিমতাপূর্ণ অস্বাভাবিক ও উৎকট বাক্য-কণ্টকিত ভাষাবিন্যাস করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রেমবর্ণনায়, নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায়। উদাহরণ পশ্চাৎ দেওয়া গেল।

বর্ণনা। প্রায় সমস্তটা পদ্যে (পয়ার ও দীর্ঘ-ত্রিপদী) রচিত। শেষভাগে গদ্য (এক পৃষ্ঠা) ব্যবহৃত হইয়াছে। এ কয়টি দৃশ্যে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ৫৩—৬১)। রাজবর্ত্ম। কৃষ্ণ ও অর্জুন (নেপথ্যে) রথে আসিতেছেন; এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী, পথিক, ও প্রহরীর কথোপকথনচ্ছলে তাহার বর্ণনা। বিদূষক বর্জ্জন করিয়া নাট্যকার এইরূপ হাস্যাস্পদ প্রসঙ্গ (Comic element) আনিয়াছেন। এই দৃশ্যের প্রথম হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। এ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং হাস্যোদ্রেকের চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই।

পঞ্চম সংযোগস্থল।

রাজবর্ত্ম।

এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল।

মদ্যপায়ী গান করিতেছে।

রাগিণী পরজ কালাংড়া। তাল ধিমা তেতালা।

কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা।
সুধাহ্রদে ডুবি যেন এ প্রাণ হারাই॥
চষকে চষকে পূরি, আর পিতে নাহি পারি,
মুখে কেহ তুলে দিলে, তবে তুষ্ট হয়ে খাই॥

বাতু। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্?

মদ্য। ওরে শ্যালা মার নাম গাইতেছি।

বাতু। তুই শ্যালা মদ খাইয়াছিস্। উঁঃ—শ্যালার মুখে গন্ধ দেখ।

মদ্য। আমি মদ খাইয়াছি তোর কি? আজ বড় খুসি আছি, দেখ শ্যালা কৃষ্ণের রথ আসিতেছে, ওর ভিতর অর্জুন আছে।

বাতু। কৈরে ব্যাটা অর্জুন কোথা,—তুই বেটা কয় পাত্র খাইয়াছিস।*

মদ্য। কয় পাত্র,—ওরে শ্যালা অগুন্তি—অগুন্তি। সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, আবার অর্জুনকে দেখে আবার খাব। আজ বড় আমোদ, তুই বেটা পাগল বৈত নৈস্, তুই কি জান্‌বি। তোর বুদ্ধি আছে, না জ্ঞান আছে।

(ইহা বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে পুনর্ব্বার গান আরম্ভ করিল)

ঐ আস্‌তেছে অর্জ্জুন।
আমি মদের জন্যে হব খুন॥
যখন অর্জ্জুন আস্‌বে কাছে
তার কাছে ভিক্ষা চাব,
সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে,

* বাতুল ঠিক বাতুলের মত কথা কহিতেছে না।

তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।

ঐ আস্‌চেছে অর্জুন।

১ম পথি। ঐ দেখ ভাই, একজন মাতাল নৃত্যগীত করিতেছে। চল নিকটে গিয়া দেখি।

২য় পথি। না ভাই মাতালের নিকট যাওয়া উচিত নহে। মাতালের কি জ্ঞান থাকে? সে কি বলিতে কি বলিবে। লোকে বলে, দন্তি, শৃঙ্গি, ও মত্ত ইহাদের নিকট যাইবে না।

৩য় পথি। চল না, দেখিই না গিয়া কেন, সে যদি তেমন করে, তাতে ভয় কি, প্রহরী আছে।

(সকলেই দ্রুতগতিতে মাতালের নিকট গেল)

বাতু। তোমরা সকলে এই মাতাল বেটার রঙ্গ দেখ।

মন্ত। শ্যালা তুই আমাকে বেটা বলিলি কেন? আমি তোর কি ধার ধারি। শ্যালা তুই বেটা, তোর বাপ বেটা।

বাতু। বেটাকে এমন ধাক্কা দিব ঐ খানায় গুঁজড়িয়া রাখিব।

মন্ত। কৈ আয় শ্যালা মার দেখি।

(দুই জনে বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল)" পৃঃ ৫৩—৫৫।

তৎপরে প্রহরীর প্রবেশ ও দুই জনের মল্লযুদ্ধ নিবারণ। তৎপরে অর্জুন ও কৃষ্ণ রথারোহণে ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন। কেহ বলিল, রথে দুই কৃষ্ণ—অর্জুন কোথা। কেহ বলিল, একজন কৃষ্ণ, অন্য জন উদ্ধব। ইহা লইয়া মন্তপ, বাতুল প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর কলহের মধ্যে দৃশ্যের শেষ। এ অংশটা বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ৬১—৭৩)। "অট্টালিকোপরি" সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জ্জুনের আগমন দর্শন করিতেছেন। অর্জ্জুনকে দেখিবার জন্য সুভদ্রার অত্যন্ত কৌতূহল এবং অর্জ্জুনকে দেখিবামাত্র ভদ্রার চিত্তচাঞ্চল্য। এইখানে একটু দীর্ঘচ্ছন্দ, হাহুতাশ, ও থিয়েটারী ঢং আছে; তাও আবার পয়ারে গ্রথিত। ভদ্রার তখন "সখি ধর-ধর" অবস্থা। "বল সত্যভামে আর কি কব তোমায়। অর্জুনে হেরিয়া আজি বুঝি প্রাণ যায়।" ইত্যাদি ৬৩ পৃঃ হইতে ৭৩ পৃঃ পর্য্যন্ত। ভদ্রা কর্ত্তৃক ভারতচন্দ্রের অনুকরণে অর্জুনের রূপবর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক। ইহার খানিকটা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল "নারায়ণ"(১৩২১-২২) পৃঃ ৪৯৯ তুলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং এখানে আর তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। ভদ্রাকে এইরূপ অধৈর্য্য ও প্রগল্‌ভা দেখিয়া সত্যভামা তাহাকে নির্লজ্জা ব্যাপিকা বলিয়া তিরস্কার করিলেন। কিন্তু তাহাতেও ভদ্রা প্রবোধ মানিল না; তখন সত্যভামা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অর্জ্জুনকে মিলাইয়া দিবেন। "বিদ্যাসুন্দরী" নায়িকা ধরণে এইখানে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। সত্যভামা বলিলেন, "আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত। অবশ্য অর্জুন সহ হবে তোর প্রীত॥" কিন্তু ভদ্রা একেবারে উতলা—"এখনো রজনী সখি বহুক্ষণ আছে। ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায় পাছে॥ তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল। কি হবে

আহুতি দিলে নিভিলে অনল ॥" শেষে সত্যভামার পায়ে ধরিয়া কান্না—"(সত্যভামার চরণ ধরিয়া কহিতেছেন) বড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার! কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার ॥"

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৩—৭৭)। অন্তঃপুর, সত্যভামার গৃহ। কৃষ্ণের নিকট সত্যভামার কর্তৃক সুভদ্রার আরজির নিবেদন। কৃষ্ণের সম্মতি আছে; কিন্তু ভয়—পাছে অর্জ্জুন স্বীকার না করে। সত্যভামাকে বলিলেন,—"তুমি গিয়া অর্জ্জুনে কহিয়া যথোচিত। সুভদ্রার বিবাহের করহ বিহিত ॥" প্রথম কয় পংক্তি গদ্যে; অবশিষ্টাংশ পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ৭৭—৮২)। অর্জুনের শয়নাগার। গভীর নিশীথে সত্যভামা সুভদ্রাকে লইয়া ঘটকালী করিতে আসিয়াছেন। এই দৃশ্যের সমস্ত অংশ আধুনিক রুচি-সম্মত নহে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়। এ নাটকে প্রেম প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণনা অনেকটা মামুলী কাব্যগত আদর্শানুযায়ী ও প্রাণহীন।

"অর্জু। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্ত্তমানেও কন্দর্পদর্পহারিণী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

সত্য। ধনঞ্জয়, আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যে সৌদামিনীর রূপ সন্দর্শনে দেবরাজ সর্ব্বদা চঞ্চল, কিন্তু চপলার অলক্ষ্য চঞ্চলতা হেতু তাহাকে বাণ সন্ধানে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া কেবল প্রাণ নষ্ট করিতেছেন; সেই সৌদামিনী তাঁহার বজ্রভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতে আসিয়াছেন।

অর্জু। সত্যভামে, বাক্যসুধা বর্ষণে আমার কর্ণকুহর সাতিশয় স্নিগ্ধ করিলে! কিন্তু সৌদামিনীর সন্তাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সত্য। ভয় নাই, চিন্তা করিও না, তোমাদিগের কৃষ্ণাই তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সৌদামিনীরূপে স্বদীয় কান্তিরূপ কাদম্বিনী সহ মিলিতা হইতে আগমন করিয়াছেন, গ্রহণ কর।" (পৃঃ ৭৮—৭৯) ইত্যাদি।

অর্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া একেবারে প্রেমসাগরে হাবুডুবু ও সুভদ্রার হাত ধরিয়া টানা-টানি। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী, তখন বলিলেন যে, কৃষ্ণের অনুমতি ব্যতিরেকে "ভদ্রার অঙ্গস্পর্শও করিব না"। সত্যভামা কৃষ্ণের অনুমতি জানাইলেন ও উভয়ের গান্ধর্ব্ব বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া সুভদ্রা লইয়া গমন করিলেন।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮২—৮৪)। রৈবত পর্ব্বত, বলদেবের সভা।—সংক্ষিপ্ত। নারদ আসিয়া বলদেবকে উস্কাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভদ্রাকে অর্জুনের হস্তে অর্পণ করিবেন। গদ্য ও পদ্যে রচিত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৫—৮৮)। হস্তিনা, ধৃতরাষ্ট্রের সভা। নারদ বলদেবের দূতরূপে

আসিয়া ভদ্রার সহিত দুর্য্যোধনের বিবাহের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন প্রভৃতির দ্বারকা যাত্রার উদ্যোগ। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ। আমূল গদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৮৮—৯২), ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠিরের সভা। দূত আসিয়া বরপক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র দান করিল। যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ। তৎপরে ভীম, নকুল ইত্যাদির প্রবেশ। ভীম নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া বলিল যে, অর্জ্জুনের সহিত ভদ্রার বিবাহ ঠিক হইয়াছে, এ আবার কি নূতন কথা। তর্ক-বিতর্কের পর যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া দ্বারকায় যাইতে রাজী হইলেন এবং যাহাতে দুর্য্যোধনের সহিত কলহ না হয়, তাহা ধর্ম্মরাজের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। প্রথমাংশ গদ্য, ভীমাদির কথোপকথন পয়ারে রচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯২—৯৫)। হস্তিনার রাজবর্ত্ম। "বরবেশে দুর্য্যোধন দুঃশাসন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য বরযাত্রিরদিগের সম্মুখে ভীম আগমন করিলেন।" ইহা দেখিয়া কৌরবগণের আনন্দপ্রকাশ। ভীম শ্লেষোক্তি করিয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন দ্বারকা অনেক দূর, দুর্য্যোধনের বরসজ্জায় যাওয়া উচিত নহে; কারণ, বিবাহের এখন কি হয়, বলা যায় না, "নিকট হইতে তত্ত্ব লইয়া বরসজ্জা করিলেই ভাল হয়"। দুর্য্যোধন ইত্যাদি রাগ করিয়া বলিল যে, ভীম চিরকাল হিংসুক, কৌরবের ভাল কখনই দেখিতে পারে না। ভীম উত্তর করিল, "আমি ভালই বলিয়াছি। দুর্য্যোধন বরবেশেই চলুন, মুখে কালী মাখিয়া আইলেই চৈতন্য হইবে।" সমস্তটা গদ্য।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৫—৯৭)। রৈবত পর্ব্বতোপরি অট্টালিকা। ভয়কাতরা সত্যভামা আসিয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাঁহারই উদ্যোগে ভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন করিয়া এখন বলদেব ও দুর্য্যোধনের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত। "বাধিল তুমুল যুদ্ধ ভদ্রার কারণ। আমি চাহি এবে হউক আমার মরণ॥" (পৃঃ ৯৬)। কৃষ্ণ আশ্বাস দিলেন ও উপায় করিবেন বলিলেন। অধিকাংশ গদ্য, কেবল সত্যভামার বক্তৃতাটা পদ্য।

দ্বিতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ৯৮—১০০)। রৈবত পর্ব্বত। অর্জ্জুনের শয়নাগার। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তালিম করিতে আসিয়াছেন। কুলাঙ্গনাগণ যখন সুভদ্রাকে হরিদ্রা লেপন করিবেন, সেই সময় অর্জ্জুনকে সুভদ্রা হরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সমস্তটা গদ্যে বিরচিত।

তৃতীয় সংযোগস্থল (পৃঃ ১০০—১০১)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বলদেবের সভা। দুর্য্যো-ধনের অগ্রদূত আসিয়া কল্য প্রাতে তাহার আগমনবার্ত্তা দিল। বলদেবের কুলাঙ্গনাগণকে কুলাচারাদি করিতে প্রহরীর মুখে আদেশদান। সমস্তটা গদ্য।

চতুর্থ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০১—১০৮)। অন্তঃপুর। দুর্য্যোধনের সহিত পুনর্ব্বার বিবাহের কথা শুনিয়া সুভদ্রা কাঁদিয়া আকুল। "কালকূট দাও সখি আমি করি পান। নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান।" সুভদ্রার চরিত্র অত্যন্ত ভাবগদ্‌গদ প্যানপেনে নায়িকার মত

হইয়াছে এবং যাত্রাধরণের এই সব লম্বা লম্বা পয়ারে বক্তৃতা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক হইয়াছে। খেদ করিতে করিতে "ভদ্রা ধরায় পতিতা হইলেন।" তার পর পদ্য হইতে গদ্যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা।

"সত্য। (হস্ত ধরিয়া কহিতেছেন) সুভদ্রে গা তোল। এত খেদের প্রয়োজন কি? কোন চিন্তা নাই। কল্য প্রভাতে অর্জুন সহ সচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবে।

সুভ। ক্ষত শরীরে কেন আর লবণার্পণ কর? সখি, আমার ললাটে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তুমি কি প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে? কৃতান্তাধিক শত্রুর হস্তে পতিতপ্রায় হইয়াছি, এখন রক্ষা হইবার কি উপায় আছে।

সত্য। ভদ্রে ব্যগ্র হও কেন? যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে রবিসুত ত্রাসান্বিত হয়, ও যাঁহার নামোচ্চারণে তাঁহার দূতেরও অধিকার থাকে না, সেই বিপত্তিভঞ্জন ভগবান্ তোমার স্বপক্ষ, তোমার চিন্তার বিষয় কি ভদ্রে?" ইত্যাদি (পৃঃ ১০৪—৬)।

এ সকল দীর্ঘ বক্তৃতা উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে নাই। এ সকল স্থলে নাট্যকার তাঁহার ভাষার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জলতা ত্যাগ করিয়া অর্থগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য অত্যন্ত বাগাড়ম্বর করিয়াছেন।

পঞ্চম সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৮—১০৯)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। "কৃষ্ণের সভা। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণের নিকট দারুক আগমন করিল।" দারুক অর্জ্জুনের নিকট রথ প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা পাইয়া, কৃষ্ণের অনুমতি লইতেছে। এ দৃশ্যের কোনও তাৎপর্য্য নাই বলিয়া বোধ হয়। সমস্তটা গদ্য।

ষষ্ঠ সংযোগস্থল (পৃঃ ১০৯—১১১)। অন্তঃপুর—সত্যভামা, রুক্মিণী, সহচরী, প্রতিবাসিনী ও কুলকামিনীগণ শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বলদেবের আদেশানুসারে সুভদ্রার গাত্রে হরিদ্রালেপন করিতে যাইতেছেন। গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সপ্তম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১২—১১৫)। বাপীতট। সুভদ্রাহরণ দৃশ্য সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট নাট্যকৌশলের পরিচায়ক। বৃথা বাগাড়ম্বর নাই, অল্প কথায় প্রতিপাদ্য বিষয়টি বেশ ফুটান হইয়াছে। সমস্তটা গদ্য। অর্জ্জুন ও দারুকের রথারোহণে প্রবেশ ও দারুককে কি কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অর্জ্জুনের স্থানকালোপযোগী উপদেশ দান। তৎপরে সত্যভামা প্রভৃতি সুভদ্রাকে লইয়া স্নান করাইতে প্রবেশ। অর্জ্জুনকে দেখিয়া সত্যভামা ও সুভদ্রার হর্ষ। তৎপরে—

"(অর্জুন নিকটে আগমন করিলেন)

সত্য। ভদ্রে, আর কি দেখ, রথে আরোহণ কর।

অর্জুন। এসো প্রিয়তমে (ভদ্রার হস্ত ধরিয়া রথারোহণে গমন করিলেন।" (পৃঃ ১১৩)। তার পর কুলনারীগণের হাহুতাশ ও পুরমধ্যে সংবাদ দিবার জন্য প্রস্থান।

অষ্টম সংযোগস্থল (পৃঃ ১১৬—১৩০)। অধিকাংশ পদ্য ও স্থানে স্থানে গদ্য ব্যবহৃত

হইয়াছে। দৃশ্য—রাজবর্ত্ম। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীম ইত্যাদি বরযাত্রিগণের নিকট দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দান ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা। এই বর্ণনাটা (পৃঃ ১১৭) মন্দ নয়। অপমানিত দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের কটূক্তি ও ভীমের ক্রোধ। বৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করিলেন যে, বলদেব তাঁহাদিগকে আসিতে বলিয়াছেন, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। অনেক তর্কবিতর্ক ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ, আস্ফালন, খেদ, হাহুতাশ ও কটুবাক্যের পর মানে মানে স্বদেশে প্রত্যাগমনই স্থিরীকৃত হইল।

নবম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩০—১৩৬)। গদ্য ও পদ্য উভয়ই দৃষ্ট হইবে। স্থান—বলদেবের সভা—দূত আসিয়া সুভদ্রাহরণ সংবাদ দিল। বলদেবের ক্রোধ ও অর্জ্জুনকে শাস্তি দিবার জন্ম সসজ্জ হইবার উদ্যোগ।* কিন্তু দূত বলিল, তাঁহার এ চেষ্টা বৃথা। কারণ, অর্জ্জুন অসাধারণ যুদ্ধে সমস্ত যদুকুলকে পরাস্ত করিয়াছেন। "ভদ্রা স্বয়ং অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া রথ চালাইতেছেন। প্রভো রথের আশ্চর্য্য গতির কথা কি কহিব, কখন দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য। কখন ভূমিতে, কখন বা শূন্যে ; কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। ... অর্জুন ইন্দ্রজিতের ন্যায় নীরদমণ্ডলীতে আবৃত থাকিয়া বাণে বাণে সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। বৃথা কেন অর্জুনের বিপক্ষে গমন করিবেন? তিনি কোনখানে আছেন, তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর হইবে।" (পৃঃ ১৩৫) ইহা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া বলদেব নিরস্ত হইলেন। কারণ, তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই কৃষ্ণের চক্রান্ত।

দশম সংযোগস্থল (পৃঃ ১৩৬—১৪২)। প্রথমাংশ গদ্য, তৎপরে বিশেষতঃ বলদেবের বক্তৃতা পদ্য (পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী)। স্থান—বসুদেবের গৃহ। অভিমানী বলদেব বাপ মার নিকট আসিয়া মানের কান্না কাঁদিতেছেন। এ সমস্তই চক্রীর চক্রান্ত—যদুগণ সকলেই একপরামর্শি হইয়া বলদেবকে অপমানিত করিয়াছেন। 'এ চক্রে সকলেই আছেন, ভাল,— আজি অবধি আমি তোমারদিগের পুত্র নহি, এমত জ্ঞান করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই যে ব্যক্তির বিপক্ষ, তাহার পক্ষে গৃহবাস অপেক্ষা অরণ্যবাসই উত্তম কল্প, অতএব সকলে আমার আশা পরিত্যাগ কর।" (পৃঃ ১৩৮) দেবকী, রোহিণী, বসুদেব অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু বলদেব কিছুই বুঝেন না। রাগ—কৃষ্ণের উপর। তিন পৃষ্ঠাব্যাপী পদ্যে আপন মনের খেদ ব্যক্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন,—

"এত অপমান যার　　জীবনে কি সুখ তার
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন।
আছিল যতেক সুখ　　লজ্জায় গুঁজিয়া মুখ
হলধরে করেছে বর্জ্জন॥

* কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অষ্টম সংযোগস্থলে দূতমুখে শুনিতে পাই যে, বলদেব যুদ্ধে গিয়া অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। "বলদেব আপনি লাঙ্গল স্কন্ধে করি। এসেছেন ফিরিয়া সংগ্রাম পরিহরি।" (পৃঃ ১১৮)। নাট্যকারের অনবধানতাবশতঃ বোধ হয়, এই দুই রকম বৃত্তান্ত শুনিতে পাই।

এমন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার॥" (পৃঃ ১৪২)

ও এইখানেই নাটক সমাপ্ত।

এ নাটকে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহের সঙ্গতি রক্ষিত হইলেও, চরিত্রের বিকাশ বিশেষ দেখান হয় নাই। নাট্যসম্মত চরিত্রাঙ্কণ অপেক্ষা, কোন কাব্যোক্ত গল্প কথোপকথনচ্ছলে বিবৃতি করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চিত্রিত চরিত্রের বিকাশ দেখান অপেক্ষা, কতকগুলি বিভিন্ন দৃশ্যের একত্র সমাবেশ করিয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি গল্প ফুটাইয়া তোলাই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য আখ্যানবস্তু বা Plot নির্ম্মাণে নিপুণ কৌশল দেখা যায় না। প্রথম অঙ্কটা নাটকের মূল বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন, বাদ দিলেও ক্ষতি হইত না। মদ্যপবাতুলের দৃশ্যটা নূতন হইলেও, সম্পূর্ণ অবান্তর প্রসঙ্গ। এ সমস্ত দোষ সত্ত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী আদর্শে প্রথম নাটক হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট। গ্রন্থকারের স্বভাবাঙ্কণশক্তি ও জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, অঙ্কিত দৃশ্যের স্পষ্টানুভূতি ও তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মামুলী কাব্যগত গল্পের আদর্শে অভিভূত বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সজীবাঙ্কণ-ক্ষমতা নূতন বটে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাট্যকলা বা প্রতিভার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত; এই দুষ্প্রাপ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানই ইহার সামান্য উদ্দেশ্য।

পরিশেষে ব্যক্তব্য, এই প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে যেরূপ মূল্যবান্ ও আধুনিক সময়ে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে এ দোষ মার্জ্জনীয় হইবে, আশা করা যায়।

শ্রীসুশীলকুমার দে

বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সমালোচনার উত্তর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (২৩ ভাগ, ৪ সংখ্যা) শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত দোষ স্বীকার করি আর নাই করি, কোন্ শব্দের কোন্ অঙ্গে আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা কোষকারের সর্ব্বদা মন্তব্য। কোষে অনেক ভুল আছে; যাঁহারা ভুল দেখাইতেছেন, ভুলের আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

তিনি তিন অঙ্গে ভুল ধরিয়াছেন। (১) শব্দের অর্থে, (২) শ্রেণীবিভাগ, ও (৩) ব্যুৎপত্তিতে। যে যে উদাহরণ লইয়া ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক হউক না হউক, আপত্তির মূল খণ্ডন করিতে পারা যায় কি না, দেখি। তৃতীয় আপত্তির মধ্যে একটা গুরুতর প্রশ্ন নিহিত আছে। সেটা সেই পুরানা কথা, বঙ্গভাষার জননী কে। কিন্তু পুরানা হইলেও উহা চির-দিন নূতন ভাবে নূতন নূতন সাজে উপস্থিত হইবে। কারণ, উহা পুরাতন, কেবল তর্কে গম্য।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা ভাল, তিনি গ্রন্থের নাম "বাঙ্গালা ভাষা", এবং "বাঙ্গালা-শব্দ-কোষ" ইহার দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্য করিয়াছেন কি না। কারণ, যে সব সমালোচক এই দ্বিতীয় ভাগের দোষ ধরিয়াছেন, বুঝিয়াছি, তাঁহাদের একজনও প্রথম ভাগ অবলোকন করিবার অবকাশ পান নাই। সকলেই অবশ্য হিত-বুদ্ধিতে করিয়াছেন, কোষের উপকারও যথেষ্ট করিয়াছেন। তথাপি গোড়া দেখিয়া করিলে, বোধ হয়, আরও উপকার করিতে পারিতেন। অন্ততঃ তাঁহাদের শ্রম-লাঘব হইত মনে করি।

দুই একটা উদাহরণ দিই। মন্তব্য-কারী মহাশয় কোষের 'অতিথ' শব্দের অর্থে ভুল ধরিয়াছেন। আমি অর্থ করিয়াছি, "ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী", তিনি এই অর্থে "অতিথ শব্দের ব্যবহার কোথাও" পান নাই।* কিন্তু 'অতিথ-সেবা', 'অতিথ-শালা', 'অতিথ-ফকীর', ইত্যাদি প্রয়োগ লোকমুখে সর্ব্বদা পাইয়া থাকি। যাঁহারা 'অতিথ' নামে সেবা পান, তাঁহারা সাধু-সন্ন্যাসী। দ্বারে 'অতিথ' আসিলে ভিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক দান-শীল গৃহস্থ 'অথিত-অভ্যাগতে'র নিমিত্ত ভূমি ও ভূমির উপস্বত্ব নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। আমি 'অতিথ-ফকীর', 'অতিথ-অভ্যাগত' প্রভৃতির তুল্য শব্দকে ব্যাকরণে 'সহচর' সংজ্ঞায় নির্দেশ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "অতিথ-অভ্যাগত সহচর শব্দ নহে, উহা অতিথি শব্দের এক পর্য্যায়ের শব্দ।" তিনি বলেন, "শব্দের পর নিরর্থক যে সব শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাই সহচর।" সম্প্রতি এই সংজ্ঞা লক্ষণে আমার মন্তব্য কিছুই নাই। ব্যাকরণ-সংশোধনের সময় হইতে পারে। একা 'সহচর' নহে, সে কথাটা এইখানে শেষ করিতে পারি; 'সহচর'

---

* উত্তর-রাঢ়—কান্দি অঞ্চলে 'অতিথ' (উচ্চারণ—অতীত্) শব্দে সাধু-সন্ন্যাসী—বিশেষতঃ—ছাইমাখা জটাধারী পশ্চিমাঞ্চলের সন্ন্যাসী বুঝায়।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

ছাড়া, 'অনুচর', 'উপচর', 'প্রচর' ও 'প্রতিচর', এই পাঁচ শ্রেণীতে যুগ্ম শব্দ ভাগ করিতে হইয়াছে। এই পাঁচের লক্ষণযুক্ত সংজ্ঞা পাইলে এবং উত্তম বোধ হইলে অবশ্য গ্রহণ করিব।

আজিকালি কেহ কেহ ইংরেজী guest বুঝাইতে 'অতিথি' ('অতিথ' নহে) বলেন বটে, কিন্তু গ্রামে ইঁহারা 'অভ্যাগত'। ইংরেজী অভিধানে বন্ধু-বান্ধব guest, এমন কি, হোটেলে যে থাকে, সেও guest। অন্যের গৃহে ভোজন পাইলেই guest হইয়া দাঁড়ান। আমরা কেবল আসন-ভোজন দিয়া এক কথায় guest পাই না। আমাদের কেহ বন্ধু, কেহ অভ্যাগত, কেহ আগন্তু, কেহ অতিথি, কেহ পথিক। যিনি দয়া করিয়া বাড়ীতে আসেন, তিনি আসন ও ভোজন নিশ্চয়ই পান। আত্মীয় হইলে 'বন্ধু', মাননীয় হইলে 'অভ্যাগত', মধ্যম কিংবা লঘু হইলে 'আগন্তু', সাধু সন্ন্যাসী হইলে 'অতিথি', এবং পথে যাইতে যাইতে আসিয়া পড়িলে 'পথিক'। সকলকে সমান আদর-অভ্যর্থনা করা হয় না, সকলে সমান সৎকার পান না। এই যে নামগুলি দিলাম, সব প্রায় নিরক্ষর গ্রাম্য-জনের মুখে শোনা। 'অতিথি' শব্দের প্রাচীন অর্থ নাকি যিনি এক তিথি (দিবস) এক স্থানে থাকেন না, সতত গমন করেন। গৃহে বন্ধু আসিলে, কি অভ্যাগত-আগন্তু আসিলে, এবং তাঁহাকে পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন ও শয়ন করাইলে অতিথি-ধর্ম্ম পালিত হয় না। পুত্র ইংরেজের বাড়ীতে পিতা-মাতা আসিলে guest শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া যান। আমাদের বাড়ীতে তাহা হইতে পারে না। তাঁহারা ইংরেজী তন্ত্রের guest হইতে পারেন, কিন্তু অতিথি ?*

দেশ-কাল-পাত্রভেদে শব্দের অর্থান্তর হয়। শুধু শব্দের কেন, এমন বিষয় মনে হইতেছে না, যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, না হওয়া অস্বাভাবিক। এ ত সামান্য কথা, যাহার প্রয়োগ চারি দিকে পাওয়া যায়, তাহা জানিয়াও ভুলিয়া যাই, অন্যের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। 'উকি' শব্দ দেখুন। উহার অর্থ হিক্কা বলিয়া জানিতাম। ওড়িয়াতেও 'উকি' শব্দ আছে, অর্থ উদ্‌গার। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, পূর্ব্ববঙ্গে 'ওক' শব্দ আছে, অর্থ "বান্ত [বান্তি ?] এবং বান্তকালীন শব্দ"। বিক্রমপুরের (মুন্সীগঞ্জের) এক বন্ধুর মুখে শুনিলাম, সেখানে 'ওক দেওয়া' অর্থে বমন-চেষ্টা করা, এবং 'উথাল করিতেছে' অর্থে বমি করিতেছে।† 'উকি' ও 'ওক' শব্দের মূল এক বোধ হয়। 'উথাল' মনে হয় 'উদ্‌গার' হইতে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, "প্রাকৃতে "ওক্কিঅ" বলিয়া শব্দ আছে; উহার অর্থ বান্ত, বমি করা।" এই "প্রাকৃত" শব্দের মূল না জানিলে ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় হইতেছে না। 'ওক্কিঅ', অনুকার শব্দও হইতে

---

* একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে এক দিন ছিলাম। আমি বাড়ীতে যাইবামাত্র তিনি আমায় অতিথি তুল্য জ্ঞান করিয়া সমাদর করিলেন, আমি অবশ্য প্রীত হইলাম। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন, আমি 'অতিথ' আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া বুঝিলাম, তিনি মূলার্থ ও লাক্ষণিক অর্থ এক করিয়া ফেলিয়াছেন। বাস্তবিক 'অতিথ' নাম ভাল লাগে নাই।

† উত্তর-রাঢ়—কান্দি-অঞ্চলে ওকাই=বমি, ওকাই করা=বমি করা।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

পারে। 'উকি' শব্দের মূলে 'উদ্‌গার' থাকিতে পারে, 'হিক্কা'ও থাকিতে পারে; উহা অনুকার শব্দও হইতে পারে। "প্রাকৃতে" 'ওক্কিঅ' বলিত, বলিলে জিজ্ঞাস্য হয়, সেটা কোন্ দেশের কোন্ সময়ের "প্রাকৃত"? এ বিষয় পরে আলোচনা করিতেছি।

'ওক' ও 'উকি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যাহাই হউক, অর্থ যদি একই হয়, তাহা হইলে কোষে কোন্ রূপ গ্রাহ্য? দুই রূপ দিলে ভাষার পুষ্টি হয়, না একটা দিলে হয়? অবশ্য এদেশ সে-দেশ আমার-তোমার ভুলিতে না পারিলে কোষ-রচনা অসাধ্য। সব সময় ভুলিতে পারা যায় না, সত্য; কিন্তু মায়ায় পড়িতেছি না ত, ভাবিতে হয়। এ বিষয় পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কোষ-সমালোচনার উত্তরে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি। এইরূপ, কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার ইতর-বিশেষ হয়। 'অভরণ', 'আউ', শব্দ ধরুন। পুরানা বাঙ্গালা বহিতে শব্দ দুইটা পাওয়া যায়। নিরক্ষর নর-নারীর মুখেও অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ 'অভরণ' কিংবা 'আউ' লিখিতে পারিবেন না, লিখিতে হইলে 'আভরণ' ও 'আয়ু' বানান করিতে হইবে। কেন হইবে, তাহার উত্তর অনাবশ্যক। শব্দের জাত্যন্তর আছে, তাহা কোষকার দেখাইয়া দিলে মন্দ কি? কোষ সঙ্কলনের সময় আমি শব্দগুলি তিন ভাগ করিতে বসিয়াছিলাম,—"বাঙ্গালা", "বাঙ্গালা-প্রাকৃত", এবং "গ্রাম্য"। "বাঙ্গালা" কি, তাহা বলিতে হইবে না। যে শব্দ সাধু-অসাধু, শিষ্ট-অশিষ্ট, কথায় লেখায় চলে কিংবা চলিতে পারে, তাহা 'বাঙ্গালা' বলিলাম। যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ সকলের কথায় চলে, কিন্তু শিক্ষিতের লেখায় চলে না, তাহা "বাঙ্গালা-প্রাকৃত", এবং যে শব্দ কিংবা শব্দের যে রূপ কেবল অশিক্ষিত নর-নারীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা "গ্রাম্য"। "গ্রাম্য" রূপ চেনা তত কঠিন নয়। যেমন আউ, মিত্তু, কাজ্জ, ধম্ম, কম্ম, পুন্নি, 'মনিষ্যি', মচ্ছ, উচ্ছব, রাত্তি, আদ্দ, ডেড়, ডণ্ড, শাদ্ধ, চাদ্ধ, ইত্যাদি।

পূর্ব্বকালের ব্যাকরণকারদিগের মতে শব্দের এই প্রকার রূপ "প্রাকৃত"। আমিও তাহাঁদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া "প্রাকৃত"সংজ্ঞায় নির্দেশ করিলে মন্দ করিতাম না। কারণ, আমি যে "বাঙ্গালা-প্রাকৃত"সংজ্ঞা করিয়াছি, তাহা বহু স্থলে "বাঙ্গালা"। ইহা দেখিয়া "বাঙ্গালা-প্রাকৃত" নির্দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু "গ্রাম্য" সংজ্ঞা রহিয়া গিয়াছে। আজি-কালি "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্গালা প্রাকৃত", এই দুইএর ভেদ লোপ করিবার দিকে কাহারও কাহারও প্রবল অনুরাগ দেখা যাইতেছে। "বাঙ্গালা" কাহার, যাহার, করিতেছিল, আজির, রাত্রির, ইত্যাদির "বাঙ্গালা-প্রাকৃত"রূপ, কার, যার, ক'র্‌তেছিল বা ক'চ্ছিল, আজের, রেতের ইত্যাদি, অতএব মোটের উপর দুই ভাগ হইয়াছে। শব্দের যে রূপ, গোটা গোটা শব্দ নহে, রূপ, শিক্ষিতদিগের মুখে এবং কলমে বাহির হয়, এবং যে রূপ হয় না।

এই বিভাগ অবশ্য কৃত্রিম। স্বভাবকে দুই ভাগ করি, আর তিন চারি ভাগই করি, তাহা কৃত্রিম হইবেই। সুতরাং উক্ত দুই ভাগ সব স্থলে তর্কে টিকিতে পারে না। দুই একটা উদাহরণ লই। শিক্ষিত লোকে 'কর্তা' (বা কর্ত্তা), 'কর্ম' (বা কর্ম্ম) বলেন, লেখেন।

অ-শিক্ষত বলে 'কত্তা', 'কম্ম'। ইহাতে মনে হইতে পারে, তবে ত ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু শিক্ষিত 'কত্তা-গিন্নী', 'কত্তা-ভজা', এমন কি 'কত্তাত্তি' না বলিয়া পারেন না। 'কর্তা-গৃহিণী' বলিতে পারেন, কিন্তু 'কর্তা-গিন্নী' কিংবা 'কর্তা-ভজা' বলা ঠিক হয় না। আর একটা শব্দ 'অষুধ' ধরুন। এই রূপ, "বাঙ্গালা-প্রাকৃতে"। "বাঙ্গালা"রূপে 'ঔষধ' যাহা বলিলে লিখিলে সবাই বুঝিতে পারে। "গ্রাম্য"রূপে 'ওষুদ'। কিন্তু 'ওষুধ' রূপ "প্রাকৃতে"র উপরে উঠিয়াছে। 'কম্ম' শব্দ অশিক্ষিতের মুখে শুনি, শিক্ষিতের মুখে 'কর্ম'। 'কাজ-কম্ম' শিক্ষিতের মুখে 'কাজ-কর্ম'। অতএব 'কাজ', 'কর্ম্ম', 'কার্য', "বাঙ্গালা"; কিন্তু 'কাজ্জ'-'কম্ম' "গ্রাম্য" মনে করিতে হইতেছে। মন্তব্যকারী লিখিয়াছেন, "কথ্য ভাষায় 'কম্ম' ও 'কাম' উচ্চারণই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, শিক্ষিত লোকেরাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না।" এখানে তিনি দুইটা গুরুতর তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না। আর, স্বভাবকে দমন করিয়া ঈপ্সিত পথে চালনাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় কি? 'করম', 'করম' শুনিতে শুনিতে 'কর্ম' শব্দ শিক্ষা হয়। যাঁহারা 'করম' রূপ দেখিতে জানিয়াছেন, তাঁহাদের 'কর্ম' শব্দ উচ্চারণ সোজা হয়। যখন শিক্ষা না হইয়াছে, তখন প্রাকৃত জন বা কে, আর অ-প্রাকৃত জনই বা কে?

সে কালে কেবল দ্বিজবালকের উপনয়ন হইত; দ্বিজকন্যার হইত না, শূদ্রের হইত না, শূদ্রাণীর ত কথাই নাই। শকুন্তলা কণ্ব-মুনির আশ্রমে আজন্ম-পালিতা হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না, প্রাকৃত জনের ন্যায় তাহাদের ভাষায় কহিতেন। কিন্তু সংস্কৃত অর্থাৎ তৎকালের শুদ্ধ ভাষা অক্লেশে বুঝিতে পারিতেন। এ কালেও দেখি, অশিক্ষিতা নারী ও অশিক্ষিত নর 'কার্য', 'কর্ম', 'রাত্রি' প্রভৃতি এ কালের সংস্কৃত অর্থাৎ এ কালের শুদ্ধ ভাষা সচ্ছন্দে বুঝিতে পারে, কিন্তু বলিবার সময় 'কাজ্জ', 'কম্ম' 'রাত্তি' প্রভৃতি বলে, কিংবা আরও সোজা করিয়া 'কাজ', (কোথাও কোথাও) 'কাম', 'রাত' বলে। এই যে কোন শব্দকে "সংস্কৃত", কোন শব্দকে "প্রাকৃত" বলিতেছি, এ কালের মতন সে কালেও বলা হইত। কিন্তু এ কালে কি দুইটা ভাষা আছে? সে কালে কি দুইটা ভাষা ছিল?

এখন এই তর্ক একটু বিচার করিতে হইতেছে। কারণ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার কোষ হইতে ৪০টি শব্দ তুলিয়া ৩০টি স্থানে সংস্কৃত-প্রাকৃত-শব্দ মূল বলিয়া দেখাইয়াছেন। আমি "সংস্কৃত" বলিয়াছি, তিনি "প্রাকৃত" অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সময়ের "প্রাকৃত" ভাষা বলিয়াছেন। "সংস্কৃত-প্রাকৃত" বলিতে হইতেছে; কারণ, এখনকার অশিক্ষিত নর-নারীর ভাষা আমি-ই বাঙ্গালার "প্রাকৃত" বলিতেছি, এমন নহে; কিছু দিন পূর্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষারই নাম "প্রাকৃত" ছিল। সে যাহা হউক, তিনি ইচ্ছা করিলে বিদেশী শব্দ বাদে কোষে যত শব্দ আছে, সমুদয়েরই মূল "প্রাকৃত" বলিয়া এক কথায় মন্তব্য শেষ করিতে পারিতেন। কারণ, আমি সে সকল শব্দের মূল "সংস্কৃত" দেখাইয়াছি। শেষে তিনি লিখিয়াছেন, 'বঙ্গভাষায় যে সংস্কৃত শব্দ বহু পরিমাণে প্রচলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃতি আলোচনা

করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী।" আমিও আমার পুস্তকের প্রথম ভাগে (২৭ পৃঃ) লিখিয়াছি, "সংস্কৃত ভাষার গৌরবের দিনে যে প্রাকৃত ভাষা 'ইতর' লোকের ভাষা ছিল, তাহাই কি পরে 'ভদ্র' লোকের ভাষাকে পরাভূত করে নাই? আমরা কি সেই 'ইতর' ভাষা লইয়া বাঙ্গলা ভাষার গৌরব করিতেছি না?" কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে। কাজেই একটা তর্কে পড়িতে হইতেছে। "প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী" —ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বুঝি? দ্বিতীয়তঃ, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের "সংস্কৃত", না "প্রাকৃত" মূল প্রদর্শন কর্তব্য?

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ হয় ত অধীর হইয়া বলিবেন, আবার এ প্রশ্ন কেন? "প্রাকৃত" ভাষা যে বঙ্গভাষার জননী, তাহা বহু দিন সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর, আমি ভাষাবিৎ নই, এবং সিদ্ধান্তটা ভাল করিয়া বুঝিতে চাই। 'জননী' অর্থে মানুষের জননীর তুল্য মনে করিয়া দেখি। জননী কন্যা প্রসব করেন, কোন এককালে করেন। প্রসবের পর একজনের স্থানে দুই জন হন, দুই জন পৃথক থাকেন। যদি এমন, তাহা হইলে কোন সময় ছিল কি, যখন "প্রাকৃত" ও বাঙ্গালা দুইই ছিল? যে দেশে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, সে দেশে বাঙ্গালা ভাষাও ছিল কি?

বোধ হয়, পণ্ডিতেরা এ কথা বলিবেন না। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, প্রসবান্তে জননীর কাল হইয়াছে, কন্যাটি জীবিত আছে। তখন এমন তর্কও উঠে, সে দুর্ঘটনা কবে হইয়াছিল? কোন কোন পণ্ডিত ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমি "বাঙ্গালা ভাষা" পুস্তকের প্রথম ভাগে (১৯ পৃঃ) লিখিয়াছিলাম, "অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, এ কথার যেমন অর্থ নাই; অমুক বৎসর হইতে বাঙ্গালীর ভাষার উৎপত্তি, সে কথারও অর্থ নাই।" তাহা হইলে জননী দেহত্যাগ করেন নাই, কন্যারূপে অদ্যাপি বর্তমান আছেন। দক্ষ-কন্যা সতী রূপ গিয়াছে, হিমালয়-কন্যা উমা রূপ আসিয়াছে। কিন্তু যিনি সতী, তিনিই উমা। অর্থাৎ "সংস্কৃত" ভাষার দিনে যে ভাষা ছিল, সেই ভাষা এখনকার বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই, পূর্বরূপের কিছু থাকিবে, কিছু লুপ্ত হইবে, কিছু নূতন আসিবে। কিন্তু যেটা নূতন মনে করি, সেটা পুরাতনে অপ্রকট ছিল।

পুরাতনে যে গুণ অপ্রকট থাকে, তাহা ধরা কঠিন বটে। কিন্তু যেটা ছিল না, তাহার আবির্ভাবও স্বীকার করিতে পারি না। এখানে কার্য দেখিয়া কারণ অনুমান করিতে হয়; অন্য উপায় নাই। পূর্ব "প্রাকৃতে"র 'ধম্ম কম্ম' অদ্যাপি আছে, 'অজ্জ অট্ঠী ওসঢং' গিয়াছে, 'আজি আঁঠি ওষুধ' আসিয়াছে, আর হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ যাহা সেকালে কেবল পণ্ডিতের মুখে ও কলমে বাহির হইত, পামরের মুখে হইত না, সে সব এ কালের পণ্ডিত ও পামর উভয়েরই মুখে শোনা যাইতেছে। এই অপূর্ব ঘটনা, তাহার ব্যাখ্যা রূপকে

করিতে হইলে বলিতে হয়, বঙ্গভাষার জননী সে কালের "প্রাকৃতা", কিন্তু জনক "সংস্কৃত।" সে কালের "প্রাকৃতা" ও "সংস্কৃতে"র বিবাহে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের কাহারও মুখ মায়ের মতন, কাহারও মুখ বাপের মতন। "সংস্কৃত", "প্রাকৃতার" পাণিগ্রহণ না করিলে "প্রাকৃতা" প্রাকৃতা থাকিয়া যাইত, সেই ব্যঞ্জনবিহীন স্বরবর্ণের আধিক্য (যেমন, রঅও—রজকঃ, উইদং—উচিতং), সেই ভিন্নবর্গীয় বর্ণের পরস্পর অসংযোগ, (যেমন, উপ্পাও—উৎপাতঃ, গোট্‌ঠী—গোষ্ঠী) প্রভৃতি লক্ষণ থাকিয়া যাইত।

এই শুভপরিণয়-সংবাদ নূতন নহে। নূতন সংবাদ আমি কোথায় পাইব। ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের উক্তিই নিজের বোধে ব্যক্ত করিতেছি। তাঁহারা বলেন, বহু পূর্বকাল হইতে এই আদান-প্রদান চলিতেছিল, বৈদিক ভাষায় চলিতেছিল, "সংস্কৃত" ভাষায় চলিতেছিল। তাঁহারা 'গাথা' নামে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার ভাষায় "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। যে ভাষায় "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।

কিন্তু এখানে একটা বিতর্ক উঠিতেছে। এই যে "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতার" বিবাহ, সে বিবাহ কি স-বর্ণে বিবাহ? বঙ্গভাষা কি সঙ্কর-কন্যা? অর্থাৎ "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" কি দুই ভিন্ন ভাষা, না এক ভাষার দুই রূপ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কে কি বলিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নই। তবে প্রত্যক্ষের ন্যায় বোধ হইতেছে, সকলে একমত হইতে পারেন নাই, পারিবার জো নাই। কারণ, বিতর্কের মূলে এক বড় বিতর্ক আছে, কখন্ কি অবস্থায় দুইটা বস্তুকে এক বলিতে পারা যায়। 'দুই' গণাতেই বুঝিতেছি একটা নয়; আবার 'এক' সন্দেহ করিয়া বুঝিতেছি দুইটাও নয়। বিতর্কটা একটু বিকট করিয়া বলি, সংস্কৃতভাষা আর বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা? কিংবা বলি, "প্রাকৃত"ভাষা ও বঙ্গভাষা দুইটা ভাষা, না একটা? কিংবা সেই পুরানা কথায় আসি, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত" ভাষা এক ভাষা, না দুই ভাষা?

দেখা যাইতেছে, ভাষার লক্ষণ লইয়া বিতর্ক। সে দিকে দৃষ্টি করিলে বিতর্ক উঠিত না, কিংবা উঠিলেও সহজে শান্ত হইত। পণ্ডিতেরা ভাষার কি লক্ষণ দেখিয়া এক কিংবা দুই বিবেচনা করেন, তাহা আমি অবগত নই। এই সুযোগ পাইয়া একবার আমার এক হিতকারী সমালোচক আমায় সম্পীড়িত করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নাকি বলেন, কেবল ব্যাকরণ দ্বারাই এক ভাষা হইতে অন্য ভাষা প্রভেদ করিতে পারা যায়। যদি ভাষার ব্যাকরণ এক হয়, তাহা হইলে ভাষাও এক। কিন্তু অ-বুঝকে বুঝান সহজ নহে। 'ভাষা' সংজ্ঞা স্থানে 'ব্যাকরণ' সংজ্ঞা বসাইলে যে আঁধারে সে আঁধারেই থাকিতে হয়। যদি ভাষা স্বাভাবিক হয়, স্বভাবতঃ জন্মে, বাড়ে, মরে, তাহা হইলে এক কথায়, ব্যাকরণ (ইংরেজী 'গ্রামার' অর্থে) বা রচনা-রীতি দেখাইয়া বিতর্কের দোষ কাটিতে পারা যায় কি? শব্দ-রূপ উপকরণ না দেখাইলে কি বস্তুর রচনা দেখিব? "কাদার

অনুবেল, ডকুটর কল দিয়ে ফীবার-কেস ব'লেছেন।"—এই যে ভাষা, ইহা না-বাঙ্গালা, না-ইংরেজী। স্বভাবজ দ্রব্যের জাতিবিভাগ সময়ে কত বিড়ম্বিত হইতে হয়, তাহা মনে রাখিলে এক ব্যাকরণ দেখাইয়া, ও পণ্ডিতের নাম লইয়া বিতর্কের পথে কাঁটা দিতে পারা যায় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ সোজা নয়। অথচ একটা কিছু না ধরিলেও লোক-ব্যবহার চলে না। তখন বলিতে হয়, রাম-শ্যামের কথাবার্ত্তা স্বভাবতঃ চলিতে পারিলে দুই জনের ভাষা এক। ভাষার এই লক্ষণে 'স্বভাবতঃ' আনিতে হইতেছে, নতুবা ফাঁকির অন্ত থাকে না। যদি 'স্বভাবতঃ' কাটিয়া দিতে চান, তাহা হইলে বলিতে হইবে, রাম-শ্যামের কথাবার্ত্তা তৃতীয় একজনের কানে এক প্রকার শোনা গেলে তাহাদের ভাষা এক। এখন এই তৃতীয় ব্যক্তির শ্রবণশক্তির বিচার করুন।

পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, "সংস্কৃত" ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা। কেহ বলেন "সংস্কৃত" হইতে "প্রাকৃত", কেহ বলেন "প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত" উৎপন্ন। দুই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় "প্রাকৃত"-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে "প্রাকৃত" ভাষা হইতে "সংস্কৃতে"র উৎপত্তি। বৈদিকভাষা এককালে "প্রাকৃত" ভাষা ছিল, জনসাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে এই ভাষায় কহিতেন, শিক্ষিতেরা লিখিতেন। কত কাল পরে কে জানে, লিখিতে লিখিতে সে ভাষা "সংস্কৃত" হইয়া গেল, ইহার ব্যাকরণ কোষ প্রভৃতি রচিত হইল, সূত্রের বন্ধনে এক দিকে যেমন বাঁচিয়া গেল, স্থায়ী আকারে থাকিল, অন্য দিকে তেমন শক্তি-হীন হইল, পরিবর্ত্তন-শীল থাকিল না। "প্রাকৃত" ভাষা জনসাধারণের ভাষা, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। প্রাকৃত বৈদিক পালির, এবং পালি "প্রাকৃতে"র আকার পাইল। মাঝে যে "সংস্কৃত" হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত আকারেই থাকিয়া গেল।

"সংস্কৃত" ও "প্রাকৃতে"র উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল, যাহা দুইটা ভাষা মনে হইতেছিল, তাহা দুইটা নহে, এক ভাষারই দুই শাখা। কিংবা দুই এক বৃক্ষ, একটা উদ্যানে সযত্নে পালিত ও রক্ষিত, অন্যটা বন্য। রূপকটা অনেক দূর পর্য্যন্ত চালাইতে পারা যায়। উদ্যান-জাত বৃক্ষের দুইটা ধর্ম্ম স্পষ্ট; উহা অ-স্বাভাবিক জীবনযাপন করে, অযত্নে মরিয়া যায়, কিংবা বন্য আকার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। "সংস্কৃতে"রও সেই দশা ঘটিয়াছিল, অ-যত্নে এবং মূল প্রকৃতির তাড়নায় বন্য হইয়া গেল। "প্রাকৃতে"র সমুদয় আকার পাইল না, কিন্তু কোন্‌খানে "সংস্কৃত", আর কোন্‌খানে "প্রাকৃত" তাহার নির্দেশ কঠিন করিয়া ফেলিল। যাহাকে "প্রাকৃত" ভাষা বলা হয়, তাহাতে সংস্কৃত-সম এবং সংস্কৃত-ভব, দ্বিবিধ শব্দ ছিল। সংস্কৃত ও সংস্কৃত-ভব শব্দের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ; একই হইতে উভয়ের জন্ম। ব্যাকরণেও যে তাই। অতএব সংস্কৃত ও "প্রাকৃত", দুইটা ভাষা, না একটা?

বঙ্গভাষা লইয়া একটু পরীক্ষা করি। কিন্তু এই ভাষার নাম শুনিলেই চোখে আঁধার দেখি। 'বর্ত্তমান বাঙ্গালা' বলিলেও আলো দেখি না। ইহার এত লীলা, কে গণিতে পারিবে? নিত্য

নূতন লীলা ; শক্তি জাগ্রত। লেখ্য লীলা, না কথ্য লীলা, কোন্ লীলা ধ্যান করিব ? পামরকণ্ঠে যে লীলা, পণ্ডিতকণ্ঠে সে লীলা দেখি না। পণ্ডিত যে সাধক, পামর যে পাষণ্ড, সাধন-ভজন করে নাই। ভাষার প্রাণ, ধ্বনি ; লেখ্য চিত্র নহে। চিত্র কৃত্রিম, ধ্বনি স্বাভাবিক। বিপদ এই, স্বাভাবিককে কৃত্রিম রূপ, সাঙ্কেতিক চিত্রদ্বারা বুঝিতে হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রত্যক্ষ হইতেছে, পুরাকালের বাঙ্গালা কল্পিত চিত্র সাহায্যে বুঝিতে হইবে, চিত্রকর চিত্রের সঙ্কেতগুলা বলিয়া চিত্র লিখিলে বরং কিছু রক্ষা ছিল। চণ্ডীদাস নামে কে একজন কি রাগে কি গান গাইয়াছিল ? এক চিত্রকর গানের চিত্র লিখিয়াছিলেন ; আমরা সেই চিত্র দেখিয়া মনে করিতেছি, এই সেই গান ! চিত্র-ব্যাখ্যাতা বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিতেছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক, সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প।" জানি না, তিনি শব্দ গণিয়া গণিয়া ভাগ করিয়াছিলেন কি না ; আর সংস্কৃত-জাত না বলিয়া প্রাকৃত-জাত কেন বলিয়াছেন। কিন্তু চিত্রকরের কলা-কৌশল দেখিয়া বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে।* সে চিত্রকর কেমন, যে শ্যামকে শ্যামারূপে দেখাইতে পারেন, অতি—আতি, অচেতন—আচেতন, অধিক—আধিক ইত্যাদির অভেদ বুঝিতে বলেন, যিনি আপণ—আপন, আণি—আনি, আপমাণ—আপমান, শুণ--হুণ—হুন ইত্যাদি এক অর্থে নানা ধ্বনি শুনিতেন ? এ দিকে শুনি, চণ্ডীদাস বীরভূমে ছিলেন, বাঁকুড়াতেও ছিলেন, সুদূর মিথিলাতেও ছিলেন। অন্য দিকে, প্রাচীন অক্ষর-বিৎ ও ইতিহাস-বিৎ ৬ শত বৎসর পূর্ব্বেও যাইতে দিবেন না। চণ্ডীদাস রাঢ়ে ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রাঢ়ের, ২ শত বৎসর পরের চৈতন্যচরিতামৃত ও কবিকঙ্কণচণ্ডী আছে, ২ শত বৎসর পূর্ব্বের শূন্যপুরাণও আছে। এই সকল পুস্তকে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত শব্দে"র আধিক্য আছে কি না, গণিলে মন্দ হইত না। আরও আগে যাই। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষা"র নিদর্শন দিয়াছেন। তিনি রাঢ়দেশের লুয়ী নামক বাঙ্গালীর দুইটি পদে ৯৩ শব্দ গণিয়া বলিয়াছেন, ১৬টি সংস্কৃত, ৫২টি বাঙ্গালা, আরও ২০টি "প্রাকৃত"। তিনি 'প্রাচীন বাঙ্গালা' ও 'চলিত বাঙ্গালা'—এই দুই ভাগে ৫২টি বাঙ্গালা শব্দ গণিয়াছেন। কই, সেগুলা "প্রাকৃত" কিংবা "তজ্জাত" বলেন নাই। বরং সা° প° পত্রিকায় বলিয়াছেন "সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন"। তাঁহার বলিবার প্রয়োজন ছিল না সত্য, কিন্তু "প্রাচীন অবস্থা"র বাঙ্গালা শব্দগুলির মূল "প্রাকৃত" বলাও যা, "সংস্কৃত" বলাও তা ; কারণ, "প্রাকৃত" ব্যাকরণের সূত্র পাই না, "সংস্কৃত" ব্যাকরণেরও পাই না অথচ বাঙ্গালা ! অতএব বোধ হইতেছে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাঙ্গালাভাষা আছে।

আমার বোধ হয়, ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ "সংস্কৃতে"র দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, কেহ "প্রাকৃতে"র দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। "প্রাকৃত" ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে, এমন কি,

* "কৃষ্ণকীর্ত্তন" সম্বন্ধে কয়েকটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সংশয় এখনও নিঃসংশয়রূপে বলিবার সুযোগ হয় নাই। এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা আসিয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও, সেই টানা-টানি দেখিতে পাই। পাঁচটি ছেলের মধ্যে হয়ত দুইটি বাপের মতন, তিনটি মায়ের মতন, ইহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গভাষাতেও তাই মনে করি। যাঁহারা ইহার উর্দ্ধে উঠিয়া বলিবেন, এই দেখ "প্রাকৃত", এই দেখ "প্রাকৃত", তাহাঁদিগকে একটা জিজ্ঞাস্য আছে, সেটা কোন্ "প্রাকৃত"? শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, অপভ্রংশ ইত্যাদি নামের কোন্ "প্রাকৃত"? কোন শব্দে এই, কোন শব্দে অই, বলিলে বুঝি, জানা "প্রাকৃতে"র একটাও নহে, একটা 'নব-প্রাকৃত', যেটার লক্ষণ সেকালের কেহ বলিয়া যান নাই। বলিবার যো ছিল কি না, কে জানে। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যাহার ভিন্নত্ব হয়, তাহার অভেদত্ব স্বীকার না করিলে ত স্বরূপলক্ষণ দিতে পারা যায় না। এই কারণে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনার নাম শুনিয়াই অনেক পণ্ডিত আকাশকুসুম কল্পনা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু সংসার অনিত্য শুনিয়াও বা বুঝিয়াও আমরা নিত্য ভাবিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, এবং বুঝিতেছি, নিত্য না ভাবিলে সংসার বলিয়াও কিছু থাকে না। সঞ্চরণশীল অনিত্য ভাষার মধ্যেও নিত্য সত্য স্বীকার না করিলে ভাষা থাকে না, মানুষ-সমাজও থাকে না। তাই সে কালের ব্যাকরণকার "প্রাকৃত" ভাষারও ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু "সংস্কৃত"কে নিত্য অঙ্গীকার করিয়া "প্রাকৃতে"র ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। তাহাঁরা সূত্র করিলেন, "প্রাকৃতে" একবচন ও বহুবচন আছে। দ্বিবচন নাই, যেন দ্বিবচন থাকিবার কথা! লিখিলেন, 'ভূ' ধাতুর পদে 'ভবতি' না হইয়া 'হোতি' হয় ইত্যাদি। তাহাঁরা "প্রাকৃত" হইতে "সংস্কৃতে" যান নাই; বলেন নাই "প্রাকৃত" 'মী' হইতে 'অহম্', 'অমিঅ' হইতে 'অমৃত', ইত্যাদি। কারণ "সংস্কৃত" নিত্য ও পরিচিত, "প্রাকৃত" অনিত্য ও অপরিচিত। বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও কোষকারকেও তাহাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরিতে হইয়াছে। বলিতে হইয়াছে, পূর্বে 'অহম্' বলিত, এখন 'আমি' বলে, পূর্বে 'একাদশ' বলিত, এখন 'এগারহ' বা 'এগার' বলে, ইত্যাদি।

আমার সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত অহং শব্দ হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ আসিয়াছে, ইহা বড় কষ্টকল্পনা। 'অহং' অর্থে প্রাকৃতে 'অম্মি', 'হং' এবং 'মম' এই তিন রকম প্রয়োগ হইয়া থাকে। * * এই 'অম্মি' হইতে বাঙ্গালায় 'আমি' শব্দ সহজেই আসিতে পারে।" তা পারুক; 'আমি' শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বরূপ 'আহ্মি' (বোধ হয় পড়িতে হইবে 'আম্হি') শব্দের 'হ'-এর উৎপত্তি কি? তা ছাড়া, কোন্ দেশের "প্রাকৃতে", কবেকার "প্রাকৃতে" 'অম্মি' বলিত? "প্রাকৃত" ব্যাকরণে নানা রূপ লিখিত আছে,—অহং, অহম্মি, অম্মি, অম্হি, হং, অহঅং, ম্মি। যেটার সঙ্গে মিলিয়া যাইবে, সেটা হইতে এটা বলা ঠিক কি? বোধ হয়, "হইতে" শব্দটার যে অর্থ আমি ধরিতেছি, তিনি সে অর্থ ধরেন নাই। যেটা ছিল, সেটার রূপ-পরিবর্তন হইলে বলি প্রথমটা হইতে দ্বিতীয়টা আসিয়াছে। কিন্তু রূপ-পরিবর্ত্তন একবার না হইয়া বহুবার হইতে পারে। তখন যে-কোন রূপ ধরিয়া সচ্ছন্দে তর্ক তোলা যাইতে পারে। আমি সে তর্কে না গিয়া একটা জানা গোড়া ধরিয়াছি। জানা দ্বারা অজানা বলাই ভাল। ইহাতে কি সুবিধা হইয়াছে, বলি।

(১) বহু বহু শব্দ আছে, যাহার সংস্কৃত রূপ এবং বাঙ্গালা সমান চলিতেছে। যেমন অষ্ট, আট; নদী, নই; স্বপ্ন, স্বপন; ইত্যাদি। যখন দুইই বলি ও লিখি, তখন দুইই যে এক, তাহা বলিলে বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়, একটা হইতে অপরটায় আসিতে পারা যায়।

(২) "সংস্কৃত-প্রাকৃত" চলিত থাকিলে সে ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিবার সুবিধা হইত। যেটা নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার কোন্ সময়ের

কোন্ রূপ ধরিব? পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপ সাজাইয়া গেলে অ-কার্য হইত না; কিন্তু উপজীব্যের অভাব, এবং অভাব না হইলেও কোষে এত কথা প্রতি শব্দে লিখিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য ঘটে। "বাঙ্গালাভাষা" গ্রন্থের প্রথম ভাগের শিক্ষাধ্যায়ে কতকগুলি প্রধান সূত্র দেওয়া গিয়াছে। দেখা যাইবে, পূর্ব"প্রাকৃত" হইতে শব্দ আনিতে যত লোপ, আগম বলিতে হয়, "সংস্কৃত" হইতে আনিতে তাহার অধিক বলিতে হয় না। "প্রাকৃত" 'উট্‌ঠ' ধাতু হইতে বা° 'উঠ' ধাতু সহজে আসে বটে; কিন্তু 'উট্‌ঠ' ধাতু হইতে কি 'উৎ-স্থা', না 'উৎ-স্থা' হইতে 'উট্‌ঠ'? "প্রাকৃত" 'ওড্‌ঢণ' [?] হইতে 'আবরণ' (বা 'প্রাবরণ'), না 'আবরণ' হইতে 'আউরণ', 'উরণ'—উড়নী? 'ওড্‌ঢণ' শব্দের মূল কি? "প্রাকৃত" ভাষার ব্যাকরণকার বলেন, সে ভাষায় সংস্কৃত-সম, সংস্কৃত-জাত ও দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দ ছিল। 'ওড্‌ঢণ' কি "দেশী" শব্দ? "সংস্কৃত-সম" যে নহে, তাহা রূপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ, ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন, "সংস্কৃত (আ)বরণ শব্দ স্বচ্ছন্দে ওরণ—ওড়ণ—ওড়না হইতে পারে না।" তিনি কারণ দেন নাই; বোধ হয় 'ওড্‌ঢণ' প্রাকৃতে ছিল, ইহাই পর্য্যাপ্ত মনে করিয়াছেন। লেপের 'ওয়াড়' ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'ওহাড়ন', স° আবরণ হইতেই মনে হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'নিদ্রা' শব্দের রূপান্তরে 'নিঁদ', 'নান্দ' প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল 'ঘুম' শব্দ তত প্রাচীন নহে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের চোখে আমার উক্তিটি এড়ায় নাই। আমার অনুমান খণ্ডনার্থে তিনি পাঁচ জন প্রাচীন গ্রন্থকারের প্রমাণ দিয়াছেন। দেখিতেছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই পাঁচেরই প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমার সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন।

(৩) কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলির নিমিত্ত একেবারে সংস্কৃতে যাওয়াই সুবিধাজনক। বাঙ্গালায় 'দুধ আওট্‌, আর 'দুধ আওটাও', দুইই বলা যায়। একটা স° 'আবৃৎ' ধাতু হইতে, অপরটা স° 'আবর্ত', বরং 'আবর্ত্তিত' শব্দ হইতে আসিয়াছে মনে করিলে একটা সামান্য সূত্রের অন্তর্গত করিতে পারা যায়। ব্যাকরণাধ্যায়ে সে সূত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তা ছাড়া, দেখা গিয়াছে, কন্‌কন, ধক্‌-ধক ইত্যাদি দ্বিরুক্ত শব্দ প্রায় অবিকল স° ধাতু। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে কত কল্পনাই চলিয়াছিল। কোষের সমালোচক একটা বিশেষ ধরি-ধরি করিয়াও বোধ হয়, ধরিতে পারেন নাই। সেটা একটা প্রচলিত মতের খণ্ডন। অনেকে মনে করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা "দেশজ" শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে, তাঁহাদের "দেশজ" শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-ভব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত। বোধ হয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় "প্রাকৃত" ভাষার "ভিতর দিয়া" সংস্কৃতে গেলে তুষ্ট হইতেন। "ভিতর দিয়া" গেলে উত্তম হইত, আমিও স্বীকার করি। তাহাতে আর কিছু না হউক, আমরা সংস্কৃত-ভাষা-চোর, এই অপবাদ হইতে মুক্ত হইতাম। দেখা যাইত, বাঙ্গালা একটা "প্রাকৃত" যাহার শিকড় বৈদিকভাষায় গিয়া ঠেকিয়াছে। এই কারণে পণ্ডিতবর্গ বলেন, বাঙ্গালা সংস্কৃতমূলক ভাষা। কেহ "প্রাকৃত"-মূলক বলিয়াছেন কি না, জানি না। বোধ হয়, বলেন নাই; কারণ, যখনই "প্রাকৃত" বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ "প্রাকৃত" ভাষা। বোধ হয়, এই কারণে তাঁহারা বি-রূপের নাম না করিয়া স্ব-রূপের নাম করেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

আসামের পত্র-পত্রিকা*

যে প্রদেশের সাময়িক পত্রের বিবরণী লিখিত হইতেছে, তাহার একটি মাত্র জেলা—গোয়ালপাড়া—মোসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হওয়াতে ইহা বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। অপর পাঁচটি জেলা—কামরূপ, দরাং, নৌগাঁ, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর—প্রায় সপ্ততি বর্ষ পরে ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতের ভাগ্য-বিধাতা। ব্রহ্মদেশীয়গণ আসিয়া আসাম অধিকার পূর্ব্বক এই অঞ্চলে প্রবল দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে এবং ব্রিটিশ-সীমান্তঃপাতী কোনও কোনও স্থান আক্রমণ করাতে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪ খৃঃ অব্দে) ঘোষিত হয়। দুই বৎসর কাল ঐ যুদ্ধ চলে—সেই সময়ের মধ্যেই আসাম-প্রদেশ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮২৬ অব্দে 'ইয়াণ্ডাবু'র সন্ধি দ্বারা নিম্ন-ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে আসাম-প্রদেশটিও ব্রহ্মরাজ ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করেন। সমগ্র আসামদেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইলেও, শিবসাগর ও লক্ষীমপুর, এই দুইটি জেলা বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা মাত্র কর দিবার সর্ত্তে আহোম-রাজের শাসনাধীনেই রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৮ অব্দে শাসনকার্য্যে বিশৃঙ্খলতা ও নির্দ্ধারিত করের অনাদায় হেতুতে ঐ দুই জেলাও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আসিয়া পড়ে।

উপরিলিখিত ইতিহাসটুকু না জানিলে আসামে সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন কত সত্বর হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে না। বঙ্গদেশ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের দখলে আইসে—তাহার প্রায় ৬০ বৎসর পরে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশিত হয়। কিন্তু আসাম-প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইবার মাত্র ২০ বৎসর পরেই আসামের সর্ব্বপ্রথম সাময়িক পত্র "অরুণোদয়" প্রকাশিত হইয়াছিল। এইটুকুতেও প্রকৃত কথা বলা হইল না। 'অরুণোদয়' শিবসাগর হইতে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হয়—সেই শিবসাগর মাত্র ৮ বৎসর পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আসিয়াছিল।

কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থে ইহার কারণও অবধারণ করা কর্ত্তব্য। একটা আমের আঁটি পুতিয়া চারা জন্মাইয়া, তাহা হইতে ফললাভ করিতে কত সময়ের প্রয়োজন! আর কলমের গাছ হইতে ফল পাইতে কতক্ষণ! ফলতঃ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে, শাসন-কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বিধান করিতে, সর্ব্বোপরি এতদ্দেশে কি প্রকারে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তদর্থে উপায় উদ্ভাবন করিতে ইংরেজের কত

---

* এ স্থলে 'আসাম' অর্থে প্রকৃত আসাম অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মাত্র বুঝিতে হইবে। [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ১০ম মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল]।

বেগ পাইতে হইয়াছে। আর যখন আসাম অধিকৃত হইল, তখন ঐ সকল উপায় সম্যক্ অবধারিত ছিল—কেবল প্রয়োগ করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহারই অপেক্ষা ছিল।

যাঁহারা অসমীয়া ভাষায় সর্ব্বপ্রথম পত্রিকার প্রচারক—সেই মিশনারী মহাত্মগণের সম্বন্ধে এ স্থলে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন।* ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে কাপ্তান (পশ্চাৎ জেনারেল) জেন্‌কিন্‌স্ আসামের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তিনি এখানে আসিয়াই বঙ্গদেশস্থ ইংলিশ ব্যাপ্টিস্‌ট মিশনের খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকদিগকে আসামে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা নবার্জ্জিত প্রদেশে আসিতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, ব্রহ্মদেশে অবস্থিত আমেরিকান্ ব্যাপ্টিস্‌ট মিশন সম্প্রদায়কে আসামে যাইতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তাঁহারা তজ্জন্য প্রস্তুতই ছিলেন; কেন না, আমেরিকায় তাঁহাদের যে বোর্ড ছিল, তাহার সভ্যগণ দীর্ঘকাল হইতেই উত্তর-পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী শান-রাজ্যসমূহে—তথা তিব্বত ও চীনদেশে—সুসমাচার প্রচার করিবার নিমিত্ত উৎসুক ছিলেন। তাই ব্রহ্মদেশস্থ আমেরিকান ব্যাপ্টিস্‌ট মিশনের পাদরী ব্রাউন (Brown) ও কটার (Cutter) সস্ত্রীক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া নৌকায় ১৮৩৬ খৃঃ অব্দের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে সদিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। "সদিয়া" আসামের পূর্ব্বোত্তরপ্রান্তবর্ত্তী ষ্টেশন—চীন-সাম্রাজ্য ঐ স্থান হইতে অদূরবর্ত্তী, তাই মিশনরীগণ সদিয়াতে তাঁহাদের প্রথম আড্ডা স্থাপন করিলেন। অব্যবহিত পরেই পাদরী ব্রন্‌সন্ (Bronson) সস্ত্রীক আসিয়া ইহাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই "জয়পুর" নামক স্থানে নূতন প্রচারক্ষেত্র সংস্থাপন করেন। ১৮৩৯ অব্দের জানুয়ারী মাসে খাম্‌তিরা সদিয়া আক্রমণ করিয়া হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিপ্রয়োগ পূর্ব্বক স্থানটিকে বিধ্বস্তপ্রায় করাতে তত্রত্য পাদরীগণ সদিয়া চিরতরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক "জয়পুরে" আসিয়া সমবেত হইলেন। এই জয়পুরে সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৯ অব্দে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। তাহাতে শান, খাম্‌তি, সিংফো ও নাগা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া ভাষার পুস্তকাদি ইংরেজী ও বাঙ্গালা হরফে মুদ্রিত হইতে লাগিল। এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম ১৮৪১ অব্দে নিধিরাম নামক একজন অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করেন—তিনি অসমীয়া ভাষায় ধর্ম্ম-সঙ্গীতাদি রচনা করিয়া পাদরীগণের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

যাহা হউক, জয়পুরের আব্‌হাওয়া মিশনারীগণের সহ্য হইল না—বিশেষতঃ জয়পুরে চা-ক্ষেত খুলিলে জনতা খুব হইবে—এই আশায়ই এ স্থলে আড্ডা স্থাপন হইয়াছিল; কিন্তু সেই আশা ফলবতী হয় নাই। তাই ১৮৪১ অব্দে জয়পুর ছাড়িয়া শিবসাগরে আসিয়া তাঁহারা উপনিবিষ্ট হইলেন। এত দিন তাঁহারা নানা বিভীষিকার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন—

---

* এতদ্বিষয়ক বিবরণ ১৯১১ খৃঃ অব্দের আসাম ব্যাপ্টিস্‌ট মিশনরী কন্‌ফারেন্‌সের রিপোর্ট হইতে অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই রিপোর্টে সন-তারিখের নানা গোলযোগ আছে, এ স্থলে যথাসাধ্য তাহা সংশোধিত হইয়াছে।

এ স্থানে আসিয়া তাঁহারা শান্তিতে ও স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮৪৩ অব্দের মার্চ্চ মাস হইতে "অরুণোদয়" প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং ১৮৪৫ অব্দে অপর একটি ছাপাখানাও শিবসাগরে সংস্থাপিত হইল।

অসমীয়া ভাষায় প্রচারিত প্রথম পত্র অরুণোদয় সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে অসমীয়া ভাষা এই মিশনারী সম্প্রদায়ের নিকটে কীদৃশ ঋণী, তাহা প্রদর্শনার্থে এ স্থলে ঐ ভাষার তদানীন্তন অবস্থা বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। সমাজ ও রাজাধিকার—এই দুইএর উপরেই প্রধানতঃ ভাষার ঐক্যানৈক্য নির্ভর করে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসিবর্গ বঙ্গীয় সমাজ হইতে পৃথক্ অবস্থিত এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভিন্ন রাজত্বের অধিকারভুক্ত থাকাতে এখানে অসমীয়া ভাষার একটা পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভাবিত হইয়াছিল। কেবল গোয়ালপাড়া জেলা বাঙ্গালার অধীন থাকায়, ইহাতে বঙ্গভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল—অথবা ঠিক্ বলিতে গেলে ইহার ভাষা বাঙ্গালা ভাষা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আসামের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন কিয়ৎকাল—প্রায় ১১ বৎসর—আহোম-শাসনরীতিই এই স্থলে অনুসৃত হইয়াছিল—এখানকার কথাবার্ত্তার ভাষাতেই রাজকীয় কাজকর্ম্মও চলিয়াছিল।

তার পর ক্রমশঃ যখন বঙ্গদেশের ন্যায় এই নববিজিত স্থানেও আইন আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল এবং বিদ্যালয়াদি খুলিবার প্রয়োজন হইল, তখন বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে লোকজন আনিয়া সরকারি কর্ম্মে ও শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। এই বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ ও পণ্ডিতবর্গ দেখিলেন যে, আসামের—বিশেষতঃ গোহাটি অঞ্চলের—ভাষা রঙ্গপুর গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী জেলাগুলির ভাষারই অনুরূপ; তাই ঐ সকল স্থানের কথোপকথনের ভাষার ন্যায় এই আসামের ভাষাকেও বাঙ্গালারই একটা উপভাষা মনে করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই উপদেশে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গভাষায় সরকারী কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাও বাঙ্গালা ভাষায় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি আইন-আদালতে ও স্কুল-পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন হইল।*

এই ব্যবস্থা বহু দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। যখন সার্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল্ বঙ্গের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন, তখন তিনিই সর্ব্বপ্রথম ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আসামের আদালতে ও পাঠশালায় অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তনের আদেশ দেন। তৎপরে হাই ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে

* কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেবগণ কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তাঁহারা তৎকালে পাঠ্য পুস্তকের অসদ্ভাব দেখিয়া তাঁহাদের অধীন বাঙ্গালীদের দ্বারা বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থও রচনা করাইয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে একটি উদাহরণও সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কামরূপের প্রথম ডেপুটি কমিশনর (১৮৩৫-৪০ খৃঃ) কাপ্তান মেথি সাহেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদীয় পেশ্‌কার শ্রীহট্টনিবাসী মোন্‌শী জয়গোপাল রায় "বিদ্যোদয়" নামক একখানি স্বল্পায়তন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন হইল, ঐ পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হওয়াতে উহার মুখবন্ধ হইতে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে।

বঙ্গভাষা চলিয়াছিল ; সার হেনরি কটনের আমলে ঐ সকলেও অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বা সার হেনরি কটনের কত পূর্ব্বে এই বৈদেশিক মিশনারীগণ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক অসমীয়া ভাষায় পুস্তক লিখিয়া ও পত্রিকা প্রচার করিয়া এবং ব্যাকরণ রচনা করিয়া ও অভিধান সঙ্কলন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া আসামবাসীদের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিয়াছেন। অসমীয়া ভাষায় যে একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, এ কথা তখনকার দিনে গবর্ণমেণ্ট কিংবা বঙ্গদেশবাসী অথবা বিদেশীয় মিশনারী প্রভৃতি কেহই জানিতেন না। অসমীয়া ভাষা যখন একটা উপভাষা মাত্র বলিয়া সরকার বাহাদুরের—তথা প্রতিবেশী বাঙ্গালীর নিকটে অবজ্ঞাত হইতেছিল, তখন এই মিশনারী মহাত্মগণ ইহাকে সমাদর করিয়া না রাখিলে ইহার অস্তিত্ব আজ সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্ত হইত। ব্রহ্মদেশীয়দের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও অবসাদপ্রাপ্ত অসমীয়া-সমাজ ব্রিটিশ সুশাসনের শান্তিতে মুগ্ধ হইয়া তখন যেন প্রসুপ্ত ছিল—তাই মাতৃভাষার এই সঙ্কটের দিনেও দীর্ঘকাল তাহাদের কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই—মিশনারীগণের কার্য্যারম্ভের বহু পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য" (A few Remarks on the Assanese Language) অভিধেয় একটি ইংরেজী নিবন্ধে আসামের সর্ব্বপ্রথম ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষিত দেশহিতৈষী মহাত্মা আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন মাতৃভাষার প্রচার সমর্থন করিয়াছিলেন।

এ স্থলে বলিতে পারি যে, মুদ্রাযন্ত্র বা পুস্তক ছাপান, কিংবা সংবাদপত্র প্রচার, পাশ্চাত্য ধরণে ব্যাকরণ লেখা বা অভিধান সঙ্কলন, এগুলি এক প্রকার বিদেশেরই জিনিষ—বৈদেশিকগণই এ সকলের প্রবর্ত্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক—যেমন বঙ্গদেশেও ঐগুলি মিশনারী সাহেবেরাই সর্ব্বাদৌ করিয়া গিয়াছেন ; ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু বঙ্গদেশে মিশনারীগণ বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকাণ্ড সাহিত্যের খবর পাইয়াছিলেন—বাঙ্গালীরা আপন মাতৃভাষার চর্চ্চা নানাপ্রকারে তখনও খুবই করিত—মিশনারীগণ বাঙ্গালীদিগকে তখনও সাহায্যকারিরূপে পাইয়াছিলেন—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টও বঙ্গভাষার অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। পরন্তু আসামে তাদৃশ সাহায্য বা উৎসাহ এই মিশনারীগণ পান নাই—তাঁহারাই অসমীয়া ভাষাকে এক প্রকার গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছিলেন ; তাই তাঁহারা আসামবাসিগণের চিরকৃতজ্ঞতার ভাজন, তাঁহাদের ঋণ আসামবাসীর পক্ষে অপরিশোধ্য। বঙ্গদেশে মিশনারীরা তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র না খুলিলেও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু যদি আসামে ইহাঁরা না আসিতেন, তবে অসমীয়া ভাষাটি আজ নামশেষ মাত্র হইত, এ বিষয় অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

এখন যথাসম্ভব পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র-পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। 'অরুণোদই' (অরুণোদয়)—এত ক্ষণ ইহারই কথা প্রকারান্তরে বলিয়া আসিতে-

ছিলাম। ইহা 'সচিত্র' মাসিক পত্রিকা ছিল—কিন্তু ইহার "সম্বাদ-পত্র" এই বিশেষণ ছিল। ফলতঃ সর্ব্বাদৌ ইহাতে 'অনেক দেশের সংবাদ' থাকিত। ১৮৪৬ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৮৮২ অব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। ইহাই সর্ব্বপ্রথম অসমীয়া পত্রিকা হওয়াতে আসামে এখনও গ্রাম্য লোকদের মধ্যে 'অরুণোদয়' সংবাদ-পত্রের প্রতিশব্দরূপে চলিত আছে।

'অরুণোদয়' নামের সঙ্গে বঙ্গদেশের একটু সম্পর্ক আছে। আসামের মিশনারীগণের সঙ্গে বঙ্গদেশীয় মিশনারীদের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—তাহা বলাই বাহুল্য। ঠিক্ যে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড্ লালবিহারী দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত অরুণোদয় সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়, * সেই সময়েই আসামেরও এই 'অরুণোদয়' প্রচারিত হয়।

মিশনারী মহাত্মগণ অরুণোদয় প্রভৃতি প্রচার দ্বারা অসমীয়া ভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন—তাহা ইতঃপূর্ব্বে সবিস্তরে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ভাষাটিকে নিজের পসন্দমত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের খবর রাখিতেন না—তাই কথোপকথনের ভাষা যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন এবং বর্ণ-বিন্যাস তাঁহাদের সুবিধা-মতে যাদৃশ উচ্চারণ, তাদৃশই করিতেন। তাঁহাদের অবলম্বিত বানান-রীতিকে ইংরাজীতে ফনেটিক্ স্পেলিং বলে এবং পাদরী ব্রন্‌সন্ অসমীয়া ভাষায় সর্ব্বপ্রথম যে অসমীয়া-ইংরেজী অভিধান সঙ্কলন করেন, তাহাতে অসমীয়া বর্ণমালার যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, স্বরবর্ণ হইতে দীর্ঘ ঈ, ঊ এবং ঋবর্ণ তাঁহারা উঠাইয়া দিয়াছিলেন; এবং ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে ঙ, ছ, ঝ, ণ, ব, য, শ ও ষ বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঙএর কাজ ঙ্গ দ্বারা চালাইতেন, 'ছ', 'ঝ'এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'চ' 'জ' ব্যবহৃত হইত; দন্ত্য ন ও দন্ত্য স দ্বারা ণ ও শ-ষএর কাজ কুলাইত। 'য'এর কাজ 'জ' দ্বারা চলিত, কিন্তু 'য়' রাখিয়াছিলেন। স্বরবর্ণে হ্রস্ব ই উ দ্বারা ঈবর্ণ ও ঊবর্ণের কাজ চলিত এবং ঋকারের স্থলে 'রি' ব্যবহৃত হইত। বিসর্গকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সংযুক্ত বর্ণেও অনেক বাদ পড়িয়াছিল। যথা—জ্ঞ স্থলে 'গ্য', 'ক্ষ'স্থলে 'খ্য' এইরূপ লেখা হইত।† ইহাতে ভাষার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ আসামবাসী অনেকে—যথা, আসাম-

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী থাকে, তাহাতে আছে "প্রথম সচিত্র পত্রিকা—পাক্ষিক অরুণোদয়—১৮৪৬ অব্দ।" পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ (১৩০৪), ২য় সংখ্যায় বঙ্গীয় সংবাদপত্রের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দুইখানি "অরুণোদয়ে"র উল্লেখ আছে—এক বর্ণিত লালবিহারী দে-সম্পাদিত, অপর পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। সম্ভবতঃ দ্বিতীয়খানির সঙ্গে মিশনারীদের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

† অবগত হইলাম যে, এইরূপ চেষ্টা যে কেবল আসামেই পাদরীরা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বঙ্গদেশেও বাঙ্গালা ভাষাটা এই রীতিতে লিখিবার জন্য উদ্যম হইয়াছিল—বাইবেলের এক বঙ্গানুবাদ নাকি এতাদৃশী রীতিতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

বিলাসিনী-প্রবর্ত্তক ৺শ্রীদত্তদেব গোস্বামী, ৺হেমচন্দ্র বরুয়া, ৺গুণাভিরাম বরুয়া প্রভৃতি যখন প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এই বিপদ্ কাটিয়া গেল—উচ্চারণ যেরূপই হউক না কেন, বানান সংস্কৃতানুযায়ী হইতে লাগিল। তথাপি অরুণোদয় সুদীর্ঘ কাল আসামে একমাত্র 'সংবাদপত্র'রূপে প্রচারিত হওয়াতে এবং পাদরী ব্রন্‌সনের সেই অভিধানখানি বহুকাল পর্য্যন্ত একমাত্র মুদ্রিত অসমীয়া অভিধানরূপে প্রচলিত থাকাতে সাধারণের মধ্যে বানানবিষয়ক স্বাভাবিক অনবধান কিয়ৎপরিমাণে যে বর্দ্ধিত না হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

'অরুণোদয়ে' কথোপকথনের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আজকাল অসমীয়া লেখকগণ তাঁহাদের পুস্তক ও পত্রিকাদিতে যেরূপ অপরের দুর্ব্বোধ্য ধরুয়া কথা ও বাগ্‌ধারা (ইডিয়ম্) চালাইতেছেন, বিদেশাগত মিশনারীগণ তেমনটা পারেন নাই। তাই বানান-পদ্ধতি অপকৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের রচনা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। তাঁহারা অপর একটি বিষয়েও সাবধান ছিলেন—'তবর্গ' ও 'টবর্গে' তাঁহারা তেমন গোল বাধান নাই—যেমন অসমীয়াগণের মধ্যে অনেকে করিয়া থাকেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সাহেবেরা স্বয়ং তবর্গ ও টবর্গ মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করিতে স্বভাবতঃই অক্ষম বলিয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন এবং অরুণোদয়ের পরিচালকগণ প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই "ভার্ণাকুলার" শিক্ষা করিয়া আসাতেও বোধ হয়, দন্ত্য মূর্দ্ধন্য প্রভেদ করিতে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

অরুণোদয়ের প্রথম আট বৎসরের অসম্পূর্ণ কতিপয় সংখ্যা আমরা পড়িবার সুবিধা পাইয়াছি—তাহা হইতে কয়েকটি সংবাদ এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে; সংবাদগুলি সমস্তই বাঙ্গালার সংবাদপত্র ও পত্রিকা-বিষয়ক। ইহাতে এক দিকে যেমন অরুণোদয়ের বানান ও ভাষার নমুনা দেখা যাইবে, অপর দিকে বঙ্গীয় পত্র-পত্রিকারও কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

অরুণোদয়—জুলাই ১৮৫৬

"শ্রী*বাবু ব্রজনাথ সবকাবে কলিকাতা নগবত বাঙ্গদর্শক নামেবে এখন নতুন সম্বাদপত্র চাপিবলৈ আবম্ভন কবিচে।" (চ=ছ) "বঙ্গালত থকা কোনো কোনো বঙ্গালি গিয়ানি (জ্ঞানী) লোকে ফ্রি ইন্‌কোয়াবেব নামেবে এখন নতুন সমাচাবদর্পণ চাপিবলৈ ধবিচে।" (সমাচার-দর্পণ সংবাদপত্রের প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বোধ হয়, অন্ততঃ মিশনারী-সমাজে)

অরুণোদয়—আগষ্ট ১৮৪৬

"কলিকত্তাত কোনো বঙ্গালি বাবুবিলাকে প্রসাদ পুবান নামে এক নতুন সমাচাবদর্পন চাপিবলৈ ধবিচে।" ('প্রসাদপুরাণ' নামটি, কোনও ভুল না থাকিলে, উদ্ভট বটে)

* 'শ্রি' হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাদরী মহোদয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক অসমীয়াভাষাকে 'শ্রী'হীন করেন নাই। এইটি সম্ভবতঃ নামের আন্তে প্রায়শঃ বসাইতে হয় বলিয়া বিশেষতঃ রক্ষিত হইয়াছিল। ( ) মধ্যে মন্তব্যগুলি লেখকের নিজব।

'কলিকতা নগৰত এক জুগ্যত দিপিতা ভাস্কৰ নামেৰে ইংৰাজি বঙ্গালি হিন্দি ফাৰচি আৰু আৰবি এই পাঁচ ভাষাৰে এক সমাচাৰদৰ্পণ নাজিৰউদ্দীন নামেৰে এক মৌলবিএ মেই মাহত (=মে মাসে) প্ৰথম নম্বৰ চাপিছিল কিন্তু এতিয়া (=এখন) চলাব নোআৰা (না পারা) হেতুকে চাপিবলৈ এৰিলে (=ছাড়িলেন)।" (এই 'জুগ্যতদ্দীপিতা যে কি, বুঝা গেল না—কোনও আরবী পারসী শব্দও হইতে পারে। সংস্কৃত "যুগপৎ দীপয়িতা" হইবে কি ? তাহা হইলে মৌলবী সাহেবের বাহাদুরী খুবই বলিতে হইবে।)

অৰুণোদয়—মে ১৮৫১

"কলিকতা আদি বঙ্গাল দেসত চলোআ বঙ্গালি ভাষাৰ সমাচাৰপত্ৰ বিলাকৰ নাম।

দিনে পত্তি চাপা কৰা পত্ৰ (=দৈনিক)

	নাম	ঠাই	বচৰে কত দৰ (বাৰ্ষিক মূল্য)
১।	প্ৰভাকৰ	সিমলা	১২৲
২।	পুৰ্ণচন্দ্ৰোদই	আম্ৰাতলা	১২৲
		সপ্তাহত তিনি বেলি (তিন বার) চাপা।	
১।	ভাস্কৰ	সোভাবাজাৰ	১২৲
২।	ৰসসাগৰ	চোৰিবাগান	৬৲
		সপ্তাহত দুইবাৰ চাপা	
১।	চন্দ্ৰিকা	আৰপুলি	১২৲
২।	ৰসৰাজ	সোভাবাজাৰ	৬৲
৩।	সজনৰঞ্জন (সজ্জনরঞ্জন)	সিমলা	
৪।	গ্যানপ্ৰদানি (=জ্ঞানপ্রদায়িনী)	বৰ্ধমান	৩৲
		সপ্তাহত এবেলি (=একবার) চাপা	
১।	সাধুৰঞ্জন	সিমলা	
২।	সুধাংসু	কলিকতা	
৩।	গৱৰ্ণমেণ্ট গেজেট্	শ্ৰিৰামপুৰ	১২৲
৪।	সত্যপ্ৰদিপ	শ্ৰিৰামপুৰ	৬৲
৫।	সংবাদবৰ্ধমান	বৰ্ধমান	৬৲
৬।	চন্দ্ৰোদই	বৰ্ধমান	৬৲
৭।	বাৰ্ত্তাবহ	ৰঙ্গপুৰ	৬৲
		মাহত দুবেলি চাপা। (পাক্ষিক)	
১।	নিত্যধৰ্ম্মানুৰঞ্জিকা	পাতৰিয়াঘাট	
		মাহে মাহে চাপা	
১।	তত্ত্ববোধিনি পত্ৰিকা	জোৰাসাকু	১২৲
২।	কৌস্তুভকিৰন	সোভাবাজাৰ	১২৲
৩।	উপদেসক	চেৰুলাৰ ৰোদ	১॥০
৪।	সত্যাৰ্নব	মিৰ্জাপুৰ	১৶০
৫।	সৰ্বশুভকাৰি	বৌবাজাৰ	৩৲

এই অরুণোদয়ের মূল্য বার্ষিক এক টাকা ছিল। সুদূর আসামে থাকিয়া সচিত্র মাসিক পত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে প্রচার করা মিশনারীগণের খুবই প্রশংসার কথা।

অরুণোদয়ের প্রবর্ত্তন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশ প্রচার কল্পেই মুখ্যতঃ হইলেও, ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ক উপাদেয় প্রবন্ধ থাকিত—চিত্রগুলিও বেশ সুন্দর হইত। আসাম বুরঞ্জির (আহোম ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে) অসমীয়া অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আহোম, কাছাড়ী প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রার চিত্রও ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ফলতঃ পাদরী সাহেবেরা পত্রখানিকে সাধারণের হৃদয়াকর্ষক ও নানাবিষয়ে শিক্ষাপ্রদ করিতে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন।

তবে তাঁহারা ভুল-ভ্রান্তির অধীন ছিলেন না—এ কথা বলিতে পারি না। দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথার সমর্থন করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারকালে ইহাঁরা লিখিয়াছিলেন,—"তেওঁ সকল ব্রাহ্মণতকৈ জাতিত অতি উত্তম।" এবং তাজমহলের চিত্রের নীচে পরিচয়স্থলে লিখিয়াছিলেন,—"নুরজেহান মহারাণির তৈয়ামের মঠ—The Taj-mahal or Tomb of Nurjehan।" *

২। আসামবিলাসিনী—অরুণোদয়ের ২৫ বৎসর পরে আসামের এই দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকার প্রকাশ হয়। পর্য্যায়ে দ্বিতীয় হইলেও আসামবাসী কর্ত্তৃক পরিচালিত পত্রিকার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবদের মঠকে 'আখড়া' বলে, আসামে ঐগুলিকে 'সত্র' বলে। শিবসাগর জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্থ 'মাজুলি' নামক দ্বীপে আসামের প্রধান প্রধান কয়েকটি সত্র স্থাপিত আছে—তন্মধ্যে আউনিআটি সত্র সর্ব্বপ্রধান। এই সত্রের ভূতপূর্ব্ব অধিকারী মহাত্মা ৺শ্রীদত্তদেব গোস্বামী মহোদয় অতীব বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নিজ জেলাস্থিত মিশনরীগণের দ্বারা 'অরুণোদয়' প্রচার ব্যপদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে দেখিয়াই তিনি আর্য্যধর্ম্মনীতি প্রচার-কল্পে তদীয় সত্রে একটি প্রেস্ আনিয়া তাহার নাম "ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্র" প্রদানপূর্ব্বক এই "আসাম-বিলাসিনী" পত্রিকার প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, ইহাও অসমীয়া ভাষারই লিখিত হইত—তবে সংস্কৃতজ্ঞ গোস্বামী মহাশয়ের পত্রিকার বর্ণবিন্যাস-রীতি ও ভাষাব্যবহার সংস্কৃতানুযায়ীই ছিল। পত্রিকাখানি 'মাসিক' ছিল, এ কথা বলিয়াছি; কিন্তু ইদানীং প্রবর্ত্তিত নবপর্য্যায়ে "আসাম-বিলাসিনী"র প্রথম সংখ্যায় "আত্ম-কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—"আজি বহুদিনৰ আগেয়ে আউনিআটি সত্ৰৰ ধৰ্ম্মপ্ৰকাশ ছাপাখানাৰপৰা আসাম-বিলাসিনী নামেৰে এখনি সাদিনিয়া বাতৰিকাগত (=সাপ্তাহিক সংবাদপত্র) চলা বহুতৰ মনত আছে।" ইহাতে বোধ হয়, ইহা বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বে কিয়দ্দিন সাপ্তাহিক ভাবে প্রচারিত হইত।†

* প্রবন্ধ বা চিত্রের নাম অসমীয়া ভাষাতে লিখিয়া নিম্নে ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইত। আজকাল স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলিতে এতাদৃশ দ্বি-জিহ্ব (bi-lingual) শিরোনামাদি দেখা যাইতেছে।

† এ বিষয়ে তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া আসামবিলাসিনীর বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম,

"ভাস্কর" প্রভৃতি বঙ্গীয় অনেক প্রাচীন পত্রিকার শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা উহার পরিচয় প্রদান করা হইত। এতদনুকরণে আসাম-বিলাসিনীরও শিরোদেশে বৃত্তাভাস আকারের একটি সিলের ভিতরে পত্রিকার নাম সহ নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক পরিদৃষ্ট হইত,—

যা শ্রীমজ্জগদীশসদ্‌গুণগণালঙ্কারসম্ভূষিণী
বার্তাব্রাতবিকাশিনী জনমনঃ শশ্বৎসুধাবর্ষিণী।
নানাখ্যানসুভাষিণী গুণবতী স্বেষাং শুভান্বেষিণী
সৈষাসামবিলাসিনী বিলসতি শ্রীদত্তহৃত্তোষিণী॥
সম্বাদসন্দোহজুষাং জনানামাখ্যায়িকায়াঞ্চ কৃতস্পৃহাণাম্।
তোষায় সদ্বৃত্তবতাঞ্চ পুংসাং ভূয়াৎ সদাসামবিলাসিনীয়ম্॥

এতৎসহ ঐ সিলমোহরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

উত্তর পাই নাই। আসাম প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, ইহা 'সাপ্তাহিক' হইবার একটা কথা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আসামের ইতিহাস-লেখক মহামতি গেইট সাহেব ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে "Report on the Progress of Historical Researches in Assam" নামে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন—তাহার পরিশিষ্টরূপে (Appendix D), A short account of the rise and progress of journalism in the Assam Valley শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রাগুক্ত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া মুদ্রিত হয়। ইহা যদিও অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র, তথাপি ১৮৯৫ অব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির বিবরণ সংকলনে ইহা হইতে আমরা বহু সাহায্য লাভ করিয়াছি।

আসাম-বিলাসিনী ১৮৭১ অব্দ হইতে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা শ্রীদত্তদেব গোস্বামী লোক-শিক্ষার্থে কেবল যে পত্রিকা প্রচারই করিয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি নাটকাদিও রচনা করিয়া সাধারণ্যে উপদেশ প্রচারার্থে অভিনয় করাইতেন। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত নাটক লিখিয়া তিনি প্রাকৃতের পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষার ব্যবহার করিতেন—ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার সমাদরের ভাবই প্রকাশ পাইত।*

৩। আসামমিহির—ইহা 'আসাম-বিলাসিনী'র এক বৎসর পরে ১৮৭২ অব্দে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আসামের আফিসে ও স্কুলে বঙ্গভাষাই প্রচলিত হইয়াছিল। আফিস আদালতে এবং বিদ্যালয়াদিতে বহু বাঙ্গালী কাজকর্ম্ম করিতেন—ইঁহারা বঙ্গভাষার চর্চ্চা করিলেও এ পর্য্যন্ত পত্রিকা প্রচার দ্বারা ভাষার প্রসার সাধনে কোনও প্রযত্ন করেন নাই। যাহা হউক, অবশেষে ১৮৭২ অব্দে—যে বৎসরে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল আসামের আইন আদালতে ও প্রাইমারি স্কুলগুলিতে অসমীয়া ভাষার প্রবর্ত্তন করেন—গৌহাটির উচ্চপদস্থ শিক্ষিত বাঙ্গালী মিলিত হইয়া বঙ্গভাষায় এই পত্রিকা প্রচার করেন। এই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে আসামের সুপ্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী ও তদানীন্তন গৌহাটি কলেজের অধ্যক্ষ বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গালীর চিরসুহৃৎ কামরূপ—বড়পেটানিবাসী শ্রীযুক্ত চিদানন্দ চৌধুরী (অধুনা রায়সাহেব) একটি ছাপাখানা নিজ নামে সংস্থাপিত করেন—তিনিই এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হন। ইহাই আসামের সর্ব্বপ্রথম "সাপ্তাহিক পত্রিকা"। মহা সমারোহে পত্রিকাখানি পরিচালিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে বেতনগ্রাহী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া আনা হইয়াছিল। কিছু দিন পরে ইহাতে ইংরেজী প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে লাগিল; এই বিষয়েও আসামে এই পত্রিকাই সর্ব্বপ্রথম দ্বৈভাষিকী পত্রিকা। কিন্তু ব্যয়ের অনুরূপ আয় না হওয়াতে এবং সম্পাদক অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে পত্রিকাখানি দ্বিতীয় বর্ষেই বন্ধ হইয়া যায়। আসামে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনাও এই বাঙ্গালা পত্রিকাখানিতেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। এই সকল কারণে ইহা এখনও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।†

* যাঁহারা স্বর্গীয় শ্রীদত্তদেব গোস্বামী সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে বাসনা করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের লিখিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা" পত্রিকার ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ—১৩২০) প্রকাশিত "গোঁসাই ও ভকত" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

† এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবার সময়ে গৌহাটি নগরে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে উৎসাহ-স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ একটি বিষয় এ স্থলেই উল্লেখযোগ্য। অভয়াশঙ্কর গুহ নামক একটি বাঙ্গালী যুবক তখন হাই স্কুলে পড়িতেন; ঐ ছাত্রটির হৃদয়ে এত দূর উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছিল যে, স্বয়ং অক্ষর তৈয়ার করিয়া ব্লক খুদিয়া স্বহস্তে এক অতি ক্ষুদ্রাকার সচিত্র পত্রিকা ছাপাইয়া তাহা স্বয়ং বিলি করিতেন—এডিটার পাব্লিশার নিজেই সমস্ত ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম কেহ বলিতে পারে না—কয়েক সংখ্যা মাত্র চলিয়াছিল। এই যুবক পরিশেষে 'আসাম নিউস্' পত্রের সহকারী সম্পাদক হন—কিন্তু সরকারী কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া চলিয়া যান—তাহাতেও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন।

৪। আসামদর্পণ—দরং জেলার অধিবাসী জনৈক ভদ্রলোক কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৭৪ অব্দে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার কোনও ছাপাখানায় ইহা মুদ্রিত হইত এবং তেজপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তখন কলিকাতা হইতে তেজপুর আসিতে ষ্টীমারেও প্রায় তিন সপ্তাহ লাগিত।* এতদবস্থায় পত্রিকা আর কয় দিন চলে? ফলতঃ কয়েক মাসের মধ্যেই ইহার বিলোপ ঘটিল। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত অরুণোদয় প্রভৃতি আসামের পত্রিকা আসামেই মুদ্রিত হইত। কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া আনিয়া পত্রিকা-প্রকাশের ব্যবস্থা এই "আসাম-দর্পণে"ই সর্ব্বপ্রথম দেখা গেল।

৫। গোয়ালপাড়া-হিতৈষিণী†—এখানিও বাঙ্গালা ভাষার সাপ্তাহিক পত্র—গোয়ালপাড়া হইতে ১৮৭৬ অব্দে প্রকাশিত হয়। যশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সেন ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা প্রথমতঃ বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে উৎসাহাভাবে ১৮৭৮ অব্দে বিলুপ্ত হইয়া যায়। গোয়ালপাড়া জেলা জমিদার-বহুল স্থান এবং তন্মধ্যে দু একজন বিদ্যোৎসাহী বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জেলায় একখানি সাময়িক পত্রও চলিতেছে না।

৬। চন্দ্রোদয়—পাদ্রিদের "অরুণোদয়ে"র দেখাদেখি সম্ভবতঃ এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানির নামকরণ হইয়াছিল। নৌগাঁ জেলার দিহিঙ্গীয়া গোঁসাই কর্ত্তৃক ইহা ১৮৭৬ অব্দে প্রবর্ত্তিত হয়। গৌহাটির চিদানন্দ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইত। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা অল্প ছিল—গোঁসাই আপন শিষ্য শাখার মধ্যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা প্রদানার্থ ইহার প্রচার করেন। অল্পকাল মধ্যেই ইহা উঠিয়া যায়।

৭। আসামদীপিকা—ইহাও অসমীয়া মাসিক পত্র—১৮৭৬ অব্দে আউনিআটি সত্রস্থিত ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এক বৎসরকাল মাত্র ইহা চলিয়াছিল।

৮। আসাম নিউচ্ (= নিউস্)—ইংরেজী ও অসমীয়া ভাষায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি গৌহাটী হইতে ১৮৮২ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। আসামের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ—

* অরুণোদয় পত্রিকার ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় "কলিকতার পরা গুআহাটিলৈ ভাপর নাও (বাষ্পীয় তরী) অহা জোআর (আসা যাওয়ার) কথা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ঐ বৎসর একখানি জাহাজ আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখে কলিকাতা ছাড়িয়া গৌহাটিতে ২৯ তারিখে পৌঁছিয়াছিল, অর্থাৎ ইহার ১৭ দিন লাগিয়াছিল। তেজপুরে ষ্টীমার যাইত বলিয়া কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। গেলে আরও তিন চারি দিন লাগিবারই কথা।

† ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখিত গেইট্ সাহেবের রিপোর্টের পরিশিষ্টে যে পত্রিকা-বিবরণী আছে, তাহাতে গোয়ালপাড়া-হিতৈষিণীর পূর্ব্বে দুইখানি অসমীয়া পত্রিকার উল্লেখ আছে—কিন্তু নাম নাই। ঐ উভয়খানি নৌগাঁ জেলা হইতে ১৮৭৫-৭৬ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তদানীন্তন আসাম এড্‌মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে ইহাদের উল্লেখ দেখিয়াই বোধ হয়, ঐ বিবরণীতে উল্লেখিত হয়। একখানি সাহিত্য-বিজ্ঞানবিষয়ক, অপরখানি ধর্ম্মবিষয়ক ছিল। উভয় পত্রিকাই সম্ভবতঃ মাসিক ছিল এবং কলিকাতা হইতে মুদ্রিত হইয়া আসিত।

স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বরুয়া, ৺মাণিকচন্দ্র বরুয়া প্রভৃতি সকলেই ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন এবং খুব আড়ম্বর সহকারে পত্রিকাখানি চলিয়াছিল। ইহার গ্রাহক-সংখ্যা কিঞ্চিদূন হাজারে উঠিয়াছিল—এত গ্রাহক এ যাবৎ এতদঞ্চলের কোনও সংবাদপত্রের হয় নাই। কিন্তু পত্রিকাখানি ১৮৮৫ অব্দের মধ্যভাগে উঠিয়া যায়। 'আসাম নিউস্' রাজাপ্রজা উভয়েরই নিকটে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল—কিন্তু সম্পাদকীয় ভার যাঁহাদের হস্তে ছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে চলিয়া যাওয়ায় এই অতি হিতকরী পত্রিকা অকালে বন্ধ হইয়া যায়।

৯। আসাম-বন্ধু—আসামের সুসন্তান স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৮৫ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। গুণাভিরাম বাহাদুর আসামের ইতিহাস প্রণয়ন ব্যপদেশে দেশের অতীত কাহিনীতে অশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন—এই পত্রে তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার ফল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় বর্ষেই পত্রিকা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

১০। মৌ (=মধু)*—গৌহাটি শহরবাসী শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ বড়া ১৮৮৬অব্দে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একৃজিকিউটিব এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বলিনারায়ণ বড়া (সুপ্রসিদ্ধ ৺রমেশচন্দ্র দত্তের জামাতা) ইহার প্রকাশকল্পে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ইহাও কলিকাতায় মুদ্রিত হইত। এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি কিয়ৎকাল স্থায়ী হইবে বলিয়াই আশা করা গিয়াছিল—কিন্তু চারি মাসকাল মাত্র চলিয়াই ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এই পত্রিকার নামকরণ হইতে আমরা একটি বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এ যাবৎ অসমীয়া-পত্রিকা-প্রকাশকগণ পত্রিকাগুলির যথাসম্ভব সংস্কৃত নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসামের নব্য যুবকগণ সংস্কৃত শব্দের অসমীয়া প্রাকৃত পত্রিকার নামে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন—'মৌ' তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত। শ্রীদত্ত, হেমচন্দ্র গুণাভিরামের সংস্কৃতানুসারিণী ভাষাও এই উদীয়মান লেখকবর্গের অনুসরণীয় রহিল না।

১১। আসামতারা—এই অসমীয়া মাসিক পত্র আউনিআটি সত্রস্থিত ধর্ম্মপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১৮৮৮ অব্দে প্রকাশিত হয়। শ্রীধরচন্দ্র বরুয়া নামক জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রধানতঃ আর্য্য-ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলীই ইহাতে থাকিত। কিন্তু সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ও উপেক্ষিত হইত না। সম্পাদক শ্রীধরচন্দ্র তীর্থপর্য্যটনে চলিয়া যাওয়াতে ১৮৯০ অব্দে ইহা লুপ্ত হইয়া যায়।

* মৌ যে 'মধু', তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিবেন—বাঙ্গালায় 'মৌ-মাছি' শব্দে ইহার প্রচার আছে। কিন্তু পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ 'মৌ' শব্দ দ্বারা "মৌ-মাছি"ই বুঝাইয়াছিলেন—কেন না, নামের নিম্নে ইংরাজী প্রতিশব্দ 'Bee' লেখা ছিল, বলিয়া জানিতে পারিলাম।

১২। নবাবন্ধু—৺রায় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুরের 'আসামবন্ধু' পত্রিকার অনুকরণে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ষোড়শবর্ষীয় যুবক করুণাভিরাম বরুয়া এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে ১৮৮৮ অব্দে প্রচার করেন। ইহার দুই সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিতাপের বিষয় যে, তরুণবয়স্ক সম্পাদক স্বীয় পত্রিকাখানির ন্যায় অকালে মানবলীলা সংবরণ করাতে আসামের সাহিত্যাকাশ হইতে একটি উদীয়মান জ্যোতিষ্ক অসময়ে অস্তমিত হইয়া গেল। আসামের বাহিরে থাকিয়া অসমীয়া পত্রিকা সম্পাদনপূর্ব্বক প্রকাশিত করার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত বলিয়াও এই স্বল্পজীবী পত্রিকাখানি উল্লেখযোগ্য।

১৩। জোনাকী (=জ্যোৎস্না)—কলিকাতাস্থ অসমীয়া ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ১৮৮৯ অব্দে এই অসমীয় মাসিক পত্র প্রবর্ত্তিত হয়। 'জোনাকী' আসামীয় সাহিত্য-গগন প্রায় দশ বৎসর-কাল আলোকিত করিয়া স্বীয় নাম সার্থক করিয়াছিল। পত্রিকার লেখকগণ নব্য যুবক হইলেও বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন—তাঁহাদের দ্বারাই বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষার স্রোতঃ কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ; জনসাধারণ যে ভাষায় কথা বলে, তাহাই সাহিত্যে চালাইতে কৃতসংকল্প হইয়া, ইঁহারা প্রাচীন কামরূপীয় ভাষার অথবা হেমচন্দ্র গুণাভিরামের ভাষার অনুসরণ না করিয়া অসমীয়া ভাষাকে এমন এক আকার প্রদান করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক, নব্য লেখকগণ মাতৃভাষার সর্ব্ববিধ অভাব মোচনার্থে দৃঢ়সংকল্প হইয়া 'জোনাকী' অবলম্বনে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভূরি ভূরি সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন—অনেক মনোহর কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইদানীং বিদ্যালয়-পাঠ্য কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলন করিতে হইলে প্রায়শঃ এই 'জোনাকী' হইতে গদ্য-পদ্য নানাবিধ প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইতে দেখা যায়। জোনাকীর যে সকল উৎসাহী লেখক তখন ছাত্ররূপে পরিগণিত ছিলেন, আজকাল তাঁহাদের অনেকেই - যথা, শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বরা, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রভৃতি—অসমীয়া সাহিত্যের অভিভাবকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন—ইহাও জোনাকীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

১৪। বিজুলী (=বিদ্যুৎ)—জোনাকী প্রবর্ত্তনের পর বৎসরেই ১৮৯০ অব্দে কলিকাতাস্থ অসমীয়া ছাত্রগণ আরও একখানি মাসিক পত্রিকার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন—তখন 'বিজুলী' নাম দিয়া জোনাকীর সহযোগিনী অসমীয়া পত্রিকা প্রচারিত হইল। ইহাও জোনাকীর রীতিতেই চলিতেছিল। কিন্তু কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর চলিবার পরে যখন উৎসাহী যুবকগণের অনেকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন দুইখানি পত্রিকা কলিকাতায় চলা কঠিন হইয়া পড়িল। তাই সম্ভবতঃ "জোনাকী"খানিকেই অব্যাহত রাখিয়া 'বিজুলী' তুলিয়া দিতে হইল।

১৫। আসাম—'আসাম নিউস্' বিলুপ্ত হইবার পরে এই অঞ্চলে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের অভাব অনুভূত হইতেছিল। আসামের রাজনীতিক নেতৃবর্গের প্রধান, স্বনামধন্য

স্বর্গীয় মাণিকচন্দ্র বরুয়া এবং শিক্ষাবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত স্বধর্ম্মপরায়ণ ও স্বদেশবৎসল স্বর্গীয় কালীরাম বরুয়া এই 'আসাম' নামধেয় সাপ্তাহিক পত্র ১৮৯৪ অব্দে প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতে ইংরেজী ও অসমীয়া উভয় ভাষার প্রবন্ধ থাকিত—৺মাণিকচন্দ্র বরুয়া মহোদয় ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতেন। কিয়দ্দিন বেশ গৌরবের সহিত পত্রিকাখানি চলিয়াছিল—রাজপুরুষেরা ইহাকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূকম্পনের পরে কামরূপ অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত এবং আরও নানা কারণে ক্রমশঃ পত্রিকার অবস্থাও খারাপ হইতে লাগিল। তথাপি বহু ক্ষতি সহ্য করিয়া স্বর্গীয় কালীরাম বরুয়া মহোদয় ১৯০১ অব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকাখানি চালাইয়াছিলেন। তৎপর ঋণদায়ে পত্রিকা ও প্রেস্ উভয়েরই ক্রমশঃ বিলোপ ঘটিল।

১৬। টাইম্‌স্ অব্ আসাম (Times of Assam)—এ পর্য্যন্ত আসাম অঞ্চলে দ্বৈভাষিকী দুই একখানি পত্রিকা চলিলেও সম্পূর্ণ ইংরেজীতে লিখিত পত্রিকা ছিল না। এই টাইম্‌স্ অব্ আসাম সেই অভাব পূরণ করিয়াছিল। ১৮৯৫ অব্দে ডিব্রুগড়নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ চাংকাকতি নামক জনৈক সুশিক্ষিত যুবক কর্ত্তৃক এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন পর্য্যন্তও ডিব্রুগড় হইতে তদীয় সম্পাদকতায় ইহা বেশ প্রতিপত্তি সহকারেই চলিতেছে। ইতোমধ্যে একাধিক পত্রিকা ডিব্রুগড়েই উদ্ভূত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু চাংকাকতি মহাশয়ের বিশেষ গৌরবের কথা যে, অবিচলিত ভাবে এই পত্রিকা এ যাবৎ সম্পাদিত হইতেছে। ইহা যে কেবল শিক্ষিত অসমীয়াগণের মুখপত্র, এরূপ নহে—এতদঞ্চলের চা-কর সাহেবগণও ইহাকে নিজের জিনিষ মনে করিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন--ইহা পত্রিকা-পরিচালকের সুদক্ষতার বিশেষ পরিচায়ক।

১৭। আসাম বন্তি (=বাতি=প্রদীপ)—বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত আসামের এই-খানিই প্রথম পত্রিকা। ১৯০১ অব্দে তেজপুর শহর হইতে অসমীয়া ও ইংরেজীতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বরুয়া। কিন্তু কিয়দ্দিন পরেই ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য আসামের প্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বরুয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে পত্রিকাখানি কেবল অসমীয়াতেই লিখিত হইত। কিন্তু অল্প দিন হইল, ইহা পুনশ্চ দ্বৈভাষিকী হইয়াছে এবং সাপ্তাহিকের পরিবর্ত্তে "পাক্ষিক" হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম "পাক্ষিক" পত্র।

১৮। বিজুলী—নূতন পর্য্যায়—১৮২৪ শকের * (১৯০২ খৃঃ অব্দের) বৈশাখ হইতে 'বিজুলীর' নবপর্য্যায় প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে তৃতীয় বৎসরে 'বিজুলী' বিলুপ্ত হওয়ায় নব পর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যারূপে সংজ্ঞিত হইয়াছিল। তদানীং শিলং প্রবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মা বি এ (অধুনা এম্ এ) ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং পত্রিকা

* আসামে শকাব্দারই প্রচলন অধিক—তবে সরকারী লেখাপড়ায় আগে বাঙ্গালা সাল খুবই চলিত। এখন ইংরেজী অব্দেই কাজ চলে।

তেজপুর সেণ্ট্রাল প্রেসে মুদ্রিত হইত। কয়েক সংখ্যা মাত্র চলিয়া এই নূতন পর্য্যায়ের বিজুলীও অদৃশ্য হইয়া গেল।

১৯। জোনাকী—নব পর্য্যায়—ইহাও ১৯০২ অব্দে আশ্বিন মাস হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ বার গৌহাটি শহর হইতে আসামের সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত সত্যনাথ বরা বি এ, বি এল্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ইহা প্রায় আড়াই বৎসর কাল চলিয়াছিল। শেষ বর্ষে প্রকাশের ভার অসমীয়া-ভাষা-উন্নতিসাধিনী সভার উপর অর্পিত হয়—কিন্তু সাধারণের উৎসাহাভাবে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

২০। ঈষ্টার্ণ হেরাল্ড্ (Eastern Herald)—ডিব্রুগড় শহর হইতে ১৯০২ অব্দে টাইম্স্ অব্ আসাম পত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। তত্রত্য বাঙ্গালী উকিল শ্রীযুক্ত বশংবদ মিত্র এম্ এ, বি এল্ উহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি এবং ডিব্রুগড়প্রবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পত্রিকাখানি আন্দাজ আড়াই বৎসরকাল চলিয়াছিল।

২১। সিটিজেন (Citizen)—অতঃপর ১৯০৪ অব্দে সেই ডিব্রুগড় শহর হইতেই এই আর একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হয়। ইহার সঙ্গে আসামপ্রবাসী বাঙ্গালীদের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। আসামে ইংরেজ-শাসন প্রবর্ত্তন অবধি হাকিম, কেরাণী, উকীল, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ইত্যাদিরূপে অনেক বাঙ্গালী এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। বহু বাঙ্গালী এখানে এক প্রকার ঘরবাড়ী বাঁধিয়া দুই তিন পুরুষ যাবৎ বসতি করিতেছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে কাজকর্ম্ম পাওয়া দিন দিনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছিল। অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপন জন্মভূমিতে চাকুরী পাওয়া সম্বন্ধে ষোল আনারই দাবিদাওয়া করিতেছিলেন, অনেকটা এই নিমিত্তে তদানীং বাঙ্গালী ও অসমীয়ার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতেছিল—যেমন এখনও বিহারে হইতেছে। যাহা হউক, বাঙ্গালীগণ নিজের স্বার্থসংরক্ষণকল্পে এই পত্রিকাখানির প্রবর্ত্তন করেন। প্রসিদ্ধ "পাঞ্জাবী" পত্র-সম্পাদক যশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং প্রাগুক্ত বাবু বশংবদ মিত্র তাঁহার সহকারীর কার্য্য করেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী যৌথ ভাবে এই পত্রিকা-পরিচালনের ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক 'আসাম প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোম্পানি' সংস্থাপন করেন। পত্রিকাখানি বেশ সতেজে চলিয়াছিল। কিন্তু আয় হইতে ব্যয় কুলাইতে না পারায় সিটিজেন্ পত্রিকা ১৯০৬ অব্দে বন্ধ হইয়া যায়। তবে পত্রিকার জন্ম একেবারে নিষ্ফল হয় নাই—আসামে যে সকল বাঙ্গালী স্থায়িভাবে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের রাজানুগ্রহ প্রাপ্তিবিষয়ে অধুনা অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।

২২। আড্ভোকেট অব্ আসাম (Advocate of Assam)—বস্তির প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বরুয়া গৌহাটিতে তদীয় নিজ আবাসবাটিকায় আসিয়া 'ভিক্টোরিয়া প্রেস' সংস্থাপন পূর্ব্বক এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রখানি ১৯০৫ অব্দে প্রচারিত করেন। বেশ দক্ষতা

সহকারে আড্ভোকেট চলিতেছিল। কিন্তু সম্পাদক বরুয়া মহাশয় পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়াতে পত্রিকাখানির সমূহ ক্ষতি ঘটিল। তদবস্থায় মধ্যে মধ্যে বন্ধ থাকিয়া, কিয়ৎ-কাল অনিয়মিতরূপে চলিয়া ১৯১২ অব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

২৩। আসাম ক্রনিক্ল্—(Assam Chronicle) ডিব্রুগড় হইতে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রখানি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বরুয়া কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।* শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ 'ক্রনিক্ল' পত্রের অনুকরণে সম্ভবতঃ ইহার নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্প কয়েক সংখ্যার পরেই ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

২৪। দীপ্তি—যাঁহারা অরুণোদয় প্রচার করিয়াছিলেন, সেই আমেরিকান্ ব্যাপ্টিস্ট্ মিশন সম্প্রদায় কর্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রিকাখানি ১৯০৫ অব্দে ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখান হইতে জুলাই ১৯০৫ হইতে ডিসেম্বর ১৯০৭ পর্য্যন্ত দীপ্তি প্রচারিত হয়। তৎপর ১৯০৮ অব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯১১ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যোরহাট হইতে প্রকাশিত হয়। তারপর কিঞ্চিদধিক চারি বৎসরকাল বন্ধ থাকিয়া সম্প্রতি গৌহাটি হইতে পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষের সেপ্টেম্বর সংখ্যা "২য় বছর ৭ম সংখ্যা" হওয়াতে দেখা যাইতেছে, গৌহাটি হইতে প্রচারিত "দীপ্তি" নূতন পর্য্যায়রূপে পরিগণিত হইতেছে। এইখানিও অরুণোদয়ের ন্যায় 'সচিত্র' মাসিক। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অরুণোদয় আকারে দ্বিগুণ ছিল এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা ছাড়া উহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত—তাই সাধারণ লোকেও আগ্রহ সহকারে তাহা নিত। কিন্তু 'দীপ্তি' খ্রীষ্টনীতি-বিষয়ক কথাতেই পূর্ণ থাকে; তাই সাধারণ্যে ইহার খবরও বড় কেহ রাখে না। সম্প্রতি মিশনারীগণ যত্ব-ণত্ব, হ্রস্বদীর্ঘ প্রভেদ স্বীকার করিয়া অসমীয়া ভাষা লিখিতেছেন—ইহা পরম সুখের বিষয়। 'দীপ্তি' কলিকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা হয়।

২৫। 'উষা'—জোনাকী ও বিজুলির নূতন উদ্যমও যখন তিরোহিত হইল, তখন তেজপুর হইতে ১৯০৭ অব্দে উষার আবির্ভাব হইল। উষার সম্পাদক আসাম বস্তির রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বরুয়া মহাশয়। এই স্থানে ইঁহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি শিক্ষাবিভাগে কাজ করিতেন; সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে লিটারেরি পেন্শন প্রাপ্ত হইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। বরুয়া মহাশয় একাধারে কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধলেখক, বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকপ্রণেতা এবং পত্রিকা-সম্পাদক। গবর্ণমেণ্ট যখন আসামে ব্যবস্থাপক-সভার প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন ইঁহাকে সভ্য মনোনীত করিয়া এবং তৎপশ্চাৎ ইঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিংবদন্তী অনুসারে পুরাণেতিহাস-প্রসিদ্ধ বাণরাজের রাজধানী এই তেজপুরেই ছিল (অসমীয়া 'তেজ'

* ইহা কোন্ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, এ যাবৎ অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারা যায় নাই। তাই ইষ্টার্ণহেরাল্ড, সিটিজন, আডভোকেট্ অব্ আসাম—এই সকল পত্রিকার সমশ্রেণীস্থ বলিয়া, ইহাদের পরেই এই-খানি উল্লেখযোগ্য মনে করিলাম।

অর্থ 'শোণিত'), তাই বরুয়া মহাশয় তাঁহার পত্রিকাখানির নাম বাণরাজের কন্যা 'ঊষা'র নামে রাখিয়াছিলেন। 'ঊষা' আসামের নূতন যুগের পত্রিকাগুলির অগ্রদূতী হইয়া প্রকৃতই প্রভাতসূচিকা 'ঊষা' নাম সার্থক করিয়াছিল। ১৯০১ অব্দে কটন কলেজ সংস্থাপিত হইবার পর হইতে উচ্চশিক্ষার্থে আসামের বালবৃন্দের দূরদেশে যাইবার তেমন আবশ্যকতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল—তাই অসমীয়া-সমাজে এখন প্রচুর পরিমাণে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি দেখা যাইতেছে এবং তাঁহাদের অনেকেই মাতৃভাষার সেবার নিমিত্ত যত্নবান্। এই সকল শিক্ষিত নব্য যুবকেরাই প্রধানতঃ ঊষার লেখক হইয়া দাঁড়াইলেন। 'জোনাকী' এবং "বিজুলী"ও কলিকাতায় অবস্থিত নব্য যুবকগণের দ্বারা পরিচালিত হইত—কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলিগণিত ছিল—এখন অসমীয়া লেখক-সংখ্যা বেশ বাড়িয়াছে। "ঊষার" পরে ক্রমশঃ তিনখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে ইহার প্রভা শেষ কল্পে বড়ই ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরিশেষে ইহা বর্ত্তমান অব্দে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তথাপি যুগপ্রবর্ত্তকরূপে ইহা দীর্ঘকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

২৬। বাঁহী (=বংশী)—কলিকাতা হইতে ১৯০৯ সালে জানুয়ারী মাস হইতে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজ-বরুয়া বি এ কর্ত্তৃক এই অসমীয়া মাসিক পত্রখানি সম্পাদিত হইতেছে। বেজ-বরুয়া মহাশয় কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীতে বিবাহ করিয়া ঐ স্থানেই উপনিবিষ্ট হইয়াছেন—তথাপি তাঁহার মাতৃভাষার সেবার নিমিত্তে প্রবল আগ্রহ বড়ই প্রশংসার্হ। অসমীয়া সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যেও পরিহাসের আলাপে বেশ একটা প্রবণতা দেখা যায়—লেখাপড়ায় নিম্নস্তরের লোকমধ্যে প্রচলিত আলাপ-প্রলাপের ভাষা ব্যবহার হওয়াতে হাস্য-কৌতুকের রচনা এই ভাষায় স্বভাবতঃই খুব স্ফুর্ত্তিলাভ করে। বেজবরুয়া মহাশয় আবার ঠাকুরবাড়ীর সংস্পর্শে আসিয়া ঐরূপ চটুলরস-রচনায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাঁহী তাই অসমীয়া সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ নব্যগণের বড়ই আমোদের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ অসমীয় মাসিকপত্রগুলির মধ্যে আজকাল বাঁহীরই প্রসার সমধিক বলিয়া বোধ হয়। ব্যঙ্গচিত্র (কার্টুন) অসমীয়া পত্রিকায় বাঁহীতেই সর্ব্বপ্রথম দেখা গিয়াছে।

২৭। আলোচনী—'বাঁহী'র কিছুকাল পরেই ডিব্রুগড় হইতে "আলোচনী" ১৯০৯ অব্দের শেষভাগে (১৮৩১ শকের কার্ত্তিক মাসে) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ চাংকাকতি। ডিব্রুগড়েই ইহা মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহাও 'সচিত্র' অসমীয়া মাসিক পত্রিকা। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ইহাতে আসামের শিলালিপিগুলি ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতেছেন।

২৮। আসামবান্ধব—ইহা কামরূপনিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পরিচালিত মাসিক অসমীয়া পত্রিকা। ১৯১০ অব্দ হইতে চলিতেছে। অসমীয়া ভাষার দুইটা ধারা আছে—এক উজানি অর্থাৎ উপর আসাম—শিবসাগর অঞ্চলের ভাষা; অপর ভাটি অর্থাৎ নিম্ন আসাম

—কামরূপ অঞ্চলের ভাষা। আসাম-রাজধানী শিবসাগরে থাকায় অসমীয়া-সমাজের পদ-পদার্থসম্পন্ন প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন—তাঁহাদের ভাষাই এখন আদর্শ দাঁড়াইয়াছে—যেমন বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গের অথবা বর্ত্তমানে কলিকাতার ভাষা। পূর্ব্ববঙ্গীয়গণ যেমন 'বাঙ্গাল' বলিয়া উপহসিত হন, তেমন কামরূপ অঞ্চলের লোকেরাও 'ঢেকেরী' বলিয়া ঠাট্টার পাত্র হইয়া থাকেন। কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা যেমন শুনিতে অধিকতর মিষ্ট, শিবসাগরের ভাষাও তেমনি বড় মোলায়েম। অথচ পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা যেমন অধিকতর সংস্কৃতমূলক—কামরূপের ভাষাও তেমনি—সংস্কৃত শব্দ-বহুল। যাহা হউক, 'বাঁহী' ও 'আলোচনী' উজানি অঞ্চলের অধিবাসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত পত্রিকা বলিয়া কামরূপবাসীরা তাঁহাদের নিজস্ব এই "আসামবান্ধব" প্রচারিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আপাততঃ দলাদলির বিদ্বেষ প্রকটিত হইলেও পরিশেষে একটা আপোষ আপনা আপনিই হইয়া যাইবার কথা—হইতেছেও তাই; আমাদের বিশ্বাস, এখন 'উজান' ও 'ভাটি' উভয় অঞ্চলের লিখিত ভাষা প্রায় একরূপই হইয়া উঠিতেছে।

২৯। সম্মিলন—যখন অসমীয়া সাহিত্যে প্রাগুক্তরূপ আন্দোলন অনুশীলন চলিতেছিল, তখন নৌগাঁপ্রবাসী জনৈক বাঙ্গালী উকীল—শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু—"সম্মিলন" নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ১৯১০ অব্দে প্রচারিত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই ছিল যে, অসমীয়া ও বাঙ্গালীদের মধ্যে মিলন ঘটে। ঐ বৎসর জানুয়ারি মাসে গৌরীপুরে ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। যে কারণেই পত্রিকার নামকরণ হউক না কেন, ইহা স্বল্প দিন মাত্র জীবিত ছিল—অতএব ইহাদ্বারা অভীপ্সিত ফললাভ অতি অল্পই হইতে পারিয়াছে।

৩০। বিজয়া—কলিকাতায়ও এই নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি কলিকাতার 'বিজয়া'র অল্প পূর্ব্বে ১৯১১ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে (১৩১৮ বৈশাখ) গোয়ালপাড়া জেলায় কোনও জমিদারবংশীয় কুমার বিপ্রনারায়ণ বি এ কর্ত্তৃক ধুবড়ী হইতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় যে, ইহা দ্বিতীয় বর্ষেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৩১৯ সালের পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত পারিজাত প্রেসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কুমার বিপ্রনারায়ণ 'বিজয়া' নামে একটি প্রেস্ ধুবড়ীতে সংস্থাপন করেন। কিন্তু ঐ প্রেসে পত্রিকা ছাপান ঘটে নাই।

৩১। বিশ্ববার্ত্তা—ঢাকা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় "বিশ্ববার্ত্তা" প্রকাশিত হয়। আসাম অঞ্চলের লোকসাধারণের উপকারার্থে ইহার একটি অসমীয়া সংস্করণেরও প্রয়োজন উপলব্ধ হওয়ায় আসাম ও অসমীয়ার পরম সুহৃৎ, আসাম উপত্যকার কমিশনার মাননীয় কর্ণেল গর্ডন বাহাদুরের বিশেষ উৎসাহে অসমীয়া "বিশ্ববার্ত্তা" ঐ বৎসরেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীযুত কালীরাম দাস বি এ অসমীয়া সংস্করণের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা হইতেই ইহাও মুদ্রিত ও

প্রকাশিত হইত। ১৯১২ অব্দের এপ্রিল মাসে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসাম পুনশ্চ বিযুক্ত হওয়াতে বিশ্ববার্ত্তার এই অসমীয়া সংস্করণ সরকারী সাহায্যের অভাবে বন্ধ হইয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যেই পত্রিকাখানি অসমীয়া সাধারণের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ফলতঃ এখন অসমীয়া ভাষায় একখানি সুপরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রের অভাব অত্রত্য লোকসাধারণ বড়ই অনুভব করিতেছে।

৩২। আসাম হেরাল্ড (The Assam Herald)—যিনি ইতঃপূর্ব্বে ডিব্রুগড় হইতে আসাম ক্রনিকল্ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্র বরুয়া মহাশয়ই ১৯১২ অব্দে নৌগাঁ হইতে এই ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু উৎসাহ অভাবে অচির-কালমধ্যে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

৩৩। আর্য্যদর্পণ—এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি ১৩১৫ সালে বঙ্গদেশ হইতে প্রচারিত হয়। ইহা ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা—পরমহংস শ্রীযুক্ত নিগমানন্দ স্বামীজীর শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া, ইহা কিয়ৎকালের নিমিত্ত বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর পরমহংসজী শিবসাগর যোড়হাটের অন্তর্গত কোকিলামুখের নিকটে একটি স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম সংস্থাপন করিলে তদীয় শিষ্যগণ ১৩১৯ সালের (১৯১২ খৃষ্টাব্দ) শ্রাবণ মাস হইতে আর্য্যদর্পণ পুনঃ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। পত্রিকাখানি বেশ নিয়মিতরূপে চলিতেছে। যোড়হাটদর্পণ প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়।

৩৪। আসাম-বিলাসিনী—নূতন পর্য্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে ৺দত্তদেব গোস্বামীর আসামবিলাসিনীর নূতন পর্য্যায় বলা যাইতে পারে না। ঐখানি প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান 'আসামবিলাসিনী' সেই উদ্দেশ্য—ধর্ম্মনীতির চর্চ্চা—মুখ্যতঃ বজায় রাখিয়া চলিতেছে না। ইহা একখানি অসমীয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র—সচরাচর এবংবিধ পত্রে যাহা থাকে, তাহাই, অর্থাৎ প্রধানতঃ রাজনীতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এই পত্রিকায় করা হইতেছে। কেবল স্বর্গীয় গোস্বামীর সেই শ্লোকদ্বয়-সমন্বিত 'সিল্'টি শিরোনামে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯১৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে যোড়হাট হইতে ইহা প্রচারিত হইতেছে। সেই 'ধর্ম্মপ্রকাশ' প্রেসেই মুদ্রিত হইতেছে, কিন্তু প্রেসও আউনি-আটি সত্র হইতে স্থানান্তরিত হইয়া যোড়হাটে আসিয়াছে।

৩৫। অকণ (= খোকা)—অসমীয়া ভাষাতে এ যাবৎ একখানি শিশুপাঠ্য পত্রিকার অভাব ছিল। বর্ত্তমান (১৯১৬) বর্ষের প্রারম্ভ হইতে আসামের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই 'অকণ'খানি চলিতেছে। এই সচিত্র পত্রিকার মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়। কলিকাতা 'শিশু' প্রেসে ইহা মুদ্রিত হয়—দেখিতেও 'শিশু'র ন্যায়ই দেখায়। তদনুকরণেই বোধ হয়, ইহার নামকরণও হইয়াছে। যদিও ইতি-মধ্যেই এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না—তথাপি আমরা এই নবজাতকের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া আমাদের সামান্য বিবরণীর উপসংহার করিতেছি।

পরিশিষ্ট

পার্ব্বত্য জেলাসমূহের পত্র-পত্রিকা

[আসাম প্রদেশের তিনটা প্রাকৃতিক বিভাগ আছে,—(১) প্রকৃত আসাম—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, (২) পার্ব্বত্য জেলাসমূহ, (৩) সুর্ম্মা উপত্যকা—শ্রীহট্ট ও কাছাড়, যাহা প্রকৃত পক্ষে বঙ্গপ্রদেশের একাংশ এবং এখনও সামাজিক বিষয়ে বঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট। প্রথম বিভাগের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পত্র-পত্রিকার বিবরণী মূল প্রবন্ধে দেওয়া হইল। তৃতীয় বিভাগের অর্থাৎ শ্রীহট্ট-কাছাড়ের পত্র-পত্রিকার বিবরণ অপর লেখক কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে, অতএব এ স্থলে তদ্বিষয়ে প্রয়াস অনাবশ্যক। কিন্তু দ্বিতীয় বিভাগের অর্থাৎ পার্ব্বত্য জেলাগুলির সম্বন্ধে এ স্থলে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজনীয় মনে করি—নচেৎ স্বতন্ত্র আলোচনা হইবার সম্ভাবনা খুব কম।]

গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয় পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং লুশাই পাহাড়—এইগুলি 'পার্ব্বত্য জেলা।" তন্মধ্যে গারো পাহাড় আসাম উপত্যকার কমিশনারের অধীন, অপরগুলি সুর্ম্মা উপত্যকার কমিশনারের এলাকাভুক্ত; করদ-রাজ্য মণিপুরকেও পার্ব্বত্য প্রদেশের একতম বলিয়া গণনা করিতে পারি। কাছাড় জেলার উত্তরাংশ "উত্তর-কাছাড়" সব্‌ডিভিশনও পার্ব্বত্যশ্রেণীর মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়

শিক্ষা ও সভ্যতায় পার্ব্বত্য জেলাগুলির মধ্যে এই জেলাই সর্ব্বপ্রথম। নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পত্রিকাখানি ইহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাহিত্যসেবক—এই বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাস হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। কলিকাতায় ইহা মুদ্রিত হইত। এই পত্রিকা শিলং সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান লেখক তখন শিলং প্রবাসী—তাঁহার সহিত পত্রিকার একটু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ছিল। উদ্যোক্তৃবর্গের মধ্যে চুঁচুড়ানিবাসী, তদানীং শিলংপ্রবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ মহাশয়ের নাম স্মরণীয়—তিনি ইহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। স্থানীয় লেখক ব্যতীত বাঙ্গালার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিও ইহাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রথম দেড় বৎসর কাল বেশ সগৌরবে চলিয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৭ অব্দের প্রবল ভূকম্পে শিলং সহর বিধ্বস্তপ্রায় হয়—তদবধি পত্রিকাখানি ক্রমশঃ হীনাবস্থা হইতে থাকে—কয়েক জন উৎসাহী ব্যক্তির স্থানান্তরে প্রস্থানেও ইহার ক্ষতি ঘটে। অবশেষে ১৮৯৮ অব্দের এপ্রিল মাসে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। আসাম প্রদেশে এই ভাবে বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশের ইহাই প্রথম উদ্যম।

খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে নিম্নলিখিত মাসিক পত্রিকাগুলি খাসিয়া ভাষায়, ইংরেজী অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে;—*

* এই সকল পত্রিকার তালিকা শিলংপ্রবাসী সুহৃদ্বর রায় শ্রীযুক্ত দয়াচরণ দাস বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি (শ্রীহট্টবাসী) বাঙ্গালী হইলেও খাসিয়া ভাষায় সম্যক্ অভিজ্ঞ।

১। নংকিট খবর (Nong Kit Khobor)—চেরাপুঞ্জি হইতে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমানে ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ে ওয়েলশ্ মিশন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে সম্যক্ সফলতা লাভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত অনেক খাসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীন সম্মানিত পদে নিযুক্ত আছেন। ফলতঃ পার্ব্বত্য জাতীয়দের মধ্যে খাসিয়াগণ ইংরেজী সভ্যতা বিষয়ে যাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছে, অপর কোনও পার্ব্বত্য জাতি তেমন উন্নত হয় নাই। এই পত্রিকা ওয়েল্‌শ্ মিশন কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। খাসিয়া ভাষার অক্ষর ইংরেজী—অন্যান্য পার্ব্বত্য ভাষায়ও ইংরেজী অক্ষরই ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে দুই এক স্থলে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যাইত—এখন কদাচিৎ দেখা যায়।

২। পাতিং ক্রিষ্টিয়ান্ (Pating Kristian = Christian Age) উ জোয়েল্ শুংপা নামক জনৈক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী খাসিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৮৯৬ অব্দ হইতে ১৯০৩ অব্দের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৩। খাসিমিন্তা (Khasi Minta = Khasi of Date)—উ হমু রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ইহা ১৮৯৬ হইতে ১৯১০ অব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

৪। নং ইয়ালাম্ কাথলিক (Nong ialum Katholic = Catholic Leader) ফাদার এরিস্ নামক জনৈক পাদরি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০২ অব্দে প্রচারিত হইয়াছিল, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৫। নং ইয়ালাম্ খ্রীষ্টিয়ান্—(Nong ialum Kristian = Christian Leader)—রেভারেণ্ড্ জে সি ইভান্স্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা ১৯০২ অব্দের জুন মাস হইতে আরম্ভ হইয়া এখনও প্রকাশিত হইতেছে।

৬। উ নং ফিরা (U Nong phira = Watchman) শ্রীযুক্ত শিবচরণ রায় নামক জনৈক খাসিয়া ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০৩ অব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯১৫ অব্দের মে মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে বলা আবশ্যক যে, অপর পত্রিকা-গুলি সমস্তই খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক—কেবল ইহাতেই নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। শিবচরণ বাবু খ্রীষ্টান নহেন; তাঁহার পিতা শিলংএর একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট্ কমিশনার ছিলেন—কিন্তু ইনি গবর্ণমেণ্টের কাজে না গিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিবিধানে সতত সমুৎসুক বটেন।

৭। জয়ন্তীয়া—রেভারেণ্ড্ সিয়াং ব্লা নামক খ্রীষ্টান খাসিয়া ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৪ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে চলিতেছে।

৮। কা জিং শাই গস্পেল (Ka Jing Shai Gospel = Light of Gospel)—উজয়মোহন রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৫ সালের জুন মাস হইতে প্রচারিত হইতেছে।

৯। লুর্ শাই (Lur Shai = Morning Star)—রেভারেণ্ড্ রীড্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাস হইতে চলিতেছে।

১০। রেইন্ বো (Rainbow অর্থাৎ রামধনু)—১৯১৫ সালের জুন মাসে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

১১। কা সেং প্রেস্ বিটারিয়ান্ (Ka Seng Presbyterian = Presbyterian Union)—১৯১৬ অব্দের মার্চ্চ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

সরকারী গেজেট্ প্রভৃতিকে পত্রিকা-পর্য্যায়ে লওয়া বোধ হয় অসঙ্গত। তাই এ স্থলে এগুলির উল্লেখ করা হইল না। কোনও ইংরেজী পত্রিকা এ জেলা হইতে প্রচার হইয়াছে বলিয়া অবগত হই নাই।

গারো পাহাড়

গারো পাহাড় হইতে দুইখানি পত্রিকার খবর পাওয়া গিয়াছে।*

১। আচিক্-নি রিপেং (Achik-ni ropeng = Garo's Friend)—গারোরা নিজেদের 'আচিক' বলিয়া থাকে। গারো পাহাড়ে সুসমাচার প্রচারের ভার আমেরিকান ব্যাপ্টিস্‌ট মিশন গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের দ্বারাই ১৮৭৯ অব্দে এই কাগজ প্রথম বৎসর হাতে লিখিয়া লিথো করিয়া বিলি হইত, পশ্চাৎ একটি প্রেস্ তুরায় আনিয়া তাহাতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। ত্রয়োদশ বর্ষাধিক কাল পরে তুরাতে মুদ্রণের অসুবিধা হেতুক কলিকাতায় ব্যাপ্টিস্‌ট মিশন প্রেস্ হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহা গারো ভাষার কাগজ হইলেও প্রথমে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইত। ১৯০৬ অব্দ হইতে ইংরেজী অক্ষরে ছাপা হইতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য। ডাঃ এম্ সি মেসন এবং ডাঃ ই, জি ফিলিপ্‌স্, প্রথমাবধি ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যে বৃত আছেন—মধ্যে তাঁহাদের অনুপস্থিতি সময়ে রেভাঃ উইলিয়ম্ ডিং, মিঃ ডব্লিউ সি মেসন্, মিস্ এফ্ সি বণ্ড্ প্রভৃতি ইহার সম্পাদকতা করিয়াছেন।

২। ফ্রিং ফ্রাং (Phring phrang = Morning Star)। ইহা ১৯১২ অব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৪ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহাও ইংরেজী অক্ষরে গারো ভাষায় লিখিত হইত এবং কলিকাতায় ব্যাপ্টিস্‌ট মিশন প্রেসে ছাপা হইত। ইহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচারই ছিল। প্রথমতঃ মিঃ এ মেকডনেল্ড এডিটার ছিলেন, পশ্চাৎ মিঃ মধুনাথজি মোমিন্ নামক জনৈক শিক্ষিত গারো ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যে বৃত হন। গারো ভাষার শব্দ-গুলি বিশুদ্ধতর ভাবে ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার জন্য ইহাতে প্রয়াস করা হইত এবং যাহাতে গারোগণ সুশিক্ষা লাভ পূর্ব্বক স্বদেশের উন্নতিবিধানে যত্নপরায়ণ হয়, ইহাও এই কাগজখানির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যথোচিত অর্থ-সাহায্য না পাওয়ায় ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

* তুরা ডেপুটি কমিশনার আফিসের শ্রীযুক্ত বিধুচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহা সংগৃহীত করিয়া দিয়াছেন।

"আসামের পত্র-পত্রিকা" প্রবন্ধ সম্বন্ধে দু একটি কথা

৭৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখক বাঙ্গালা অরুণোদয় নামক পত্রিকার উল্লেখ করিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। পরিষৎ পঞ্জিকার ঘটনাপঞ্জী কিরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাতে অরুণোদয়ের যে ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ তারিখ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সমর্থনে কোথাও কিছু পাই নাই। ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত আমরা তিনখানি (পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যায় উল্লিখিত দুইখানি নহে) অরুণোদয়ের সংবাদ পাইয়াছি। (১) ১৮৩৯ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত, জমীদার জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে পরিচালিত (Long, *Return Relating to Publications in the Bengali Language till 1857.* Cal. 1859. p. xxxix; Long, *Return Relating to 515 Persons Connected with Bengali Literature,* Cal. 1855)। জন্মভূমি পত্রিকায় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "বঙ্গীয় সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন যে ইহা ছয় মাস কাল মাত্র চলিয়াছিল। কলিকাতায় ইহার গ্রাহক-সংখ্যা ছিল ৫০০; বাহিরে ৭০। বার্ষিকমূল্য ১২৲। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু ইহার পরিচালক ও সম্পাদকের নাম দিয়াছেন রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। (২) ১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (Long, *Return etc.* 1859, p. xl)। লং তাঁহার *Return etc.* 1855 পুস্তিকায় ইহার সম্পূর্ণ নাম সংবাদ-অরুণোদয় এবং তারিখ ১৮৪৯ দিয়াছেন। লংএর মতে ইহা এক বৎসর চলিয়াছিল। ইহা সাপ্তাহিক ছিল। মহেন্দ্রবাবু লং সাহেবের চেয়ে বেশী কিছু বিবরণ দেন নাই। (৩) আগষ্ট ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকা। ইহা ক্রিশ্চিয়ান ট্রাক্ট সোসাইটির মুখপত্র ছিল। লালবিহারী দে ইহারই প্রথম সম্পাদক ছিলেন। (Long, *Return etc.* 1859. p. xliv; Murdoch, *Catalogue of Christian Vernacular Literature of India,* Madras 1870. p. 24)। ইহার উল্লেখ Blumhardt এর *Catalogue of Bengali Printed Books in the British Museum* এ (p. 79) পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থাগারে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯ সংখ্যা (vol 1. no 19) ও তৃতীয় খণ্ডের ১৭, ২৩, ২৪, সংখ্যা (vol III. nos. 17, 23, 24) রক্ষিত আছে। উক্ত খণ্ডসমূহের তারিখ ১৮৫৮—৫৯; শ্রীরামপুরে প্রকাশিত। ইহার বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র (Murdoch, *Catalogue*)। এই পত্রিকা হইতে অসমীয় অরুণোদয়ের নামকরণ হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, ইহার প্রকাশাব্দ ১৮৫৬। আর একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অরুণোদয় মাসিক পত্রিকার সংবাদ উক্ত ব্রিটীশ মিউজিয়মের তালিকায় পাওয়া যায়। (*Suppl. List.* p 192)। উহার আলোচ্য বিষয় জ্যোতিষ ও অলৌকিক রহস্য ("astrology and occult sciences")। সম্পাদকের নাম রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং যে খণ্ড ব্রিটীশ মিউজিয়মে আছে, তাহার তারিখ, কলিকাতা ১৮৯০।

প্রবন্ধের ৭৪ পৃঃ উল্লিখিত বঙ্গদর্শক সংবাদপত্রটি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ইত্যাদি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরের সহিত নামের সাদৃশ্য রহিয়াছে; কিন্তু উক্ত পত্রের প্রকাশাব্দ ১৮৪২ এবং ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দের অধিক পরমায়ু বলিয়া বোধ হয় না।

৭৫ পৃষ্ঠায় লেখক "যুগ্যতদিপিতা ভাস্কর" নামক পঞ্চভাষান্বিত সংবাদপত্রের কথা ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দের আসামদেশীয় অরুণোদয় হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ইহার ঠিক নাম কি? এই সংবাদপত্রের নাম, যাহা লেখক অনুমান করিয়াছেন, (যুগপৎ দীপম্বিতা) তাহা নহে; ইহা "জগদুদ্দীপক (সংবাদপ্রভাকর, ১ বৈশাখ, ১২৫৯; জন্মভূমি ১৩০৪-৫) বা জগদ্দীপক (Long, *Return etc.* 1855. p. 146) বা জগদ্দীপ (Long, *Return etc.* 1859 p. xxxix) ভাস্কর" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত নামটাই শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। যেরূপ আড়ম্বরের সহিত কাগজ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। কারণ, এই পত্রিকার আয়ুষ্কাল আদৌ দীর্ঘ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সম্পাদকের নাম লং দিয়াছেন—মৌলবি বাজের আলি (Bugerali, *Return etc.* 1859, p. xxxix; Buzurally, *Return etc.* 1855 p. 146)। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি জন্মভূমির উপরোক্ত প্রবন্ধে বলেন যে, ইহার প্রকৃত নাম মৌলবি বার আলি। চারি ভাষায় লিখিত হইত—পারসী, হিন্দি, বাঙ্গালা, ও ইংরাজী। প্রকাশাব্দ ১৮৪৬। মাসিক মূল্য ।০ চার আনা মাত্র। ইহার পুরাতন ফাইল এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং আর কিছু বেশী খবর পাওয়া যায় না।

৭৫ পৃষ্ঠায় ১৮৪৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে তালিকা আসামীয় অরুণোদয় হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ১৮৫৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পত্র ও পত্রিকার বিবরণ দিতে হইলে বর্ত্তমান মন্তব্য অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে; প্রবন্ধান্তরে এ বিষয় চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল। তথাপি উক্ত তালিকা হইতে কয়েকটি তথ্য জানিতে পারা যায়, তাহা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তজ্জন্য প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ। তালিকায় উক্ত কয়েকটি পত্রিকার সম্পূর্ণ নাম দেওয়া হয় নাই—যথা, সংবাদ-প্রভাকর, সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ-ভাস্কর, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-রসরাজ, সংবাদ-সাধুরঞ্জন। সজ্জনরঞ্জন নামে যে সংবাদপত্রের উল্লেখ আছে, তাহা সজ্জনরঞ্জন নহে, সুজন-রঞ্জন। ইহার প্রকাশাব্দ ১৮৪৯ ও সম্পাদকের নাম গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। রসরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রথম সৃষ্টি। সুধাংশু—কৃষ্ণমোহন বসু-সম্পাদিত খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা (১৮৫০); কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংবাদ-সুধাংশু নহে। কারণ, তাহার প্রকাশাব্দ ১৮৫২।

শ্রীসুশীলকুমার দে

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা*

পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্ব্বিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আমার শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্যের উত্তর দিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও সংক্ষেপে এখানে দুই একটি কথা বলিতেছি। আমি যে সব কথা বলিব, তাহা অনেক কালের পুরাণ কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র; নূতন কিছু বলিতে পারিব, এমন ভরসা রাখি না। তথাপি ভরসা এই যে, বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হয় নাই।

আমি শব্দকোষের এক একটি শব্দ ধরিয়া, তাহার ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত হইতে না করিয়া, প্রাকৃত হইতে করিলে সহজ হয়, ইহা দেখাইয়াছি এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, এইরূপে প্রাকৃত হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। রায় মহাশয় এই মত স্বীকার করেন নাই। কেন করেন নাই, যুক্তি কি, এ সম্বন্ধে তিনি সেই পুরাণ কথা টানিয়া আনিয়াছেন; বাঙ্গালা কাহার সন্তান—সংস্কৃতের, না প্রাকৃতের—এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তিনি বলেন,—"প্রাকৃত ভাষাই বঙ্গভাষার জননী, ইহা ত রূপকে বর্ণনা। রূপক ভেদ করিলে কি বুঝি? দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সম্বন্ধ কি? তৃতীয়তঃ, কোষে বাঙ্গালা শব্দের সংস্কৃত, না প্রাকৃত মূল প্রদর্শন কর্ত্তব্য?"—৬৩ পৃঃ।

বাঙ্গালা প্রাকৃতজ, ইহাকে তিনি রূপক বর্ণনা বলিলেন; অথচ ইহার পরেই তিনি বলিতেছেন,—"পণ্ডিতেরা ধরিয়া লইয়াছেন, সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুইটা ভাষা। কেহ বলেন সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, কেহ বলেন প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত উৎপন্ন। দুই পক্ষেরই জয় হইয়াছে, পরাজয়ও হইয়াছে। তবে, বোধ হয় প্রাকৃত-পক্ষের শেষ জয় হইয়াছে, স্থির হইয়াছে প্রাকৃত ভাষা হইতে সংস্কৃতের উৎপত্তি।" ইত্যাদি, ৬২ পৃঃ, ২ প্যারা।

তিনি দুই জায়গায় দুই রকম মত প্রকাশ করিলেন,—আমরা কোন্‌টাকে তাঁহার খাঁটি মত বলিয়া গ্রহণ করিব? প্রথমে "বাঙ্গালা প্রাকৃতজ", এই মতকে তিনি রূপক বর্ণনা বলিলেন; আবার কিছু পরেই বলিলেন—সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, প্রাকৃত জনসাধারণের ভাষা, নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, সংস্কৃত লেখ্য ভাষা ইত্যাদি। দ্বিতীয় মতই যদি তাঁহার খাঁটি মত হয়, তবে আমাদের আর কিছুই কহিবার নাই; আমাদের মতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা এইখানেই নীরব হইতে পারি। কিন্তু আর এক জায়গায় তিনি বলেন,—"কিন্তু সেখানে যে কথা, কোষে সে কথা নহে।"—৬৩ পৃঃ। অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত ভাষা লইয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব করেন, প্রাকৃত সংস্কৃতকে পরাভূত করিয়াছিল, ইহাও স্বীকার করেন, কিন্তু বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, ইহা তিনি কোষে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কেন না, প্রাকৃত যে "ইতর লোকের ভাষা"।—৬৩ পৃঃ। কিন্তু জিজ্ঞাসা হয়, শকুন্তলা, সীতা প্রভৃতি

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কি 'ইতর' লোক ছিলেন ? আর যাঁহারা সে কালের বড় বড় ঋষি-মহর্ষি, রাজা-মহারাজা — তাঁহারা কি প্রাকৃতে মোটেই কথা কহিতেন না ? * তবে "শিষ্ট প্রাকৃত" নাম আইল কোথা হইতে ? "আর্য প্রাকৃত" নামের সার্থকতা কোথায় ? মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভবে সরস্বতীকে দিয়া প্রাকৃত ভাষায় পার্ব্বতীর স্তব করাইয়াছেন। ইহাতে কি তাঁহার পার্ব্বতী ও সরস্বতীকে ইতর-শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে ? শাতবাহন প্রাকৃত ভাষায় "সপ্তশতী" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। হর্ষচরিতের রচয়িতা বাণভট্ট বলেন,—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোচ্ছাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, দশরূপকের ধনিকৃত টীকা এবং কাব্যপ্রকাশে "সপ্তশতী" হইতে অনেক শ্লোক তোলা হইয়াছে। রায় মহাশয় কি ইহাকে ইতরের ভাষা বলিবেন ? আজকালকার বাঙ্গালায় নানান্ রূপ প্রচলিত। টোলের পণ্ডিতের এক বাঙ্গালা, ইংরাজী-শিক্ষিতের এক বাঙ্গালা, সহরে ভদ্র লোকের এক বাঙ্গালা, গ্রাম্য ভদ্রলোকের এক বাঙ্গালা, গ্রাম্য চাষার এক বাঙ্গালা,—কিন্তু বাঙ্গালা সবই। ইহার মধ্যে কেবল চাষার বাঙ্গালার রূপ দেখিয়া যেমন সমস্ত বাঙ্গালাকে "ইতর" বলা উচিত নয়, সেইরূপ প্রাকৃতের কোন একটা রূপ দেখিয়া প্রাকৃত মাত্রকেই ইতর বলা ঠিক নহে। আর হইলই বা ইতর, ইতর হইতেই যদি বাঙ্গালা আসিয়া থাকে, তবে তাহা স্বীকার করিব না কেন ? ব্যাকরণে এক, কোষে আর—দুই জায়গায় দুই মত, ইহার অর্থ ত আমরা বুঝি না।

রায় মহাশয় তাঁহার শব্দকোষে বিদেশী শব্দ বাদে পনের আনা তিন পাই শব্দের মূল সংস্কৃত হইতে দেখাইয়াছেন। প্রাকৃতকে তিনি একেবারে আমলই দেন নাই। ইহাতে তাঁহাকে যে কত দূর কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তাহা যাঁহারা শব্দকোষ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞাত নাই। তিনি "আবরণ" শব্দ হইতে "উড়নী", "ওয়াড়" ও "ওহাড়ন", "নীবার" হইতে "উড়িধান" এমন কি, "সহস্র" হইতে "হাজার" [ফা° হজার দেখাইয়াছেন] কল্পনা করিয়াছেন, তথাপি প্রাকৃতকে স্বীকার করেন নাই। অথচ তিনি বলেন,—"যে ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সমন্বয় ঘটে, তাহার উত্তরোত্তর পরিণতিতে বঙ্গভাষা।"—৬৪ পৃঃ, ২য় প্যারা। যদি স্বীকারই করা যায়, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সমন্বয়ে বঙ্গভাষা হইয়াছে, তবে তাহাতে দুইই থাকিবে—সংস্কৃতও থাকিবে, প্রাকৃতও থাকিবে ; প্রাকৃতের মূল প্রাকৃত, সংস্কৃতের মূল সংস্কৃত দেখাইতে হইবে। কিন্তু তিনি কোষে তাহা দেখান নাই।

সংস্কৃত ভাষা অবশ্য একটা আদিম মূল-ভাষা নয়, তাহা ইহার 'সংস্কৃত' নাম হইতেই বুঝা যায়। সংস্কৃতের জন্মের পূর্ব্বে—পাণিনি প্রভৃতির আবির্ভাবের আগে অবশ্য আর্য্যগণের

* ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ প্রাকৃত ভাষাতেই (মনুষ্যভাষাতেই) কথা কহিতেন এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ভাষাও (দেবভাষায়) ব্যবহার করিতেন। তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত উপনিষদ্‌বাক্য হইতে পাওয়া যায় ;—
"তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণ্যা উভয়ীং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণাং।"

একটা ভাষা ছিল, যাহাকে সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষার জন্ম হয়। সংস্কৃত হইল, কিন্তু সংস্কৃতের আগে যে ভাষা ছিল, সেটা কি মরিয়া গেল ? পণ্ডিতেরা বলেন—না। সংস্কৃত জন্মিয়া তাহা সাহিত্যের ভাষা হইল। আগেকার ভাষা যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল এবং চলিতে চলিতে বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। এখনও তাহার চলার শেষ হয় নাই; কোথায় শেষ হইবে, কে জানে ? বাঙ্গালার যদি মূল ধরিতে হয়, তবে সংস্কৃতকে ধরিব কেন ? সংস্কৃতের আগেকার সেই ভাষাকে ধরা উচিত নয় কি ?

ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যে তাহার স্থান, ইহার মধ্যে সুবহু কাল চলিয়া যায়। আদিম মানবের সাহিত্যের প্রয়োজন হয় নাই; কথ্য ভাষা লইয়াই সে সন্তুষ্ট ছিল। তাহার ভাষা মুখে মুখেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন ধরিবার উপায় নাই। পরে মানুষ শিক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার প্রথম সাহিত্য হয়, তখন সাহিত্যে ও কহিবার ভাষায় বিশেষ তফাত থাকে না; সাহিত্যেও যা, মুখেও তা। ভাষা সাহিত্যে আবদ্ধ হইলেই তাহা থামিয়া যায়, অন্য দিকে মুখের ভাষা দিন দিনই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের একটা সীমা আছে; সে সীমার মধ্যে যত দিন মুখের ভাষা থাকে, তত দিন উভয় ভাষা এক এবং সীমা ছাড়াইলেই দুই হইয়া পড়ে। ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম সাহিত্য বেদ।* বেদের ভাষাকে রাখিয়া তাঁহাদের কথ্য ভাষা চলিয়াছে, চলিতে চলিতে অনার্য্য-ভাষার সহিত মিশিয়াছে, মিশিয়া যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের কথ্য ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিল, তখন লোকব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য একটি ভারত-জোড়া সাহিত্যের ভাষার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনেই সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব। তাহাই যদি হয়, তবে বাঙ্গালার মূল সংস্কৃত—ইহা বলি কি করিয়া ? সাহিত্যের ভাষা হইতে কোন কথ্য ভাষা উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার প্রমাণ ত কোন দেশের ভাষায় পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়কার সাহিত্যের বাঙ্গালা হইতে আজকালকার কথ্য বাঙ্গালা জন্মিয়াছে, কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি বোধ হয়, এ কথা স্বীকার করিবেন না। সংস্কৃত যে সাহিত্যের ভাষা, ইহা কেবল আজ আমরাই বলিতেছি না, অনেক প্রাচীন পণ্ডিতও ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।†

---

* আজকাল আমরা বেদের ভাষাকে যে আকারে পাইতেছি, ইহার রচনা-সময়ে যে ঠিক ইহা এই রকমই ছিল, তাহা বলা যায় না। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক ইহার কয়েক বার সংস্কার হইয়াছে। এই সকল সংস্কারে ইহার ভাষা অনেকটা সংস্কৃতমুখী হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, বেদের ভাষাকে "বৈদিক সংস্কৃত" বলা হইয়া থাকে। নতুবা বৈদিক ভাষার "সংস্কৃত" নাম হইবার অপর কোন কারণ দেখা যায় না। তথাপি প্রাকৃতের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়।

† সংস্কৃতং কৃত্রিমে লক্ষণোপেতে।—অমরকোষ। পাণিন্যাদিকৃত-ব্যাকরণ-সূত্রেণ উপেত উপগতো লক্ষণোপেতঃ সাধুশব্দঃ।—ঐ টীকায় ভরত। কৌমার-পাণিনেয়াদি-সংস্কৃতা সংস্কৃতা মতা।—ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা। মহাকবি কালিদাসও ইহাকে "সংস্কার-পূত" বলিয়াছেন। অন্যান্য অনেক সংস্কৃত কোষে "সংস্কৃত" শব্দের উপযোক্ত অর্থই ধৃত হইয়াছে।

বস্তুতঃ বাঙ্গালা যে প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে, আজকাল ইহা একরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কি বিদেশীয়, কি দেশীয়, সকল পণ্ডিতই এ বিষয়ে এক মত পোষণ করেন। মক্ষমূলর, বীম্‌স্‌, হোর্ণলি, গ্রীয়ার্সন প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু রায় মহাশয় বলেন,—"বাঙ্গালা সংস্কৃতমূলক ভাষা। কেহ প্রাকৃতমূলক বলিয়াছেন কি না, জানি না। বোধ হয় বলেন নাই।"—৬৮ পৃঃ। অথচ ইহার পূর্ব্বেই তিনি লিখিয়াছেন,—"ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ হয় ত অধীর হইয়া বলিবেন, আবার এ প্রশ্ন কেন? প্রাকৃত ভাষা যে বঙ্গভাষার জননী, তাহা বহু দিন সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।"—৬৭ পৃঃ।

"প্রাকৃত ভাষা বঙ্গভাষার জননী"—এই বিষয়টা তিনি 'মানুষের জননী'র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। মানুষের জননী এক দিনে, এক সময়ে মানুষ প্রসব করেন, কিন্তু ভাষা-জননী এক দিন, এক মাস বা দু দশ বছরে কোন ভাষা প্রসব করেন না। এমন কি, ভাষার প্রথম সৃষ্টিও কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় নাই। জননী সন্তান প্রসব করেন, প্রসূত সন্তান দিন দিন বাড়িতে থাকে, কিন্তু তাহার এই বৃদ্ধি জননী প্রতি দিন ধরিতে পারেন না; ছ মাস এক বছর পরে বুঝিতে পারেন, তাঁহার সন্তান কিছু বড় হইয়াছে। ভাষা সম্বন্ধেও এই দৃষ্টান্ত খাটিতে পারে। কোন এক ভাষা হইতে হঠাৎ অন্য একটা ভাষা জন্মে না। লোকের মুখে মুখে সুবহু কাল ধরিয়া পরিবর্ত্তনের পর অপর ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যভাষা হইতে এই নিয়মেই প্রথমে পালি, পরে প্রাকৃত, তার পর অপভ্রংশ এবং অপভ্রংশ হইতে বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবিধ দেশীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

রায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন,—"কোন সময় ছিল কি, যখন প্রাকৃত ও বাঙ্গালা দুইই ছিল? যে দেশে প্রাকৃত ভাষা ছিল, সে দেশে বাঙ্গালা ভাষাও ছিল কি?"—৬৭ পৃঃ। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে "বাঙ্গালা ভাষা" নামটা কত দিনের, তাহা অনুসন্ধান করিতে হয়। প্রাচীন হাতে-লেখা পুথির মধ্যে 'বাঙ্গালা ভাষা' নাম পাওয়া যায় না। ৬০।৭০ বছর পূর্ব্বেকার যে সকল ছাপা বই দেখা যায়, তাহার অনেকের উপরে "গৌড়ীয় ভাষায়" লিখিত। দণ্ডী, অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে গৌড়ী ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা নাম খুবই আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। তবে এখন আমরা যাহাকে বাঙ্গালা ভাষা বলি, তাহার নাম কি বরাবরই গৌড়ীয় ভাষা ছিল? না। প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার নামই ছিল "প্রাকৃত" ভাষা। ইহার দৃষ্টান্ত হাতে-লেখা পুথিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। রায় মহাশয় অশিক্ষিত নর-নারীর বাঙ্গালাকে "প্রাকৃত" বলেন বটে (৬২ পৃঃ), কিন্তু আমরা পুথিতে দেখিতেছি, বড় বড় কৃতবিদ্য নামজাদা লোক মার্জ্জিত বাঙ্গালায় বই লিখিয়া তাহাকে "প্রাকৃত" বলিতেছেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত, গোবিন্দলীলামৃত, গীতগোবিন্দ, মহাভারত প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ 'প্রাকৃত' নামে কথিত। অতএব বলা যায়, সুবহু কাল যাবৎ

পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃত বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে; তাহার প্রমাণ—এই সে দিন পর্য্যন্তও ইহার নাম ছিল "প্রাকৃত"। সুতরাং প্রাকৃত ও বাঙ্গালা দুইটা ভাষা নয়, একটা অপরটার পরিণতি মাত্র। কাজেই কোন এক সময়ে কোন দেশে প্রাকৃত ও বাঙ্গালা নামে দুইটা ভাষা ছিল না, একটাই ছিল, বর্ত্তমানটা তাহার পরিণতি মাত্র।

পরিণামের নিয়ম সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"পূর্ব্বরূপের কিছু থাকিবে, কিছু লুপ্ত হইবে, কিছু নূতন আসিবে। কিন্তু যেটা নূতন মনে করি, সেটা পুরাতনে অপ্রকট ছিল।"—(৬৩ পৃঃ) নূতন পুরাতনে অপ্রকট থাকে, ইহা দার্শনিক সত্য বটে, কিন্তু কোন এক নির্দ্দিষ্ট ভাষা সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে না। বট-বীজে বট-বৃক্ষই অপ্রকট থাকে, কিন্তু অশ্বত্থ-বৃক্ষ থাকে না। সেইরূপ বাঙ্গালায় যে সকল বৈদেশিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালার পূর্ব্বরূপে অপ্রকট ছিল না, উহা একেবারেই নূতন আমদানি। বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, এ বিষয়ে যুক্তি দেখাইতে গিয়া তিনি বলেন,—"হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ যাহা সে কালে কেবল পণ্ডিতের মুখে ও কলমে বাহির হইত, পামরের মুখে হইত না, সে সব এ কালের পণ্ডিত ও পামর উভয়েরই মুখে শোনা যাইতেছে।"—(৬৬ পৃঃ।) এই যে "হাজার হাজার বাছা বাছা সংস্কৃত শব্দ," অনুসন্ধান করিলে ইহার আট শতই বোধ হয়, তৎসম বলিয়া ধরা পড়িবে অর্থাৎ ইহার আট শতই প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে সমান ভাবে ব্যবহৃত হইত, ইহা একা সংস্কৃতের সম্পত্তি নহে। তা ছাড়া সংস্কৃত অভিধানে পাইলেই কি তাহা সংস্কৃত বলিয়া ধরিতে হইবে? সংস্কৃতের মধ্যে কি অপর কোন ভাষার শব্দ নাই? অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সংস্কৃতের মধ্যে ম্লেচ্ছ, যাবনিক, প্রাকৃত এবং অনার্য্য-ভাষার অনেক শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। আবার দেখা যায়, কোন সংস্কৃত শব্দ স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের নিয়মে রূপ বদলাইয়া প্রাকৃতে আসিয়াছে, কিছু পরে সেই প্রাকৃত রূপই সংস্কৃত বলিয়া আবার সংস্কৃত সাহিত্য এবং অভিধানে প্রবেশ করিয়াছে।

শব্দকোষের যে সকল শব্দের মূল আমি প্রাকৃত দেখাইয়াছি, সেই প্রাকৃত কবেকার, কোন্ দেশের এবং তাহার মূল কি, এ সম্বন্ধে রায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রশ্নটি গুরুতর এবং এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনাও অধিক হয় নাই। "প্রাকৃত অনিত্য ও অপরিচিত" (৬৭ পৃঃ)—এ কথা আমাদের পক্ষে খাটিলেও, যাঁহারা প্রাকৃতের অনুশীলন ও আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে খাটে না। প্রাচীন পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে যেমন সংস্কৃতের চর্চ্চা করিয়াছেন, প্রাকৃতের চর্চ্চাও তাহা অপেক্ষা অনেকে কম করেন নাই। বিরাট প্রাকৃত-সাহিত্য, তুলনায় সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে কোন অংশে হীন নহে। আজকাল প্রাকৃত আমাদের নিকট অপরিচিত ও উপেক্ষিত, কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন প্রাকৃত না শিখিলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না এবং প্রাকৃত না জানিলে কেহ গুরুপদবাচ্য হইতেন না। বস্তুতঃ সংস্কৃত যেমন "নিত্য ও পরিচিত," আগেকার

অনেক পণ্ডিতের নিকট প্রাকৃতও সেইরূপ নিত্য ও পরিচিত ছিল। তাই তাঁহারা সংস্কৃতেরও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, প্রাকৃতেরও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। সংস্কৃতের যে চিত্র দেখিয়া তাহাকে আমরা নিত্য ও পরিচিত বলি, প্রাকৃতেরও সেইরূপ চিত্র যাঁহারা ভাল করিয়া দেখেন, তাঁহারা প্রাকৃতকে অনিত্য ও অপরিচিত বলেন না। কেবল সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ যেরূপ সম্পূর্ণ হইতে পারে, কথ্য ও সাহিত্য, উভয় ভাষার ব্যাকরণ সেরূপ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন না, এত বড় একটা দেশের এত বড় লীলাময়ী ভাষার পূর্ণ জ্ঞান এক জনের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহার যতটুকু জ্ঞান, তিনি ততটুকু লইয়া ব্যাকরণ করিলেন; তাই প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা ঢাকিবার জন্যই তাঁহারা সংস্কৃতের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছেন। "অহং" অর্থে নানা দেশের প্রাকৃতে নানান্ রকম প্রয়োগ হইত; কোথাও হং, অম্মি, কোথাও হং ম্মি, অহং, কোথাও হকে, হগে, হউ। সংস্কৃতে এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য অস্মদ্ শব্দের একটি রূপ লওয়া হইল 'অহং'—তাহাও প্রাকৃত হইতে। ও দিকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রূপ হইতে আমি, আম্মি, মুই, মেঁা, মৈ, মী, মু, হুঁ, হাঁউ প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইল। কোষকার কি এই সকল পদকে অস্মদ্ শব্দের 'অহং' রূপ হইতে জাত বলিবেন? বাঙ্গালায় নানাবিধ প্রাকৃত শব্দের অস্তিত্ব থাকিলেও ইহা মূলতঃ মাগধ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন। মাগধ অপভ্রংশের মূল—মাগধ প্রাকৃত, তাহার মূল শৌরসেন প্রাকৃত। সুতরাং উপরোক্ত সকল প্রাকৃতের শব্দ ও লক্ষণই বাঙ্গালায় পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া অপভ্রংশ ভাষার আর একটি লক্ষণ এই যে, নিকটবর্ত্তী অনেক প্রাকৃতের শব্দ ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই হিসাবে বাঙ্গালায় অন্যান্য প্রাকৃত শব্দও প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের দেশে বাঁশের অঙ্কুরকে "করাইল" বলে; ইহার মূল বা ইহার সহিত সমজাত শব্দ সে দিন গুর্জ্জরী প্রাকৃতে পাইয়াছি—"করিল্ল"। কোথায় বাঙ্গালা—কোথায় গুজরাট! কিন্তু উপায় কি? অপভ্রংশ ভাষার নিয়মই এই। রায় মহাশয় যে "ওকিঅ" লইয়া এত কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও গুর্জ্জরী দেশী প্রাকৃতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি 'ওক' বা 'উকি'র মূলে বৈয়াকরণ পণ্ডিতের রচিত, সাহিত্যের সংস্কৃতের 'হিক্কা' ও "উদ্গার"ও দেখিয়াছেন।—(৮১ পৃঃ)। বাঙ্গালা, মাগধ অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাতে যে মাগধ প্রাকৃতের শব্দ বা নিয়মই থাকিবে, অন্য প্রাকৃতের থাকিবে না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত বাঙ্গালা শব্দকোষে এইরূপে বাঙ্গালার মূল ধরিতে হইবে, যে শব্দ যত বার রূপ বদলাইয়া আসিয়া বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে, তাহার তত রূপ দেখাইতে হইবে। ইহাতে অদ্ভুত পরিশ্রম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

"কোন্ দেশের কোন্ সময়ের প্রাকৃত",—(৮১ পৃঃ), ইহার কবুল জবাব দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। ভাষার উৎপত্তি ও সাহিত্যে তাহার স্থান লাভ, ইহার মধ্যে অনেক কাল চলিয়া যায়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাচীন আর্য্যভাষা অনার্য্যভাষার সহিত মিশিয়া স্বাভাবিক

পরিবর্ত্তনের নিয়মে প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছে, এই পরিণতির ব্যাপারে হয় ত অনার্য্যভাষা-গুলি কিছু সাহায্য করিয়াছে এবং ইহার অনেক কাল পরে, প্রাকৃত সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। প্রাকৃত যখন সাহিত্যে উঠিয়াছে, তখন হইতেই তাহার সহিত আমাদের পরিচয়; ইহার পূর্ব্বে তাহার পরিচয় আমরা পাই না। অথচ যে সময়ের সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাই, সেই সময়েই সে হইয়াছে, তাহার আগে সে ছিল না, এমন কথাও বলা চলে না। সুতরাং "ইহা এই সময়ের প্রাকৃত", তামা-তুলসী ছুঁইয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধেও এই একই কথা। ধরুন, 'জল' শব্দ সংস্কৃতে আছে, কিন্তু ইহা কোন্ সময়ের সংস্কৃত, কেহ বলিতে পারেন কি? যে দিন সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি, সেই দিনই সমস্ত সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি, ইহার আগে তাহার একটিও ছিল না, এ কথা কোন ভাষাবিৎ স্বীকার করেন কি? সুতরাং "ইহা কোন্ সময়ের প্রাকৃত", এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করা বৃথা। তবে, অমুক সময়ের লেখা পুথিতে পাওয়া যায়—এরূপ বলা চলে। পক্ষান্তরে এ প্রশ্ন সংস্কৃত সম্বন্ধেও উঠিতে পারে।

রায় মহাশয় উপসংহারে বলেন,—"যখনই প্রাকৃত বলি, তখনই মনে হয়, একটা ভাষা আছে, যেটার বিকার বা অপভ্রংশ 'প্রাকৃত' ভাষা।"—(৬৮ পৃঃ।) ইহা কয়েক জন সংস্কৃতজ্ঞ প্রাকৃত বৈয়াকরণিকের মত বটে। ইঁহারা বলেন,—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত আগতং তত্র ভবং বা প্রাকৃতম্।" অথবা "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তদ্বিকৃতিঃ প্রাকৃতম্।" কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনেক দিন আগে এই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রকৃতি সংস্কৃত, ইহা বৈয়াকরণিকদের রচা কথা, কোন যুক্তি বা প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নহে। আর সংস্কৃতের বিকারে প্রাকৃত উৎপন্ন হইয়া থাকিলে তাহার "প্রাকৃত" নাম না হইয়া "সাংস্কৃত", 'বিকৃত" বা "বৈকৃত" এইরূপ একটা কিছু হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং দেখা যায়, উপরোক্ত মত সহজেই খণ্ডন করা যাইতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাকৃত শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"প্রকৃত্যা স্বভাবেন সিদ্ধং প্রাকৃতম্।" এই মতই যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে। যে ভাষা স্বভাবতঃ উৎপন্ন, যাহা সংস্কারাপন্ন নহে, তাহা প্রাকৃত। আদিম মানব-সমাজে যখন শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্ভবই হয় নাই, তখন সংস্কৃত ভাষার স্থান কোথায়?

"অতিথ" শব্দ সম্বন্ধে দেখিতেছি, পশ্চিম-বঙ্গের অর্থ আমার অজ্ঞাত ছিল। আমি পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক; সেখানে 'অতিথ' শব্দের "ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী" অর্থ একেবারে অপরিচিত। সেই ধারণাবশতই আমি ঐ কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি, পশ্চিম-বঙ্গে ইহার মূল অর্থ একে-বারে গিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গে এখনও আছে। এই জন্যই আমি বলিয়াছি,—"বাঙ্গালা শব্দকোষ রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশবিশেষের শব্দকোষ, ইহা সমগ্র বাঙ্গালার শব্দকোষ নহে।" "কালভেদে শব্দের গৌরব, সাধুতা কিংবা শিষ্টতার ইতরবিশেষ হয়",—(৬১পৃঃ) ঠিক কথা। অতএব, আউ প্রভৃতি শব্দেরও এককালে গৌরব ছিল, এককালে উহাও সাধু এবং শিষ্ট

বলিয়া পরিচিত হইত, ইহার প্রমাণের অভাব নাই। ইহার সেই অতীত শিষ্টতা ও সাধুতা লোপ করা কোষকারের উচিত নহে।

কথ্য বাঙ্গালার উচ্চারণ সম্বন্ধে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী অনেক স্থলেই মৃদু উচ্চারণে অভ্যস্ত। তাই মৃদু উচ্চারণই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এক একটি গুরু-গম্ভীর সংস্কৃত শব্দ ধরিয়া দেখুন, প্রাকৃতে তাহার উচ্চারণ কেমন কোমল হইয়াছে, আবার বাঙ্গালায় তাহা হইতেও কোমল হইয়াছে। সং ব্রাহ্মণ, প্রা° বাম্হণ, বা° বামন বা বাঁমুন। কথ্য ভাষায় রেফাক্রান্ত যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ বাঙ্গালার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই হিসাবে কথ্য ভাষায় কর্ম্ম শব্দের পরিবর্ত্তে "কম্ম" ও "কাম" উচ্চারণই স্বাভাবিক। রায় মহাশয় বলেন,—"কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক, তাহা ব্রহ্মা বলিতে পারেন, মানুষে পারে না।"—(৮২পৃঃ) আমার বোধ হয়, প্রত্যেক জাতিরই উচ্চারণের একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, সেই ধারা দেখিয়া কাহার পক্ষে কোন্ উচ্চারণ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর উচ্চারণ কোমল—তাহাই তাহার বিশিষ্ট ধারা।

শব্দকোষ সম্বন্ধে মন্তব্যের উত্তরে রায় মহাশয় যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলিলাম। পরিশেষে বক্তব্য, বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে আসিয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে আজকাল আর আপত্তি চলে না। সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি, মানুষ প্রথমে শিক্ষিত হইয়া জন্মে নাই, ভাষাও প্রথমে সংস্কৃত হইয়া জন্মে নাই। মানুষ অশিক্ষিত হইতে শিক্ষিত হয়, ভাষাও অমার্জ্জিত হইতে মার্জ্জিত হয়। মার্জ্জিতের সাধুতা, শিষ্টতা, গৌরব ও অসাধারণ ক্ষমতা স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাহার মূল যে "অমার্জ্জিত", এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক দিকে মার্জ্জিতের যেমন অসাধারণ গৌরব, অপর দিকে অমার্জ্জিতের তেমন চমৎকার সরলতা, প্রাণ-মন-ভুলান মধুরতা। হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালার নমুনা, "বৌদ্ধ গান ও দোহা" পাইয়াছি, তার পাঁচ শ বছর পরের "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" পাইয়াছি। ইহাতে বাঙ্গালার রূপ দেখিয়া এবং তাহার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া এখনও কি বলা চলে যে, বাঙ্গালা সংস্কৃতজ ?

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ*

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর "টপ্পা" এক কালে এই দেশে যথেষ্ট আদৃত ছিল। নিধুবাবুই যে এই শ্রেণীর গান বাঙ্গালায় প্রথম রচনা করিয়াছিলেন, তাহা না হইতে পারে, তথাপি এ বিষয়ে তাঁহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহার "বাঙ্গালার শোরি মিঞা" এই গৌরবাস্পদ আখ্যা একেবারে নিষ্ফল নহে। আধুনিক রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে নিধুবাবুর গানের আর সেরূপ আদর দেখা যায় না, তথাপি গান হিসাবে ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ হইতে এই গানগুলির মূল্য যথেষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

নিধুবাবুর গানসমূহের বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত তদ্রচিত "গীতরত্ন গ্রন্থ" ১২৪৪ সালে প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হয়। ইহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে আছে[১]। ইহা নিধুবাবুর রচিত সমস্ত টপ্পার সংগ্রহ বলিয়া প্রচারিত। ইহার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে—সেটি গ্রন্থকারের নিজের রচনা বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে উক্ত গ্রন্থ আবার "তদাত্মজ[২] জয়গোপাল[৩] গুপ্ত" কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত[৪] হইয়া ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়; এ পুস্তকখানি তৃতীয় সংস্করণ[৫]। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বোধ হয়, ১২৫৭ সালে প্রকাশিত

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। ইহার পত্রসংখ্যা।৶, + ১৪১। পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে যে পুস্তকখানি আছে, তাহার ১ হইতে ৮ পৃষ্ঠা নাই। ইহার টাইটেল পেজ বা পরিচয়-পত্র এইরূপ—শ্রীশ্রীরামঃ॥ / শরণং / গীতরত্ন / গ্রন্থ / শ্রীরামনিধি গুপ্ত / রচিত / গৌড়িয় সাধুভাষায় নানা প্রকার ছন্দে / রাগ রাগিনী সহিত শঙ্কোলিত হইয়া / সন ১২৪৪ শালে / কলিকাত্তা বিদ্যামোদ প্রেষে / মুদ্রিত হইল। / এই পুস্তক শোভাবাজারের ৺নন্দরাম সেনের / ইষ্ট্রিটে নং ২০ বাটিতে অন্বেষণ করিলে পাইবেন। /

২। *Bengal Academy of Literature* (Vol I. No 6. p. 4)এ জয়গোপাল গুপ্তকে ভ্রমক্রমে নিধু বাবুর অনুজ বলা হইয়াছে।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে জয়গোপালকে ভ্রমক্রমে জয়চন্দ্র বলা হইয়াছে।

৪। এই জীবন-বৃত্তান্ত জয়গোপাল-লিখিত নহে, প্রভাকরে (১ শ্রাবণ, ১২৬১) নিধুবাবুর যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সঙ্কলিত। কেবল উল্লিখিত জীবনীতে "পক্ষীর দল" ও আখড়াই গাওনা সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, তাহা এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৫। ইহার টাইটেল পেজ এইরূপ—শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। / গীতরত্ন গ্রন্থঃ। / ৺রামনিধি গুপ্ত প্রণীত। / কবিতা সমূহ ও তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত / তদাত্মজ শ্রীজয়গোপাল গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত। / তৃতীয় সংস্করণ। / কলিকাতা। / এন, এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত। / নং ৬১ আহীরীটোলা। / ১২৭৫। / মূল্য এক টাকা চারি

হয়, কিন্তু ইহা আমাদের অধিগত হয় নাই। উল্লিখিত তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে জয়গোপাল গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কবিবর ১২৪৪ সালে তাঁহার রচিত গীতগুলি গীতরত্ন নাম দিয়া প্রথম বার মুদ্রিত করেন; বর্ত্তমান সংস্করণে উক্ত প্রথম মুদ্রাঙ্কণ উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া প্রকাশিত করা হইতেছে। এই সংস্করণের সহিত প্রথম সংস্করণের অবিকল মিল আছে, পত্রাঙ্কও প্রায় একরূপ; কেবল ইহাতে নিধুবাবুর কিঞ্চিৎ জীবনী, সাতটি আখড়াই সঙ্গীত, একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, একটি শ্যামাবিষয়ক গীত ও একটি বাণী-বন্দনা বেশী দেওয়া আছে।

এই গীতরত্ন গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ উল্লেখযোগ্য। ইহাও বটতলা হইতে ১২৫৭ সালে প্রকাশিত এবং ইহাও তৃতীয় সংস্করণ। ইহাতে লেখা আছে যে, "এই গীতরত্ন গ্রন্থ যাহা রামনিধি গুপ্ত কর্ত্তৃক অশক্তাবস্থায় ও বিস্তর অশুদ্ধ সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য দ্বারা সুধাসিন্ধু-যন্ত্রে তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল।" ইহাতে বহুসংখ্যক আদিরসাত্মক গান আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি গীতরত্ন ভিন্ন অপর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, এবং নিধুবাবুর গানের সহিত অন্যান্য লোকের রচিত বিস্তর টপ্পাও মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২৫২ সালে কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর তাঁহার "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে" বাঙ্গালা ভাষার গান মুদ্রিত করেন[৬]। তাহাতে নিধুবাবুর রচিত সার্দ্ধশতাধিক গান স্থান পাইয়াছে। ইহার গানগুলি অধিকাংশ গীতরত্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং গীতরত্নের ধারানুসারে গান বিন্যাস করা হইয়াছে; কেবল আখড়াই সঙ্গীতগুলি শেষে না দিয়া গোড়ায় দেওয়া হইয়াছে।

১২৯৩ সালে আশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট হিন্দু-লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" বা "কবিবর নিধুবাবু-রচিত গীতাবলী" পুস্তকও উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রায় ১৬০ গান আছে; কিন্তু গ্রন্থের কাটতি সম্ভাবনায় নিধু-রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ গীত অপরাপর ব্যক্তির রচিত এবং নিধুবাবুর বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে এ গ্রন্থের মূল্য বেশী নহে।

আধুনিক সময়ে বটতলা হইতে বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা সমেত "গীতাবলী" বা "নিধুবাবুর (৺রামনিধি গুপ্তের) যাবতীয় গীতসংগ্রহ" পুস্তকে উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থ হইতে নিধুবাবুর পদ উদ্ধার করিয়া একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এ চেষ্টা যে বিশেষ ফলবতী হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। এ পুস্তক দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া লিখিত আছে; ইহার প্রথম সংস্করণ আমরা দেখি নাই। তারিখ ১৩০৩।

আনা মাত্র। / ইহার পত্রসংখ্যা ২+১।০+১৪৮ (১৪০ পৃঃ পর্য্যন্ত টপ্পা। ১৪১—১৪৮ পৃঃ আখড়াই ও ব্রহ্ম-সংগীতাদি)।

৬। সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের বঙ্গাংশ বা তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪—৩১২ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত সংগ্রহগুলি ছাড়া কতকগুলি বিবিধ বাঙ্গালা সঙ্গীতসংগ্রহে নিধুবাবুর অনেকগুলি গীত চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "সঙ্গীত-সারসংগ্রহ" দ্বিতীয় ভাগ (১৩০৬), বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-কৃত ভূমিকাসম্বলিত "রসভাণ্ডার" (১৩০৬), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সঙ্কলিত "প্রীতি-গীতি" (১৩০৫), দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত "বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়" দ্বিতীয় খণ্ড (ইং ১৯১৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল সংগ্রহে মুদ্রিত অধিকাংশ গীতাবলী নূতন করিয়া সংগৃহীত নহে, উল্লিখিত গীতরত্ন প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

নিধুবাবুর টপ্পার এই সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে গীতরত্ন গ্রন্থখানিকে আদি ও প্রামাণিক ধরা যাইতে পারে। কিন্তু গীতরত্নের মধ্যেই এমন অনেক গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা নিধুবাবুর কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। দুএকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গীতরত্ন গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায়[৭] নিম্নলিখিত গানটি দৃষ্ট হইবে,—

এই কি তোমার প্রাণ ছিল হে মনে।
যাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

কিন্তু তারাচরণ দাস-রচিত "মন্মথ-কাব্য"এর ৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত গান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়,—

এই কি তোমার সই ছিল রে মনে।
জাচিয়া যাতনা দিবে জানিব কেমনে॥ হে
চিত্রা কি চিত্রে চিত্রে দাহিলে কেনে।
যে চিত্র করিলে কোথা পাব সে জনে॥[৮]
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে ভাল সুধাবচনে॥

উদ্ধৃত গানেতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু অন্য অনেক গানে উভয় পুস্তকে অবিকল ঐক্য দেখা যায়। যথা,—গীতরত্ন ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "প্রবলপ্রতাপে বুঝি প্রাণ তুমি কি ভূপতি হলে" মন্মথকাব্যের ৫৯ পৃষ্ঠায় অবিকল পাওয়া যায়। এইরূপ মন্মথকাব্যের প্রায় ২১টি গান গীতরত্নে দেখা যায়।

বটতলা-প্রকাশিত নিধুবাবুর "গীতাবলী"র ভূমিকায় ও "মন্মথ-কাব্যে"র ১২৬৯ সালে

৭। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গীতরত্ন গ্রন্থের যে পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ আছে, তাহা (অন্য সঙ্কেত না থাকিলে) তৃতীয় সংস্করণের পত্রাঙ্ক বুঝিতে হইবে।

৮। এই দুই পংক্তি গ্রন্থ-বর্ণিত মদমুঞ্জরির মনমোহনের চিত্রপট দর্শন প্রসঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

পুনর্মুদ্রাঙ্কণ সময়ে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্যে যে সকল গীতের ঐক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় মন্মথকাব্য-প্রণেতা তারাচরণ দাসের রচনা। কারণ, তারাচরণ দাস রাজা নবকৃষ্ণের সমকালীন ও তদাজ্ঞায় প্রণীত মন্মথ-কাব্য প্রায় এক শত বৎসরের অধিক হইল রচিত হইয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "রামনিধি ১২৪৪ সালে বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে যদি স্বয়ং গীতরত্ন ছাপাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গীতের খাতাতে অপরের রচিত যে সকল উত্তমোত্তম গীত উদ্ধৃত ছিল, তাহা তিনি অশক্তাবস্থাপ্রযুক্ত সংশোধন ও নির্ব্বাচন না করিয়া মুদ্রিত করিয়া থাকিবেন।" এই মতের বিরুদ্ধে দুএকটি আপত্তি আছে। প্রথমে দেখিতে হইবে, গীতরত্ন ও মন্মথকাব্য, ইহার কোনখানি অপরটির পূর্ব্বে রচিত। আমরা পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে যে একখানি মন্মথ-কাব্য পাইয়াছি, তাহার টাইটেল পৃষ্ঠা বা মুদ্রণ-তারিখ নাই। কিন্তু শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ-রচনার সময় সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করা আছে,—

শাকে যুগ্মরসাদ্রিচন্দ্রবিমিতে লেয়ে গতে পুষণি
পক্ষে নন্দসুতস্য নামমিলিতে বারে বিধৌ বাণতিথৌ
বাবু শ্রীনবকৃষ্ণদাসকৃপায়ামারাখ্য কাব্যং শুভং
শ্রীতারাচরণাভিধেয়রচিতং সম্পূর্ণতামাপিতং॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, মন্মথ-কাব্যের রচনা ১৭৬২ শকে অথবা ১২৪৭ সালে বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায় সমাপ্ত হইল। যদি মন্মথকাব্য ১২৪৭ সালে রচিত হয়, তাহা হইলে গীতরত্নের ৩ বৎসর পরে ইহার রচনা-সমাপ্তির কাল। উপরোদ্ধৃত শ্লোকে ও গ্রন্থের সর্ব্বত্র "বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায়" এইরূপ ভণিতা আছে; কুত্রাপি রাজা নবকৃষ্ণ বলা হয় নাই। গ্রন্থকার যেখানে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, সেখানেও বলিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত শ্রীনবকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়। মনমথ কাব্য রচি ভাবি শারদায়॥" (পৃঃ ৭)। নবকৃষ্ণের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বাবু নবকৃষ্ণ ও শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ যে এক ব্যক্তি, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তার পর নবীনবাবু নিধুবাবুর অশক্তাবস্থার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, সংবাদ-প্রভাকরে নিধুবাবুর যে জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহা নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল গীতরত্নের প্রারম্ভে পুনর্মুদ্রিত করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, যদিও মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসরের অধিক হইয়াছিল, তথাপি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনের ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; কেবল মৃত্যুর এক বৎসর পুর্ব্ব হইতে তিনি দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, কিন্তু সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন ও অবশিষ্ট সময় নানাবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকপাঠে কাটাইতেন।[১] নিধুবাবু স্বয়ং গীতরত্নের যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি উক্ত

১। গীতরত্ন, পৃঃ ৸৹; সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৩১।

গ্রন্থ প্রকাশের সময় সবিশেষ সংশোধিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তারাচরণকৃত এক আধটি নহে—একুশটি গান যে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা অনবধানবশতঃ স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবেন, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয় যে, আলোচ্য গানগুলি নিধুবাবুরই রচিত; তারাচরণ স্বীয় কাব্যের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধির জন্য সেগুলি নিজের রচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শুধু মন্মথ-কাব্যে নহে, এইরূপ বনওয়ারীলাল-প্রণীত "যোজনগন্ধা", মুন্সী এরাদোত-প্রণীত "কুরঙ্গভানু" (১২৫২) প্রভৃতি কাব্যে গীতরত্নের অনেকগুলি গান চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সকল কাব্যে দুএকটি এমন গান উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহা নিধুবাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। যথা—মন্মথকাব্যে উদ্ধৃত (পৃঃ ১২০) "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন"[১০] গানটি নিধুবাবু তাঁহার প্রথম স্ত্রীবিয়োগ উপলক্ষ্যে রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধ, এবং জয়গোপাল গুপ্তের সঙ্কলিত জীবনীতেও এই কথা আছে। বোধ হয়, নিধুবাবুর টপ্পা তৎকালে এরূপ বিখ্যাত ও সর্ব্বজনবিদিত ছিল যে, তাহা স্বীয় গ্রন্থে তুলিয়া দিতে কোনও গ্রন্থকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; আধুনিক সময়েও এইরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক বিখ্যাত গান বিবিধ নাটক নভেলে "কোটেশন" চিহ্ন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিধু বাবু তাঁহার জীবদ্দশাতেই গীতরত্ন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। সুতরাং উক্ত পুস্তক যে তাঁহার টপ্পার আদি ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সংগ্রহ, তাহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। ইহার ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"এই পশ্চাতের লিখিত গীত সকল বহু দিবসাবধি সুন্দররূপ ব্যক্ত থাকাতে কোনমৎ প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না। এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণবশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহিগণের অবগতি জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতেও অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধ পদে পরিপূর্ন্নিত করিয়া প্রচার করিল, এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম মৎকৃত সঙ্গীত সকল এক্ষণেও যত্তপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত না হয় তবে হানি আছে এই আসঙ্কাপ্রযুক্ত প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকান্তর্গত গীত সকল আপ্ত বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিরদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম এক্ষণে প্রচার করণের সেই আর এক মানসও রহিল।" অবশ্য গীতরত্নে অনবধান প্রযুক্ত অপরের দুএকটি গান আসিয়া পড়ে নাই অথবা নিধু বাবুর দুএকটি গান যে বাদ পড়ে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পরবর্ত্তী সকল সংগ্রহ অপেক্ষা ইহারই উপর নির্ভর করা যুক্তিসিদ্ধ।

বাস্তবিক প্রাচীন কবিগান বা টপ্পা-লেখকদের রচনা এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বা বিশুদ্ধরূপে সংগৃহীত হয় নাই; এরূপ সংগ্রহের বোধ হয় বিশেষ চেষ্টাও হয় নাই। কোন্‌টি কাহার পদ,

১০। গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯।

তাহা নির্ব্বাচন করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এবং অনেক গান এক বা ততোধিক রচয়িতার নামে এরূপ চলিয়া আসিতেছে যে, এত কাল পরে তাহা প্রকৃত কাহার রচনা, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। উদাহরণস্বরূপে এই গানটি—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে॥
বিধু-মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্য দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

একাদিক্রমে শ্রীধর কথক, রাম বসু ও নিধু বাবুর বলিয়া বিবিধ সংগ্রহে দেখা যায়। ইহা খুব সম্ভব, প্রথমোক্ত ব্যক্তির রচনা। গীতরত্ন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু গীতরত্নে যে নিধু বাবুর সমস্ত গান আছে, তাহাও বোধ হয় বলা যায় না। "নয়নেরে দোষ কেন। মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন। আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন॥" অথবা "তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" প্রভৃতি গান নিধু বাবুর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ এবং "সঙ্গীতসারসংগ্রহ" (পৃঃ ৮৭৫ ও ৮৫১), "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ১১৩ ও ১২৭), "রসভাণ্ডার" (পৃঃ ১০৭) প্রভৃতি সংগ্রহে নিধু বাবুরই বলিয়া দেওয়া আছে; কিন্তু গীতরত্নে একেবারে পরিত্যক্ত হওয়াতে অনেক সময় সন্দেহ হয়, এগুলি প্রকৃতই নিধু বাবুর কি না। এইরূপ "তবে প্রেমে কি সুখ হত। আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত॥" ইত্যাদি সুন্দর গানটি "প্রীতিগীতি" (পৃঃ ৩৭৬) ও "নিধু বাবুর গীতাবলী" (পৃঃ ১৭২) প্রভৃতি পুস্তকে নিধু বাবুর বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু অনেকের মতে ইহাও শ্রীধর কথকের রচিত এবং গীতরত্নেও ইহা পরিত্যক্ত। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। টপ্পা রচনায় নিধু বাবুর এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী অনেক টপ্পা তাঁহার রচনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এমন কি, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের "সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমে" (পরিষৎ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪) "ককারে আকার জয় ছাড়ি লয়ে দীর্ঘ ঈকার বল" শীর্ষক উদ্ভট গানটি নিধু বাবুর গীতের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ইহা পাথুরিয়াঘাটানিবাসী রামলোচন ঘোষের পুত্র "গীতাবলী"-প্রণেতা আনন্দনারায়ণ ঘোষের রচনা এবং উক্ত গানের শেষে তাঁহার নামের এইরূপ ভণিতা আছে,—"আনন্দের নিবেদন মন দিয়া শুন মন" ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ১৪৮) আছে; কিন্তু তৃতীয় সংস্করণের অতিরিক্ত গানের মধ্যে, প্রথম সংস্করণে নয়। আশুতোষ ঘোষাল-সংগৃহীত "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" দ্বিতীয় খণ্ডে নিধু বাবুর যে সকল গান দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীধর কথক, কালী মির্জ্জা, ছাতু বাবু প্রভৃতি অপরাপর লোকের বিস্তর গান মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪৮ পৃষ্ঠায় শ্রীরাগে রচিত "কেন রে ভ্রমরা তুমি যাবে পদ্মবন" গানটি "গায়নহৃদকুমদ"[১১] ২৬ পৃষ্ঠায়

১১। গায়নহৃদকুমদ বিভিন্ন লোকের রচিত কবিতার সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। ইহা বংশীধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং বটতলা হইতে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত।

দৃষ্ট হইবে; সমস্ত গীতরত্নে নিধু বাবুর শ্রীরাগের গান নাই। কিন্তু গায়নস্থদকুমদের (পৃঃ ২৪) "দ্রুত গমনে কি এত প্রয়োজন" গানটি গীতরত্নেও (পৃঃ ২৭) পাওয়া যাইবে। "সঙ্গীত-সারসংগ্রহে" (পৃঃ ৮৭৪), বটতলা-প্রকাশিত "নিধু বাবুর গীতাবলী"তে (পৃঃ ১৭২), এবং অনাথকৃষ্ণ দেবের "বঙ্গের কবিতা"য় (পৃঃ ২৯৪)

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
আমি এই মাত্র চাই   মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থাক এ দেহে সকলি সবে ॥

গানটি নিধু বাবুর বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহা জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক-রচিত[১২] এবং গীতরত্নে বর্জ্জিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ কবিতাটি এইরূপ—

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে দেহে প্রাণ না রহিবে ॥
কারণ প্রলয় জ্ঞান   পলকে নিশ্চিত প্রাণ
অবশ্য অন্তর হলে প্রলয় হইবে তবে ॥
কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই   আমি মাত্র এই চাই
তুমি সুখে থাক মম শব দেহে সব সবে ॥

এমন কি, "বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা"য় (পৃঃ ৪০) "পিরীতি পরম রতন" শীর্ষক যে গানটি নিধু বাবুর বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত পদ্মাবতী নাটকে দেখা যায়! এই সমস্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন কবি বা গীতরচকদিগের পদাবলী বিশুদ্ধরূপ উদ্ধার বা নির্ব্বাচন করা কি প্রকার কষ্টসাধ্য। তথাপি গীতরত্ন গ্রন্থ যখন নিধু বাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এত কাল তাঁহার আদি ও প্রামাণিক গীত-সংগ্রহ[১৩] বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন ইহাকেই তাঁহার রচনা সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ ধরিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না।[১৪]

১২। প্রীতি-গীতি, পৃঃ ৪৬১।

১৩। পরিষৎ-প্রকাশিত সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমের ভূমিকায় (পৃঃ ৪) উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হিন্দী ও বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় রামনিধি গুপ্তকৃত "গীতাবলী"র উল্লেখ আছে; ইহার দ্বারা বোধ হয়, গীতরত্নই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

১৪। গীতরত্নে যে নিধু বাবুর অনেকগুলি গীত পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা তৎপুত্র জয়গোপাল উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন,—"অনেকে কহিয়া থাকেন যে যে সকল কবিতা লোকে নিধু বাবুর বলিয়া শুনাইয়াছে এবং যে সকল কবিতা আমরা জ্ঞাত আছি সে সকল কবিতা এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে যে সকল গীত তাঁহার বলিয়া মহাশয়েরা জানেন এবং যাহা তাঁহার বলিয়া শুনায় সে সকল তাঁহারি গীত বটে কারণ তাঁহার গীত অসঙ্খ্য, সে গীত সকলের আদর্শ রাখা হয় নাই বলিয়া ইহার ভিতর সন্নিবেশ হয় নাই, আর যখন সে সকল গীত রচনা হইয়াছিল, তখনকার লোক পরম্পরায় মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিল, সে সকল গীত এই ক্ষণে সংগ্রহ কিম্বা সংশোধন করিবার উপায় নাই তাহার ভিতর বিস্তর অশুদ্ধ পদ এবং কথা শুনিতে পাওয়া যায় এ নিমিত্তে বিরত রহিতে হইল। ইহাতে মহাশয়েরা ক্ষোভিত হইবেন না।" (গীতরত্ন, পৃঃ ৬/০)

এই ত গেল নিধু বাবুর পুস্তক সম্বন্ধে। তারপর নিধু বাবুর জীবনবৃত্তান্ত। রামনিধি গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা শুধু ঈশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক মাসিক সংবাদ-প্রভাকরে লিখিত জীবনী হইতে। গীতরত্নের তৃতীয় সংস্করণের প্রারম্ভে যে জীবন-বৃত্তান্ত আছে, তাহাও প্রভাকর হইতে সঙ্কলিত। এই সমস্ত স্থল হইতে সারাংশ লইয়া রামনিধির জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

রামনিধি গুপ্ত ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটস্থ চাঁপতা গ্রামে স্বীয় জনকের মাতুল রামজয় কবিরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল কলিকাতা কুমারটুলীতে। এই পৈতৃক বাটী নন্দরাম সেনের গলিতে অবস্থিত; নিধুবাবুর উত্তরাধিকারীরা এখনও সেখানে বাস করিতেছেন। নিধুবাবুর পিতা হরিনারায়ণ ও পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ বর্গীর হাঙ্গামা ও নবাবী দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত চাঁপতা গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১১৫৪ সালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই স্থানেই নিধুবাবুর বিদ্যাশিক্ষা হয়। সংস্কৃত ও পারস্য ভিন্ন তিনি কোনও পাদরী সাহেবের নিকট কিছু ইংরাজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৫৯)। রামনিধি ১১৬৮ সালে সুখচর গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন এবং ১১৭৫ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান লাভ করেন। অনন্তর ৩৪ বৎসর বয়সে[১৫] নিধুবাবু নিজ পল্লীবাসী ছাপরা কালেক্টারের দেওয়ান রামতনু পালিতের আনুকূল্যে উক্ত কালেক্টারীতে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে পালিত মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন জনাই গ্রামবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন এবং নিধুবাবু তাঁহার কেরাণীগিরি কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ছাপরায় অবস্থানকালে নিধুবাবু অবকাশমত সঙ্গীত-বিদ্যায় সুপণ্ডিত জনৈক যবন গায়কের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করেন। যখন ঐ শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিল, তখন তিনি ওস্তাদের শিক্ষাদানে কার্পণ্য বুঝিতে পারিয়া যাবনিক গীতশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, আপনিই হিন্দী গীতের আদর্শে রাগরাগিণী সংযুক্ত করিয়া বঙ্গভাষায় গান রচনা করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার বাঙ্গালায় টপ্পা রচনার সূত্রপাত। প্রায় ১৮ বৎসর[১৬] ছাপরায় কর্ম্ম করিবার পর উৎকোচাদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে দেওয়ান জগন্মোহনের সহিত মতান্তর হওয়াতে সদাচারনিষ্ঠ রামনিধি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার পর তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্রটি ও কিয়দ্দিন পরে তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে নিধুবাবু শোকাকুল হইয়া "মনঃপুর হতে আমার হারায়েছে মন" (গীতরত্ন, পৃঃ ৯৯) ইত্যাদি গান রচনা করেন। তদনন্তর ১১৯৮ সালে জোড়াসাঁকোতে নিধুবাবু দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে সংসার অতি শীঘ্রই গত

১৫। *Bengal Academy of Literature*, Vol I. no 6. p. 4.

১৬। *Bengal Academy of Lit. ibid.* যদি ইহা ঠিক হয়, তবে তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাগমনের তারিখ ১২০১ বা ১২০২ হয়; কিন্তু তাহা হইলে তিনি ১১৯৮ সালে কিরূপে কলিকাতায় দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন ?

হইয়াছিল। ১২০১ বা ১২০২ সালে বরিঝাটি চণ্ডীতলা গ্রামের হরিনারায়ণ সেনের তৃতীয়া কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। এই সংসারে তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল গীতরত্ন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক।

শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে[১৭] একখানি বড় আটচালা ছিল। সঙ্গীতরসজ্ঞ নিধুবাবু প্রতি রজনী তথায় গিয়া সঙ্গীতালাপ করিতেন এবং সহরের প্রায় সমস্ত সৌখীন ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া তাঁহার টপ্পা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। নিমতলানিবাসী নারায়ণচন্দ্র মিত্র-গঠিত "পক্ষীর দলের"ও উক্ত আটচালায় বৈঠক বসিত। এই পক্ষীর দলে সকলে গঞ্জিকা-সেবী হইলেও ভদ্রসন্তান, উপস্থিত-কবি ও সৌখীন-নামধারী বাবু ছিলেন এবং নিধুবাবুকে তাঁহারা যথেষ্ট মান্য করিতেন[১৮]। বটতলার আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে বাগবাজারনিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে বাগবাজারস্থ রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাটীতে কিছু দিন নিধুবাবুর বৈঠক হয়। নিধুবাবু পেশাদারী গায়ক বা কবিওয়ালা ছিলেন না, তথাপি তাঁহারই উদ্যোগে ১২১২-১৩ অব্দে[১৯] দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়। বাগবাজার-নিবাসী মোহনচাঁদ বসু সাবেক আখড়াই পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া প্রথমতঃ সখের দাঁড়া কবি ও পরে হাফ-আখড়াই গাহনার সৃষ্টি করেন; মোহনচাঁদ আখড়াই গাহনা নিধুবার নিকট শিক্ষা করেন।[২০]

উক্ত জীবনবৃত্তান্ত হইতে আরও জানা যায় যে, নিধুবাবু সদানন্দ, সন্তোষপরায়ণ, ও পরোপকারী ছিলেন। যদিও তিনি নিজ গুণে অনেক ধনী ও সম্রান্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও কোনও বড় লোকের তোষামোদ করেন নাই, নিজের মান বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত গম্ভীর ছিল যে, কেহ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দুএকটি অপবাদ ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মুরসিদাবাদস্থ মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া বহু দিন অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিদিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদপ্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজের শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী গুণবতী বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গণা ছিল, এই বারবিলাসিনী রামনিধি বাবুকে অন্তঃকরণের সহিত

১৭। প্রভাকরে প্রকাশিত জীবনী হইতে জানা যায় যে, এই আটচালা শোভাবাজারস্থ বটতলানিবাসী এমেরিকান কাপ্তেনের মুচ্ছুদ্দি রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল।

১৮। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ সংবাদ-প্রভাকরে দ্রষ্টব্য।

১৯। ১২১১ সাল (প্রভাকর, ১ শ্রাবণ, ১২৬১)।

২০। গীতরত্ন, বিজ্ঞাপন, পৃঃ ৮৶০। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিধুবাবুর টপ্পার কথা বলিয়াছি, আখড়াই গান সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করি নাই। আখড়াই গাহনার বিবরণ ও ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত-লিখিত নিধুবাবুর জীবনীতে পাওয়া যাইবে। (সংবাদপ্রভাকর, ১ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র, ১২৬১)।

ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাঁহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী প্রিয়তমা বেশ্যা কিন্তু বিজ্ঞমণ্ডলীয় অনেকে এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন, তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি বিনয় স্নেহ এবং নির্ম্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্যপরিহাস কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেমন ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহারই এক ২ গীত রচনা করিতেন, এবং সেই গীত সকল রাগে এবং সকল তানে গান করিতেন, এতাদৃশ যে যখন যে গীত যে রাগে গান করিতেন বোধ হইত যে এ গীত এই রাগে উদ্ভব হইয়াছে।" (গীতরত্ন, পৃঃ ॥৹, সংবাদ-প্রভাকর, ১ শ্রাবণ ১২৬১)। এইরূপ সুখ ও প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিয়া প্রায় ৯৭ বৎসর বয়সে, ২১শে চৈত্র ১২৪৫ সালে, নিধুবাবু দেহ ত্যাগ করেন। শেষ বয়সে অনেক শোকতাপ পাইলেও তিনি শারীরিক নিয়ম এত যত্নের সহিত পালন করিতেন যে, আমরণ সুস্থ শরীরে কাটাইয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁহার রচিত গানে কেবল সঙ্গীতকুশলতা নহে, অধ্যয়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত, পারসী ও অল্প অল্প ইংরাজীও জানিতেন। অনেকগুলি গান সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকমূলক; যথা—

মঙ্গলাচরণ কর সখীগণ আইল মনোরঞ্জন
গাও এমন কল্যাণ।
নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পুর,
ভুরু আম্রশাখা তাহে বাখান॥
কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে পুর শ্বাস, হয় ত বিধান।
কেহ বা বরণ কর, কেহ শুভ ধ্বনি কর,
যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ১১)[২১]

ভারতচন্দ্রের ন্যায় পারস্য হইতে ভাব আহরণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। "প্রীতি-গীতি"র সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন[২২] যে, নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্র হাফেজের একটি প্রসিদ্ধ পদের অবিকল অনুবাদ—

ওষ্ঠাগত প্রাণ, নাথ, না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে বল না আমারে॥ (গীতরত্ন, পৃঃ ৫৫)

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, নিধু বাবুর গানের ভাব অনেক হিন্দী টপ্পায় পাওয়া যায়।

আধুনিক সময়ে অনেকের ধারণা আছে যে, আদিরসাত্মক প্রণয়-সঙ্গীত মাত্রই টপ্পা এবং

২১। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত গানগুলিতে মূলের বানান ও পংক্তিবিন্যাস অবিকল রাখা হইয়াছে।

২২। প্রীতি-গীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ২।৶৹।

আদিরস অর্থে এখানে হীন ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির বিকাশ বুঝায়; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার বাঙ্গালা শব্দকোষে "টপ্পা" হিন্দী শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়া ইহার মৌলিক অর্থ "লম্ফ" এবং টপ্পা গীতের অর্থ "সংক্ষিপ্ত লঘুপ্রকৃতি গীত" দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, টপ্পা ধ্রুপদ খেয়ালের ন্যায় গীত-রচনায় রীতিবিশেষ। কোনও বিশেষজ্ঞ লেখক এই রীতির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,—"টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ; তাহা হইতে রূঢ়ার্থ, সংক্ষেপ; অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই তুক; অস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। টপ্পাতে প্রাচীন রাগের মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, এবং কালাংড়া আর আধুনিক রাগের মধ্যে কাফী, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোঁয়া, ইমন, ও লুম ব্যবহৃত হয়। আদিরসাত্মক গানকে যে টপ্পা বলে, এ সংস্কার ভুল। গানের এক পৃথক্ রীতির নাম টপ্‌পা; ইহাতে সকল প্রকার গানই হয়।"২৩

নিধুবাবু যখন টপ্পা গান গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন এক দিকে ভারতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব, অন্য দিকে কবিগানের পূর্ণ গৌরব ও সমৃদ্ধির সময়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর তারিখ যদি ১১৬৭ হয়, তবে সে সময় নিধু বাবু উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবক মাত্র। ভারতচন্দ্রের নাম ও প্রভাবের মধ্যেই তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা। এই প্রভাবের জের "কামিনীকুমার", "চন্দ্রকান্ত" প্রভৃতি বিদ্যাসুন্দর ধরণের বিকৃতরুচি কাব্যের ভিতর দিয়া ইংরাজী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মদনমোহনের "বাসবদত্তা"য় প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দিকে রাসু, নৃসিংহ, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, হরু ঠাকুর, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি পুরাতন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালারা সকলেই নিধু বাবুর সমসাময়িক। আধুনিক সময়ের ধারণা যে, কবিগান খেউড়, উহা অশ্লীলতা-ময়। কবিগানের বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু বস্তুতঃ আদৌ কবিগান সেরূপ ছিল না; রুচি-পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের অন্যান্য পুরাতন জিনিষের ন্যায় যখন কবিগানের আদর কমিয়া গেল, তখন এই শ্রেণীর গীতিও শিক্ষিত-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতর-সমাজে উপনীত হইয়া খেউড়ে পরিণত হইতে লাগিল। যাহা হউক, কবিগান তখন খেউড় না হইলেও ইহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের ন্যায় পুরাতন সাহিত্যের জের মাত্র। বিরহ, গোষ্ঠ, মান, দান, মাথুর, সখীসংবাদ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত কবিগানের প্রধান অঙ্গ ছিল এবং এই হিসাবে ইহা পুরাতন বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক অভিনব শাখা মাত্র। যদিও বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় সকল কবিওয়ালাদের প্রতিভা ও তন্ময়তা ছিল না, তথাপি নানা কারণে কবিগানকে বৈষ্ণব-গীতির এক নিম্নতর সংস্করণ ধরা যাইতে পারে। নিধু বাবু পুরাতন

২৩। "সঙ্গীততানসেন" গ্রন্থে (১২৯৯) গীতের দুই প্রকার রীতি কথিত হইয়াছে—ধ্রুপদ ও রঙ্গীন গান। ধ্রুপদ গান প্রায় ২৪ প্রকার ও রঙ্গীন গান প্রায় পঞ্চাশ প্রকার উক্ত হইয়াছে। খেয়াল ও টপ্পা রঙ্গীন গানের একটি বিশেষ প্রকার মাত্র। (পৃঃ ৬৬-৬৯)। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুমে নিধুবাবুর টপ্পা বাঙ্গালা রঙ্গীন গানের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্যের এই দুই পথের কোনও পথ অবলম্বন করেন নাই। তখন ভারতচন্দ্রের যেরূপ প্রতিপত্তি ও কবিগানের যেরূপ আদর, তাহাতে নিধু বাবুর ভারতচন্দ্রের বাতাস অতিক্রম করা বা কবিগান রচনা না করিয়া নূতন ধরণের গান রচনা করা কম সাহস ও প্রতিভার পরিচায়ক নহে। তখনকার গীতি-সাহিত্যে নিধু বাবু সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র পথাবলম্বী। এক দিকে বিদ্যাসুন্দরের আদর্শ, অন্য দিকে কবিগান ইত্যাদি, ইহার কোনও দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া নিধু বাবু হিন্দী খেয়াল ও টপ্পা ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় নূতন ধরণের প্রেম-সঙ্গীত রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত গানই প্রেম-বিষয়ক; কিন্তু তাহাতে রাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যা-সুন্দরের নাম-গন্ধও নাই। কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি, ভালবাসা ও মনের ব্যথা স্বাধীন-ভাবে গাহিয়াছেন, পরকীয় ভাব অবলম্বন করেন নাই। এই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে নিধু বাবুর স্থান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। মোটামুটি ধরিলে প্রাচীন সাহিত্য বহির্জ্জগৎ লইয়াই ব্যস্ত; কবি আপন অনুভূতি বা অন্তর্জ্জগতের কথা বলেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহা আবার পরের অনুভূতির ভিতর দিয়া। আধুনিক সাহিত্য অন্ন-বিস্তর অন্তর্জ্জগৎ লইয়া; আপনার সুখ-দুঃখের কথা অথবা আত্মপ্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া পরের কথা বোঝা, ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। পুরাতন ভাষা ও কাঠামো বজায় রাখিলেও নিধু বাবু তাহার মধ্যে যেটুকু নূতন ভাবের আলোক আনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন। গীতরত্নের সমস্ত গান রত্ন না হইলেও আধুনিক সময়ে যেরূপ উপেক্ষিত ও অনাদৃত, তাহারা বোধ হয় সেরূপ উপেক্ষা ও অনাদরের যোগ্য নহে।

বাস্তবিক দুঃখের বিষয় যে, আধুনিক সময়ে এরূপ শক্তিশালী কবির সম্যক্ গুণ গ্রহণ করা হয় নাই; বরং তাঁহাকে উপেক্ষা ও ঘৃণার ভাগই বেশী দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি দুএক জন গুণজ্ঞ সমালোচক তাঁহার সুখ্যাতি করিলেও নিধু বাবুর গানের সহিত একটা কালক্রমাগত অযথা অখ্যাতি জড়িত হইয়া গিয়াছে। এমন কি, দেখিতেছি যে, মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় রসজ্ঞ লেখকও "অতি নীচ শ্রেণীর কবিতার কয়তোপ" বলিয়া নিধু বাবুর গানের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন।[২৪]

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিধু বাবু নামমাত্রাবশেষ; তাঁহার টপ্পা অতি অল্প লোকেই পড়েন এবং অনেকে না পড়িয়াই ঘৃণা করেন। তাঁহারা বলেন, যে লোক অযথা অশ্লীল প্রণয়গীত রচনা করিয়া লোকের চরিত্র দূষিত করে, তাহাকে কবি বলিলে কবি নামের

২৪। বঙ্গদর্শন (পুরাতন পর্য্যায়), ৭ম-৮ম ভাগ (১২৮৭-৮৮)। গত বৎসরের নারায়ণ পত্রিকায় 'নিধু গুপ্ত' প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় নিধু বাবুর প্রতি সুবিচারে উদ্যত হইয়া এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। (নারায়ণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃঃ ৭৩৪)। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই পুরাতন মত অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছিলেন, এখন তাহার জন্য দুঃখিত।

অবমাননা হয়। এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া নিধু বাবুর গীত সম্বন্ধে কৈলাসচন্দ্র ঘোষ তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য" পুস্তিকায় (১২৯২) লিখিয়াছেন,—"ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতাদুষ্ট"। ইহা অপেক্ষা কঠোর সমালোচনা করিয়া "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, এ সকল সঙ্গীতে যে প্রেমের আদর্শ, তাহা কুৎসিত অসংযত ইন্দ্রিয়-লালসার নামান্তর মাত্র; ইহা "আত্মবিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসে কলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র"।[২৬] অবশ্য এরূপ বলা যায় না যে, নিধু বাবুর গানে মোটে অশ্লীলতা নাই; এখনকার মার্জ্জিত রুচি দ্বারা বিচার করিলে তাঁহার কতকগুলি গীত রুচি-বিরুদ্ধ বলিতেই হইবে। কিন্তু আজকালকার ও সে কালের রুচির যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল, তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রতিভাশালী হইলেও কবি অনেক সময় সাধারণ লোকের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্রের অধীন। এরূপ অশ্লীলতা অপবাদ প্রাচীন কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাল-নাগাদ ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত অনেকেরই আছে; কিন্তু এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সমালোচনায় সময় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু এ সমস্ত তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, নিধু বাবুর গীতাবলীর মধ্যে অশ্লীলতা অত্যন্ত বিরল। দুএকটি টপ্পা, কয়েকটি হাফ আখড়াই ও খেঁউড় ছাড়িয়া দিলে তাঁহার গানের রুচি সর্ব্বত্র সঙ্গত এবং গানের মধ্যে ভোগ অপেক্ষা আত্মসমর্পণের কথাই অধিক। নিধু বাবুর গান তাঁহার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়াছিল যে, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অতি জঘন্য গীতও "নিধুর টপ্পা" বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গীতরত্ন গ্রন্থের আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই এবং নিধু বাবুর গানেরও চর্চ্চা নাই; নিধুর টপ্পা অর্থে আধুনিক পাঠক বুঝেন, বটতলা-প্রকাশিত নিধুর নামে বিক্রীত জঘন্য টপ্পার সংগ্রহ। সেই জন্যই বোধ হয়, নিধু বাবুর গানের এত অশ্লীলতা অপবাদ। বাস্তবিক নিধু বাবুর রচিত টপ্পার মত সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী টপ্পা বঙ্গভাষায় আর রচিত হয় নাই।

নিধুবাবুর রচনায় কারিগরি বিশেষ না থাকিলেও ভাষার যেমন লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা, সুরলয়ের তেমনি পারিপাট্য, ততোধিক ভাবের কোমলতা ও গভীরতা। শব্দের ছটা, ছন্দবৈচিত্র্য বা অলঙ্কারাদির প্রাচুর্য্য নাই; এমন কি, চরণের মিল সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অমনোযোগী, তথাপি সাদাসিদে অল্প কথায় স্বভাব-কবির ভাবুকতায় প্রাণের আবেগ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। আর্ট বা শিল্পনৈপুণ্য হিসাবে হয় ত অনেকেই এ গানগুলিকে খুব উচ্চ স্থান দিবেন না; চরণের মিল, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিধুবাবুর রচনা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। অনেকে আবার হয় ত ইহার মামুলী সেকেলে কাঠামো পছন্দ করিবেন না। নিধুবাবুর অতি অল্প গানই আছে, যাহার সমস্তটা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; কবি যে প্রেরণার বশে গাহিতে বসিয়াছেন, তাহা অনেক সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ

২৬। রস-ভাণ্ডার (বসুমতী কার্য্যালয়), ভূমিকা, পৃঃ ৫৯/০-৫৮/০।

রাখিতে পারেন নাই। এই দোষ অল্প-বিস্তর অধিকাংশ কবিওয়ালাদের মধ্যেও দেখা যায়। নিত্যানন্দ বৈরাগীর—

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইলো
সুধা বরিষিলো শ্রবণে।২৭

এই মহড়াটি সুন্দর; কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী অন্তরা ও চিতেন ইহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। নিধুবাবু হইতেও এইরূপ ক্রমভঙ্গের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

সাধিলে করিব মান কত মনে করি
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১০০)

লাইন দুইটি নিখুঁত; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী দুই লাইন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। এই সকল গীতরচকদিগের রচনা আমূল শেষ পর্য্যন্ত সমভাবাপন্ন বা নির্দ্দোষ নহে। নিধুবাবুর টপ্পায় এ সকল দোষ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, এই সমস্ত টপ্পার ভাব কদর্য্য ও অতি নীচশ্রেণীর অথবা ইহা ভাবসৌন্দর্য্য-বিহীন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারা যায় না। ভাবের মনোহারিত্বই নিধুবাবুর গানের বিশেষত্ব।

প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে, নিধুবাবু তাহার অনেক কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, নিধুবাবুর মত স্বভাব-কবি পূর্ব্ব হইতে একটা মতামত বা ধারণা খাড়া করিয়া গীত রচনা করিতে বসেন নাই। পরন্তু যখন যে মনের ভাব উদয় হইয়াছে, তাহাই সুরলয়ে গঠিত করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু সখীসংবাদ, মান, বিচ্ছেদ, মিলন নহে, সহস্রতন্ত্রী হৃদয়-বীণায় প্রেমের কোমল স্পর্শে যে শত সহস্র ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহার প্রতিধ্বনি নিধুবাবুর গানের মধ্যে বিভিন্ন আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রেম-সঙ্গীত বঙ্গসাহিত্যে নূতন নহে; কিন্তু প্রেমের স্বর চিরপরিচিত হইলেও চিরমুগ্ধকর। যুগে যুগে কবিগণ প্রেমের গান গাহিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু এই অপূর্ব্ব অনুভূতির আলোক বিভিন্ন কবি-হৃদয়ের স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া যুগে যুগে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার অন্যান্য মধুর প্রেমসঙ্গীতের সহিত নিধুবাবুর রচনাও গৌড়-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

নিধুবাবুর প্রেম-সঙ্গীত যে শুধু ইন্দ্রিয়লালসা বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতামূলক নহে, আমরা নিধু বাবুর গীতিগুলি আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রায় সমস্ত টপ্পা-গুলিই প্রেম-বিষয়ক। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই প্রীতির প্রশংসা করিয়াছেন; আমাদের কবিও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

২৭। সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ ১২৬১, পৃঃ ৭; কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ (ইং ১৮৬২), পৃঃ ১১০-১১১; সঙ্গীতসারসংগ্রহ (বঙ্গবাসী কার্য্যালয়), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৪৭

পিরীতি না জানে সখী সে জন সুখী বল কেমনে।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৭৭)

প্রেমমুগ্ধ কবি প্রেমের কথা বলিতে গিয়া আত্মহারা—

পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে।
শুনিলে বিস্ময় হয় শরীর সিহরে ॥—(ঐ, পৃঃ ১২৫)

যে প্রেম জানে না, সে সুখীও নয়, দুঃখীও নয়; প্রেমের সুখ-দুঃখই জীবনের প্রধান অনুভূতি—

নহে সুখী নহে দুঃখী প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুখী সেই সখী এ রস যে জানে ॥—(ঐ, পৃঃ ২১)

কিন্তু প্রেম শুধু ধ্যান-ধারণার জিনিস নহে; হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ, তৃষ্ণা তৃপ্তি, পুণ্য পাপ, এ সকলের মন্থন-ধন প্রেম জীবনের একটি বাস্তব অনুভূতি। যত দিন দেহ আছে, প্রেম দেহসম্পর্কশূন্য থাকিতে পারে না। এইখানেই নিধুবাবুর ধারণার সহিত অনেক আধুনিক কবির ধারণার পার্থক্য। অনেক আধুনিক কবির প্রেম দেহসম্পর্ক-শূন্য স্বপ্নময় কাল্পনিক বস্তু। তাঁহাদের মতে প্রেম ইন্দ্রিয়গত না হইলেও চলে; ভালবাসিবার জন্য আধুনিক কবিগণ একটি কাল্পনিক প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু সে কালের কবিগণ ইহাতে তৃপ্ত হইতেন না; এ কালের কবিগণও কোথায় তৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন! শুধু একটা দূর মানসী প্রতিমার মিলনের প্রতীক্ষায় না বসিয়া প্রকৃত পৌত্তলিকের ন্যায় হাত-পা-চোখ-মুখ-সম্বলিত একটি জীবন্ত প্রতিমার আরাধনায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিতেন। এই পৌত্তলিক-তার উন্মত্ততা ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগকে বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছিল। এই জন্য তাঁহাদের লেখা শুধু একটা অপরিস্ফুট গীতোচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হয় নাই।

কিন্তু প্রেম দেহ আশ্রয় করিয়া জাগিলেও আবার দেহকে ছাড়াইয়া যায়। সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন যে, প্রেমের প্রথম জন্ম—চোখের নেশায়। এই জন্য রূপ বা আঁখির মিলন কবি ও ঔপন্যাসিকের প্রিয় বস্তু। 'উভয় মন সংযোগ নয়ন কারণ তায়।" (গীতরত্ন, পৃঃ ১০৯)। প্রিয় জনকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার লালসা প্রেমের একটি প্রসিদ্ধ লক্ষণ ও আনুষঙ্গিক ফল।

আগে কি জানি সই এমন হবে।
নয়নে নয়নে মিলে মনেরে মজাবে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১৯)

অদর্শনে দুঃখ, দর্শনে সুখ। চোখের দেখায় যে সুখ, শুধু ধ্যান-ধারণায় তাহা হয় না—

হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ॥—(ঐ, পৃঃ ১২)
নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তথাপিহ আশা নাহি পূরে ॥

যদি বিনয়েতে মনঃ স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়ে ভুলায় তাহারে ॥—(গীতরত্ন, ৭৫)
নয়ন-অন্তরে, অন্তরে তোরে নিরখি মন-নয়নে।
চাক্ষুষে যতেক সুখ, তত কি হয় মননে ॥—(ঐ, পৃঃ ৩)
মননে নহে এত সুখ যত বাহ্য দরশনে—(ঐ, পৃঃ ৮৭)
মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না ॥—(ঐ, পৃঃ ১১)

কিন্তু এ চোখের তৃষ্ণা আর মিটে না—

বিচ্ছেদে যা ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে।
আঁখির কি আশা পুরে ক্ষণ দরশনে ॥—(ঐ, পৃঃ ১১৭)
নয়নে নয়নে রাখি (প্রাণ) অনিমিখ হয় আঁখি
বাসনা মনেতে।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখি,
কি জানি অন্তর হও এই ভয় দেখি ॥ —(ঐ, পৃঃ ৭৯)

কিন্তু প্রেম রূপের বন্ধনে ধরা পড়িলেও গুণের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে ; চোখের নেশায় জন্মিলেও শেষে মনকে আশ্রয় করে—

নয়ন রূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে।—(ঐ, পৃঃ ১১৩)
নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন ॥
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন ॥২৮—(প্রীতিগীতি, পৃঃ ১৫৪ ;
রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৭ ; সঙ্গীতসারসংগ্রহ, পৃঃ ৮৭৫)

চোখের নেশায় প্রেমের সূত্রপাত হইলেও, প্রেম আন্তরিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী। ইন্দ্রিয়েতে জন্মিয়া, ইন্দ্রিয় ছাড়াইয়া, মনের রাজ্যেই প্রেমের সিংহাসন। সেই জন্য যত দিন নয়ন মনের বশ না হয়—যত দিন প্রেম "নয়নেরে দুঃখ দিয়া মনেতে সদা উদয়" (গীতরত্ন, পৃঃ ৪) না হয়—তত দিন প্রেমের পূর্ণতা লাভ হয় না—

২৮। এই গানটি ও নিম্নোদ্ধৃত তিন চারিটি গান গীতরত্নে নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এগুলি নিধুবাবুর কি না সন্দেহ ; কিন্তু বরাবর ইহা নিধুবাবুর নামের সহিত জড়িত ; অন্য কাহারো বলিয়া যত দিন নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত না হয়, তত দিন নিধুবাবুর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, গীতরত্ন প্রামাণিক হইলেও সম্পূর্ণ সংগ্রহ নহে। যেগুলি অন্য লোকের রচিত বলিয়া বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, সেগুলি বর্জ্জন করিয়াছি। এরূপ সন্দেহযুক্ত গান মোট ৫টি মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি ; বাকি সব গানই গীতরত্ন হইতে।

এত দিনে মনবশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান ॥
বাহ্যে অদর্শনে দুঃখী নহে কদাচন।
সদা মনযোগে তার করি দরশন ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৮৪)

বাস্তবিক একাত্মমিলন না হইলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়—

এত দিন পর নিবিল আমার মনের অনল সখী।
দেখ যত দিন, ছিল দুই জ্ঞান, সদত ঝুরিত আঁখি ॥—(ঐ, পৃঃ ৪০)
আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার মোর মনে।
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দুজনে ॥—(ঐ, পৃঃ ৭)

এরূপ হইলে বিচ্ছেদ-মিলনের আর ভয় থাকে না—

হরিষ বিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন।
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন ॥—(ঐ, পৃঃ ১১৯)

যখন এইরূপ মিলন হয়, তখন প্রেমের আতিশয্যে হৃদয়ের যে অপূর্ব্ব ভাব, তাহা প্রেমিক নিজেই বুঝিতে পারেন না—

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয়নিবাসি তুমি হয় হে বুঝিতে ॥—(ঐ, পৃঃ ৭)
তুমি কি জানিবে আমার মন।
মন আপনারে আপনি জানে না ॥—(ঐ, পৃঃ ৭৩)

এরূপ আত্মসমর্পণই প্রেমের মূল মন্ত্র—

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।
মনের অধিক আর, আছে কি রতন ॥—(ঐ, পৃঃ ২০)

প্রতিদানে প্রেমের সার্থকতা বটে, কিন্তু ভালবাসিতে যত সুখ, ভালবাসাইতে তত নয়। এই জন্য নিরপেক্ষ প্রেমের কথা কবিরা গাহিতে ভালবাসেন—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে ॥
বিধু মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্য দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে।[২৯]

প্রেম একবার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে তাহার আর বিনাশ নাই—

তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে ॥

২৯। পৃঃ ১০৬ দ্রষ্টব্য।

আর কি সে রূপ ভুলি প্রেম তুলি করে তুলি
হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে সে ভুলেছে ভুল তারে
সে দিন ভুলিব তারে যে দিনে লবে শমনে॥—৩০ (গীতাবলী বা নিধু-
বাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১৭১ ; রসভাণ্ডার, পৃঃ ১০৬)

পিরীতি তোমার সনে রহিল মনে
কখন না পাসরিব জীবনে মরণে॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৯)

তাহারে কি ভুলিতে পারি যাহারে আমি সঁপিলাম মনঃ।
দেখিতে তাহার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন॥
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন॥—(ঐ, পৃঃ ১২৩)

প্রেম অনন্তগতি ; একবার ভালবাসিলে কখনও ভোলা যায় না—

মনে করি ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ মরি হে দুখেতে॥—(ঐ, পৃঃ ২৮)

কিবা দিবা বিভাবরী পাসরিতে নাহি পারি
আঁখি অনিমিষ, পথ হেরিতে হেরিতে॥—(ঐ, পৃঃ ৯)

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি।
দিবে নিশি সেই ধ্যান সেই ধন সেই জ্ঞান
মন প্রাণ প্রাণ প্রাণ করি॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৯)

প্রেম অন্তর কি হয় প্রিয়জন প্রতি নয়ন-অন্তরে। (ঐ পৃঃ ২৭)

কিন্তু এই প্রেমনিধি সর্ব্বত্যাগী না হইলে লাভ করা যায় না—

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করে নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে আছে যত অপমান॥
যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পুরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব এ প্রাণ॥
(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১৭০)

প্রেম—লজ্জা-ভয়, মান-অপমানের অতীত। যে প্রেম-সঙ্গীতে কলঙ্ক বা কুলত্যাগের কথা আছে, চন্দ্রশেখর বাবু তাহা সমাজ নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে

৩০। প্রীতিগীতিতে এই গানটি হরিমোহন রায়ের নামে আছে (পৃঃ ৫৩)। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকেও এই গানটি দেখা যায়। এই গানটি নিধু বাবুর কি না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কোন রসজ্ঞ সমালোচক লিখিয়াছেন,[৩১] —"যাঁহারা এ দেশের প্রীতিগীতির ইতিবৃত্ত জানেন, তাঁহাদের নিকট এই কলঙ্কের প্রকৃত মর্ম্ম অবিদিত নাই।......বৈষ্ণব পদে যে কলঙ্কের উল্লেখ আছে, তাহা ভাগবতী লীলার অন্তর্ভূত। যদি ভগবান্‌কে চাও, তবে লোকাপবাদের ভয় করিলে চলিবে না। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ভাবিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে, কুল কোন্ ছার? কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে এই মর্ম্ম, নিধুবাবু তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন—

অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার।
লোক-কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে সেই রূপেতে ॥
—(গীতরত্ন, পৃঃ ৪৮)

কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে অর্থ, সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমের গানেও কলঙ্কের সেই অর্থ—প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ। শত অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যে প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার কি ঐকান্তিকতা! এই ঐকান্তিকতা দেখাইবার জন্যই কবি প্রেমের উপর কলঙ্ক আরোপ করেন। কবির এই উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আমরা যেন কাব্যের জগতে সমাজ-নীতির বিতণ্ডা উপস্থিত না করি; তাহা হইলে আমরা কোন কালে কাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব না।" সেই জন্য নিধু বাবু গাহিয়াছেন,—

হউক হে হউক প্রাণ যায় যাউক আমার,
খেদ নাহি তাহাতে।
তোমারে পাইলেম যদি কি করে লাজেতে ॥
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে।
আমি বলি এত দিনে আইলেম কুলেতে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১১২-১৩)

উল্লিখিত ভাবমূলক সঙ্গীত ছাড়াও নিধু বাবু প্রেম সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক টপ্পা রচনা করিয়াছেন। মিলনাকাঙ্ক্ষা, মিলনের আনন্দ, অভিমান, সাধনা, সোহাগ, আত্মনিবেদন, বিচ্ছেদের দুঃখ, অপূর্ণ প্রেমের নৈরাশ্য, উদ্বেগ, সন্দেহ, অবিশ্বাস, প্রেমে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা, অনুযোগ প্রভৃতি বহুরূপী প্রেমের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা তাঁহার সঙ্গীতে অপ্রতুল নহে। নিম্নোদ্ধৃত মিলন-সঙ্গীতটি যেন একটি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া দেয়,—

আনন্দ ভর করি দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়নে মনসংযোগ নাহিক ভয় গঞ্জনে ॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন-খঞ্জনে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩০)

এরূপ চিত্রকুশলতার পরিচয় বিরল নয়—

কে ও যায় চাহিতে চাহিতে।
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে ॥

৩১। প্রীতিগীতি, অবতরণিকা, পৃঃ ৩/০।

যত ক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমিক হেরিতে হেরিতে —(গীতরত্ন, পৃঃ ৮৭)

মিলন—

মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত বিচ্ছেদ চলিল ॥—(ঐ, পৃঃ ১৭২)

আদর—

স আদরাদর বা আদর অধর কম্পে কহিতে।
দরশনে পরশনে অমিয় বচনে
শরীর শ্রবণ সুখী আঁখি সহিতে ॥—(ঐ, পৃঃ ৪১)

প্রেমের তন্ময়তা—

যে দিকে চাই সে দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে,
না দেখি কাহারে ॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে।
পুনঃ জাগরণে নয়নে নয়নে থাকি সেই মনে,
কি হলো আমারে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩৬)

কিন্তু নিধু বাবু মিলনের এরূপ সুখ-চিত্র আঁকিলেও, ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, সুখ অপেক্ষা দুঃখ, তৃপ্তি অপেক্ষা অতৃপ্তির কথাই বেশী বলিয়াছেন। মিলনের চেয়ে দুঃখের গান গাহিতে তিনি ভালবাসেন। প্রেমে সুখ-দুঃখ চিরন্তন—

ক্ষণেক সুধাসাগর, ক্ষণে হলাহল শর—(ঐ, পৃঃ ৭৭)

কিন্তু সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগই অধিক—

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে। হে
সুখ আশে ভাসে সদা দুঃখের সাগরে ॥—(ঐ, পৃঃ ২)

মিলনেও দুঃখ, বিরহেও দুঃখ—

পিরীতি সুখের লোভে মজে হে যে জন। (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ দুঃখের ভাজন ॥
বিচ্ছেদে মিলন আশে থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ ॥—(ঐ, পৃঃ ১২০)

পথ চাহিতে চাহিতে দিন কাটিয়া যায়—

উদয় সুখতারা আমার নয়নতারা তার পথ নিরখিয়ে।
কারণ না জানি আমি আছি কি রসে ভুলিয়ে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩০)
এক পল বিপল না হেরি ওলো হতো মোর নয়ন সজল।
অধিক বিলম্বে এবে, সে জল শুকায়ে গেল ॥—(ঐ, পৃঃ ৬)

চক্ষের তৃষ্ণা মিটে না—

তিল অদর্শন হলে হয় সজল নয়ন—(ঐ, পৃঃ ৫)

নয়নের জলে মনের অনল নিভে না—

নয়ন-নীরে কি নিবে মনের অনল—(ঐ, পৃঃ ১২৫)

হৃদয়ের আশাও কখন পুরে না—

তবে প্রেমে কি সুখ হতো।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিতো ॥—(গীতাবলী বা নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ, পৃঃ ১১২, সঙ্গীতসারসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮১৩ ; প্রীতিগীতি, পৃঃ ৩১৬)

কিন্তু দুঃখ-যাতনা সত্বেও কবি প্রেমকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে তুমি আমারে তেজো না।
যদি রাত্র দিন, কর জ্বালাতন, ভাল সে যাতনা ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ১৩১)

প্রেমের দহনে হৃদয় আরও নির্ম্মল হয়—

অন্য অন্য চিন্তা যত আমার আছিল
তব হুতাশনে তারা শবদাহ হল ॥—(ঐ, পৃঃ ১৩২)

দুঃখের ভয়ে প্রেম ভুলিতে পারা যায় না—

থাকিতে বাসনা যার চন্দনবনে।
ভুজঙ্গেরে ভয় সেহ করে কি কখনে ॥—(ঐ, পৃঃ ৪৪)

প্রেমিকের কাছে প্রেমের দুঃখেও সুখ—

সেই সে পিরীতি প্রাণ পারে গো রাখিতে।
দুঃখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে ॥—(ঐ, পৃঃ ১৭)
পিরীতের দুঃখ ভ্রম জ্ঞান সুখময়।—(ঐ, পৃঃ ৯৪)

প্রেমের এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখের মধ্যেও প্রেমিকের আশ্বাস—

দুঃখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ বোধ করে যতনে তায় তুষিব ॥
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে বিধুবদন দূর থেকে দেখিব ॥—(বঙ্গের কবিতা, পৃঃ ২৯৫)

কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সপিয়াছি যারে, অতি যতনেতে ॥
ইথে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে ॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ২০)

উদ্ধৃত গীতসমূহ হইতে বুঝা যাইবে, নিধুবাবুর এই প্রেমের ধারণার মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার প্রসারই অধিক। ইহাতে ভাবের গভীরতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তথাপি চন্দ্রশেখর বাবু ইহার মধ্যে "ইন্দ্রিয়লালসার আধিক্য", "উন্মুক্ত ও নির্লজ্জ বিলাসিতার ভাব" কিরূপে পাইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তৎকালীন গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুর প্রতিভা ও ক্ষমতা হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথাপি ইঁহার কীর্ত্তিত প্রেমের "ইন্দ্রিয়লালসাতেই উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই সমাপ্তি" ইত্যাদি যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সমীচীন বলা যায় না।

আর একটি কথা। নিধুবাবুর গানগুলি গান হিসাবেও বিচার করিতে হইবে; সেগুলি

শুদ্ধ কবিতা বলিয়া ধরিলে ভুল হইবে। অনেক সময় আমরা গানকে কবিতার মাপকাটীতে মাপিয়া ভুল করি; কবিতা ও গানে যে পার্থক্য থাকিতে পারে, এ কথা ভুলিয়া যাই। গানের প্রধান সৌন্দর্য্য সুর; সুরের ভিতর দিয়াই ইহা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। নিধুবাবুর প্রেমস্নিগ্ধ গানের মাধুর্য্য শুধু পাঠে উপলব্ধি করা যায় না, প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; তাহা শুনিবার জিনিস। শুধু নিধুবাবুর টপ্পায় কেন, এ কথা বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায়ও খাটে। সেই জন্য যাঁহারা রসজ্ঞ সুগায়ক কীর্ত্তনীয়ার মুখে মহাজন-পদাবলী শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাহার মাধুর্য্য অধিকতর উপলব্ধি করিয়াছেন। নিধুবাবুর টপ্পাও গান; কবিতা হিসাবে শুধু তাহার সৌন্দর্য্য নহে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইবে; তবে নিধুবাবুর টপ্পার যে গান হিসাবেও যথেষ্ট মূল্য, তাহা সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমের মত গ্রন্থে নিধুবাবুর সার্দ্ধশতাধিক টপ্পার পুনর্ম্মুদ্রণ হইতে অনুমান করিতে পারি। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণানন্দ, ভারতবর্ষীয় গীতরচকদিগের মধ্যে নিধুবাবুকে যে নিতান্ত উপেক্ষণীয় স্থান দেন নাই, তাহাই তাঁহার রচনাগৌরবের পরিচায়ক।

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজিকালিকার দিনে এরূপ শক্তিশালী গীতরচককে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি এবং তাঁহার টপ্পাগুলি অশ্লীল ও রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া অশ্রদ্ধা ও অনাদরের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন কি, গুপ্ত কবি তাঁহার সময়েও এইরূপ বিরাগ লক্ষ্য করিয়া প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন,—"অনেকেই 'নিধু' 'নিধু' কহেন, কিন্তু নিধু শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি? তাহা জ্ঞাত নহেন।" কিন্তু এত অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার মধ্যেও নিধুবাবুর টপ্পা যে আজও বাঁচিয়া আছে, শুধু তাহাই ইহার জীবনী শক্তির পরিচায়ক। ইংরাজী উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভাষার দুর্দ্দিনের সময় যে সকল যুগপ্রবর্ত্তনকারী লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিধুবাবুও তন্মধ্যে একজন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই অনাড়ম্বর বাঙ্গালী কবি তৎকালে অবজ্ঞাত মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি,—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥—(গীতরত্ন, পৃঃ ৯৮)

শ্রীসুশীলকুমার দে

জঙ্গ-নামা*

"জঙ্গ-নামা" একখানি ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মমূলক কাব্য; ইহা মুসলমানী বঙ্গভাষায় লিখিত। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ও বালিয়া পরগণার মধ্যস্থিত জীরিকপুর গ্রাম-নিবাসী মুন্‌শী মোহম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম১ ১১০১ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ২২৩ বৎসর পূর্ব্বে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি বিবিধ 'ছন্দোবন্ধে' বীর ও করুণ রস পূর্ণ এই "জঙ্গ-নামা" কাব্য রচনা করেন।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, জঙ্গ-নামার কবি, মুন্‌শী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, ১০৭১ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ৩০ বৎসর, সেই সময় তিনি এই "জঙ্গ-নামা" কাব্য রচনা করেন। অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, মুন্‌শী সাহেব বড়ই সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সাধু পুরুষদিগের দর্শন আশায় বনে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে এক দরবেশের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহারই নিকট তিনি 'মুরিদ'২ হয়েন৩। "জঙ্গ-নামার" মধ্যে তিনি ইহার পরিচয়ও দিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া, পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণের চেষ্টা করিব।

হিজরীর প্রথম অব্দে, উমষ্যা-বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা এজীদ, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দং)৪ প্রিয়তম দৌহিত্র, মহাত্মা হজরত ইমাম হাসান(রা)কে বিষপ্রয়োগে নিহত করেন, এবং মহাত্মা হজরত ইমাম হোসায়েন(রা)কে কারবালার যুদ্ধে

* "জঙ্গ-নামা" ফার্সী ভাষার দুইটি পৃথক্ শব্দ। জঙ্গ অর্থে যুদ্ধ এবং নামা অর্থে বিবরণ বুঝায়। যে পুস্তকমধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লিখিত হয়, তাহাকেই জঙ্গনামা বলে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে 'জঙ্গ-নামা'র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং বঙ্গদেশের বাঙ্গালী মুসলমানদিগের নিকট যে পুস্তকখানি জঙ্গনামা নামে পরিচিত, তাহা কারবালার ঘটনাবলীতে পূর্ণ। বাঙ্গালী মুসলমানেরা যুদ্ধসংক্রান্ত অপর কোন পুস্তককে "জঙ্গনামা" বলেন না। "জঙ্গনামা" বলিলে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা কেবল কারবালার যুদ্ধের বিবরণ-পুস্তকই বুঝিয়া থাকেন।

১। কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তাঁহার নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইলে, অতীব সম্মানের সহিত সে নাম উল্লেখ করিতে হয়। "মরহুম" সেই সম্মানসূচক শব্দ।

২। মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া, ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করার জন্ম সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করাকে 'মুরিদ' হওয়া বলে।

৩। বসিরহাট, এবং সাতক্ষীরা মহকুমার কোন কোন স্থানে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়।

৪। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দং) নাম উচ্চারণ করিয়াই "দরুদ-শরীফ" পাঠ করিতে হয়। 'দং' তাহারই সাংকেতিক চিহ্ন।

দ-বংশে হত্যা করেন১। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।

হিজ্‌রীর প্রথম অব্দে কারবালার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এবং "জঙ্গ-নামা" ১১০১ বঙ্গাব্দে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কারবালার ঘটনার প্রায় ১১১১ বৎসর পরে এই "জঙ্গ-নামা" পুস্তক বিরচিত হইয়াছিল।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, দশম হিজরী অব্দে, ফার্সী ভাষায় লিখিত অন্যতম ঐতিহাসিক কাব্য "মোক্তল হোসেন" বিরচিত হইয়াছিল। "জঙ্গ-নামা"য় যে সকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল নাই। কিন্তু এই "মোক্তাল-হোসেনে"র সহিত "জঙ্গ-নামা"র সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। "জঙ্গ-নামা"র কবি যে "মোক্তাল-হোসেনে"র কবির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন; যথা,—

"তর্জমা করিয়া আমি কবিতা গাথিনু।
মোক্তল হোসেন হ'তে এ কাব্য লিখিনু॥"

"জঙ্গ-নামা" কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতেছি। কবি, ইহার প্রথম অংশে, শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দং) মোস্তাফার জীবন-মৃত্যুর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি হজরতের প্রিয়তম দুহিতা, বিবি ফাতেমা খাতুনে-জিন্নাতের ও বীরবর মহাত্মা হজরত আলীর (কঃ) সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন২। হজরত আলি(কঃ)র ও হজরত

১। পার্থিব অধিকারের লালসায় ও ক্ষমতা-প্রিয়তার আকাঙ্ক্ষায়, খলিফা এজীদ যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসমধ্যে তাহা একান্তই বিরল। পৃথিবীর কোন ধর্ম্মাবলম্বীই, আপনাদের পয়গম্বরের পরিবারবর্গ ও বংশধরদিগের উপর এই ভাবে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণাভাব। কোন কোন আরবী গ্রন্থকার বলেন, এই ঘটনার কিছু কাল পরে, খলিফা এজীদের হৃদয়ে অনুতাপ ও অনুশোচনা জাগিয়াছিল, এবং তিনি মুক্তির আশায় ইমাম-পুত্র, হজরত জয়নাল আবেদীনের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কোন ভক্ত, খলিফা এজীদের পরকালে মঙ্গল হউক, সেরূপ কোন উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া দিতে নাকি নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে নিষেধ শুনেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা কাহার বংশধর, সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছি? ক্ষমা করা না করা যাঁহার হাত, তিনিই তাহা বুঝিবেন। আমি উপাসনা-পদ্ধতি বলিয়া দিতে বাধ্য।" তিনি খলিফাকে বলিয়াছিলেন,—"যদি তুমি উপর্য্যুপরি তিন বৎসর তিনটি "শবে-আওয়ায়" বা-ওজু দুই রাকাত্‌ নফল নমাজ পড়িতে পার, এবং সেই ওজুতে পাপ-মুক্তির জন্য সারা-রাত্রি ধরিয়া খোদা-তায়ালার নিকট ক্রন্দন করিতে পার, তাহা হইলে হয় ত খোদা-তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করিবেন।" কিন্তু এজীদ মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।" কিছুতেই তিনি ওজু রক্ষা করিতে পারেন নাই। "হবনে হাবিব" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। হজরত আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদের (দং) পিতৃব্য আবু-তালেবের পুত্র। বালকদিগের মধ্যে হজরত আলীই প্রথমে হজরত মোহাম্মদের (দং) প্রচারিত ইসলামধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরত

মোয়াবিয়া(রাঃ)র১ বংশ-পরিচয় ও ইঁহাদের জাতি-বিরোধের মূল কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইমাম ভ্রাতাদ্বয়ের কোন এক ঈদ্ পর্ব্বোপলক্ষে মাতামহের নিকট নূতন পোষাকের প্রার্থনা ও স্বর্গীয় দূত হজরত জীবরাইল আমিন্২ উভয় ভ্রাতার জন্ম স্বর্গ হইতে দুইটি পোষাক লইয়া মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হওয়া, এবং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় যে ভাবে সেই পোষাক৩ গ্রহণ করেন, কবি তাহারও আলোচনা করিয়াছেন৪। //

"জঙ্গনামা"র দ্বিতীয় অংশে, গ্রন্থকার যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এই বার আমরা তাহার একটু পরিচয় দিব। কবি মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী মরহুম, এই অংশে বলিয়াছেন যে, আবদুল জব্বর নামক এক ব্যক্তি আরবে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল বিবি জয়নাব। জয়নাব বিবি তৎকালীন আরব মহিলাদিগের মধ্যে পরমা সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক দিন কোন উপায়ে, মোয়াবিয়া-পুত্র এজীদ তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার রূপে মুগ্ধ হয়েন, এবং জয়নাব বিবিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জয়নাব বিবির স্বামী বর্ত্তমান থাকায়, এজীদের এই ইচ্ছা

আলী (কঃ) হজরত মোহাম্মদ (দঃ) দুহিতা ফাতেমা বিবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন, হজরত আলীর (কঃ) ঔরসে ও ফাতেমা খাতুনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। উমায়্যাবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা এজীদ, হজরত মোয়াবিয়ার পুত্র। হজরত মোয়াবিয়া, হজরতের অন্যতম প্রধান শিষ্য ও পার্শ্বচর ছিলেন।

২। আমিন, স্বর্গীয় দূত জীব্রাইলের উপাধি। হজরত মোহাম্মদেরও এই উপাধি ছিল। খোদাতায়ালা জীব্রাইলকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন, এবং আরবের—মক্কার অধিবাসিবৃন্দ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রচারিত ইসলামধর্ম্ম স্বীকার করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে এই উপাধি দান করিয়াছিলেন (হাদিস দ্রষ্টব্য)। আমিনের প্রকৃত অর্থ আমানতদার। কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিলে, তিনি যদি তাহার সদ্ব্যবহার করেন, অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন অপ্রকাশ্য কথা বলিলে, তিনি যদি তাহা প্রকাশ না করেন, অথবা কোন ব্যক্তির মারফৎ কাহারও নিকট কোন সংবাদ প্রেরণ করিলে, তিনি যদি সে সংবাদ অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত না করেন, তবেই তিনি 'আমিন' উপাধির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়েন।

৩। ঐতিহাসিক "ইব্নে হাবিব" লিখিয়াছেন যে, তিনি সত্যবাদী ও সাহসী হজরত আব্দর রহমানের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, "হজরত বলিয়াছিলেন, এক দিন কোন এক ঈদ পর্ব্ব উপলক্ষে, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় আমার নিকট নব বস্ত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু আমি আমার প্রিয়তম দৌহিত্রদ্বয়কে নব বস্ত্র দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারায়, ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া খোদা তায়ালাকে তাহা জানাই। পরমুহূর্ত্তেই স্বর্গীয় দূত জীব্রাইল, একটি লাল ও একটি নীল বর্ণের পোষাক লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়েন। ভ্রাতৃদ্বয় এই পোষাক দেখিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করেন, এবং জ্যেষ্ঠ ইমাম হাসান নীল ও কনিষ্ঠ ইমাম হোসায়েন লাল বর্ণের পোষাক গ্রহণ করেন। জীব্রাইল ইহা দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন যে, যখন আপনি, আপনার কন্যা, জামাতা, আবুবকর, উমর ও উস্মান, কেহই এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তখন মোয়াবিয়ার পুত্র এজীদ, জ্যেষ্ঠ ইমামকে বিষপ্রয়োগে, এবং কনিষ্ঠ ইমামকে কারবালার যুদ্ধে হত্যা করিবে।"

৪। "জঙ্গ-নামা"র বর্ণিত এই অংশের সহিত ইতিহাসের মিল আছে। তবে একটু অতিরঞ্জিত হইয়াছে মাত্র। //

কার্য্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে বাধা উপস্থিত হয়। পরন্তু জয়নাবের চিন্তাতে ক্রমেই এজীদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে থাকে। পুত্রের শরীরের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, এক দিন মোয়াবিয়া, এজীদকে নিকটে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এজীদ পিতার নিকট জয়নাবের কথা প্রকাশ করেন। পুত্রের মুখে এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া মোয়াবিয়া ক্রুদ্ধ হয়েন, এবং এজীদকে সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ করেন। এজীদ মাতার১ নিকট উপস্থিত হয়েন, এবং ক্রন্দন করিয়া সকল কথা মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করেন।/এজীদের মাতা খলিফা মোয়াবিয়াকে এজীদের সহায়তার জন্য অনুরোধ করেন, এবং তিনি ইহাও বলেন যে, আমার একমাত্র পুত্র এজীদের২ সহিত যদি আপনি যে কোন উপায়ে জয়নাবের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে এজীদ নিশ্চয়ই প্রাণে মারা যাইবে। খলিফা মোয়াবিয়া স্ত্রীর কথায় এজীদকে সাহায্য করিতে সম্মত হয়েন। স্থির হয় যে, এজীদ নিজেই নিজের সুবিধা

১। "জঙ্গ-নামা"র কবি পুস্তকের প্রথমাংশে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "যখন হজরত জীবরাইল স্বর্গ হইতে পোষাক আনিয়া, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে দিয়াছিলেন, এবং উভয় ইমাম যথাক্রমে লাল ও নীল বর্ণের পোষাক মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন, আর ইহার পর হজরত জীবরাইলকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া, হজরত যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ও হজরত জীবরাইল যখন যথার্থ কারণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখন এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, হজরত মোয়াবিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে কখনই বিবাহ করিবেন না। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এক দিন তিনি মূত্র ত্যাগের পর এক খণ্ড শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা 'কুলুফ' লইতেছিলেন, এবং সেই মৃত্তিকাখণ্ডের মধ্যে একটি বৃশ্চিক লুকায়িত ছিল; সেই বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করে। তিনি এই দংশনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েন। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আনয়ন করা হয়। চিকিৎসকেরা স্ত্রী-সঙ্গমই ইহার একমাত্র ঔষধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। প্রভু হজরত মোহাম্মদ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, মোয়াবিয়ার আবাসে যাইতেছিলেন। পথে জীবরাইল তাঁহাকে বলেন যে, আপনি মোয়াবিয়ার বিপদ্‌মুক্তির জন্য কোন প্রকার আশীর্ব্বাদ না করেন, ইহাই খোদাতায়ালার অভিপ্রায়। মোয়াবিয়াকে স্ত্রী-সহবাস করিতেই হইবে। প্রভু হজরত মোহাম্মদ (দং) মোয়াবিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া, স্ত্রী গ্রহণের জন্য উপদেশ দান করেন। তখন মোয়াবিয়া বলেন যে, "আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এমন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সন্ধান করা হউক, যাহার সন্তান-সম্ভাবনা নাই।" এইরূপ একটি বৃদ্ধাকে আনয়ন করিয়া, যথা-নিয়মে মোয়াবিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। কিন্তু প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি খোদার মর্জ্জিতে এক পরমা সুন্দরী ষোড়শী যুবতির আকার ধারণ করিয়াছে। সেই গর্ভে এজীদের জন্ম হয়।" কিন্তু ইতিহাস ইহার সত্যতা স্বীকার করে নাই। আল্ আমিন্ প্রভৃতি ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন যে, এজীদ এবং ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন সমবয়স্ক ছিলেন। খালিফা আবুবকর সিদ্দিকের পুত্র আব্দর রহমানের আত্ম-জীবনী পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্মের বহু পূর্ব্বে, মোয়াবিয়ার বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং এই গল্পটির মূলে যে কোন সত্য নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

২। আমির আলী প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিকদিগের মতে এজীদ ব্যতীত মোয়াবিয়ার আরও সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উমর্যাবংশীয় তৃতীয় খালিফা এজীদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু তিনি এজীদের ন্যায় ধর্ম্মদ্রোহী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিতেন।

করিয়া লইবেন, খলিফা তাহাতে বাধা প্রদান করিবেন না। এই প্রকার পরামর্শ স্থির হওয়ায়, এজীদ আবদুল্লা জব্বারকে, মোয়াবিয়ার নামের মোহরযুক্ত এক পত্র লিখেন। তাহাতে লিখিত হয় যে, "তুমি পত্র পাঠ দামাস্কে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" আবদুল্লা জব্বার এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া, দামস্কে উপস্থিত হয়েন, এবং খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করেন। খলিফা আবদুল্লা জব্বারকে বলেন যে, আমার এক মাত্র কন্যাকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি১। আবদুল্লা জব্বার, প্রথমে খলিফার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরে যখন তাঁহাকে মিসর প্রভৃতি দেশ বিবাহের যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইবে বলিয়া খলিফা মত প্রকাশ করেন, এবং নগদ কিছু আশরফীও দেন, তখন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, আবদুল্লা জব্বার এই বিবাহে সম্মত হয়েন। বিবাহের দিন স্থির হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে, আবদুল্লা জব্বার বরবেশে মজলিসে উপস্থিত হইলেন। কাজী মোল্লা আসিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। এজীদ 'য়্বকিল'২ হইলেন, দুই জন সাক্ষীও নির্দ্দিষ্ট হইল। এজীদ, এবং দুই জন সাক্ষী রাজকন্যার স্বীকারোক্তির জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, "বিবি বলিতেছেন, 'আমি শুনিয়াছি, আবদুল্লা জব্বারের এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী আছেন। আবদুল্লা জব্বার যে, তাঁহার অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল-বাসিবেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে যদি তিনি সেই স্ত্রীকে "তালাক" দিয়া আমাকে বিবাহ করেন, তবে আমি সম্মতি দান করিতে পারি।" আবদুল্লা জব্বার ইহা শুনিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। কিন্তু কিছু ক্ষণ চিন্তা করিয়া, ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে, জয়নাবকে তালাক দিলেন। তালাকের পর, এজীদ এই সুসংবাদ লইয়া, সাক্ষিদ্বয় সমভিব্যাহারে ভগিনীর অনুমতির জন্য পুনরায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং কিছু ক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,— "আমার ভগিনী আবদুল্লা জব্বারকে পতিত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তির লালসায় অমন রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যাকে অনায়াসে তালাক দিতে পারে, সে যে অপর কাহারও ধন-সম্পত্তির লালসায় আমাকে ত্যাগ করিবে না, যদি কখন আমার পিতা মিসরাদি দেশ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, তাহা হইলে যে তিনি আমাকে এই ভাবে ত্যাগ করিবেন না, তাহারই বা বিশ্বাস কি ?" অগত্যা বিবাহ হইল না। আবদুল্লা জব্বার ক্ষোভে, দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। জয়নাব বিবি স্বীয় পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। কয়েক দিন পরে, এজীদের পক্ষ হইতে জয়নাব বিবির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। সেই লোকের সহিত আক্কাস নামক এক

১। মোয়াবিয়ার কোন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন নাই। খলিফা মোয়াবিয়া, হজরত আলীর সহিত যে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত তিনি জীবনে অপর কোন গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তিনিই উমায়্যাবংশীয় খলিফাদিগের মধ্যে আদর্শ খলিফা ছিলেন। তাঁহার সময় ইউরোপের অনেক স্থানে মোস্‌লেম-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল।

২। য়্বকিল=উকিল। অধুনা সকলেই 'উকিল' উচ্চারণ করেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত উচ্চারণ 'য়্বকিল'।

ব্যক্তির পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইল। আব্বাস সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রথমে এজীদের কথা বলিয়া, আমার কথা বলিও। বিবি যে উত্তর দেন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহা আমাকে শুনাইয়া যাইও।" দূত আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর জ্যেষ্ঠ ইমাম মহাত্মা হাসানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিদ্বয়ের সহিত জয়নাব বিবির বিবাহের প্রস্তাব করিয়া শেষে আমার জন্য প্রস্তাব করিও। যদি তিনি সম্মত হয়েন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমাকে বলিয়া যাইও।" দূত যথাসময়ে জয়নাব বিবির নিকট উপস্থিত হইয়া পর পর তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করিল। তিনি সকল কথা শুনিয়া, ইমামকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন। যথাসময় মহাত্মা ইমাম হাসানের সহিত জয়নাব বিবির বিবাহ হইয়া গেল। এজীদ ইহা শ্রবণ করিয়া, মনে মনে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকিলেন। মোয়াবিয়ার মৃত্যু হইলে এজীদ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বিরোধ আরম্ভ করিয়া দিলেন১।

জঙ্গ-নামার দ্বিতীয় অংশে আর একটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই,—"জয়নাব বিবির জন্য যে "এজীদ-ইমামে" ভীষণ মনান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা খলিফা মোয়াবিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে২, রোগশয্যায় শায়িত থাকার কালে, ইমামের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, "পূর্ব্ব-সন্ধি অনুসারে আমি তোমাকে মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের খলিফা মনোনীত করিতেছি। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তুমি পত্রপাঠ এখানে আসিবে।" কিন্তু এই পত্র ইমামের নিকট পৌঁছে নাই। এজীদ কৌশল করিয়া এই পত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। খলিফা মোয়াবিয়া এই পত্র লিখার কয়েক দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, এবং এজীদ খলিফা হয়েন৩। খলিফা হইয়াই তিনি ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট ও অপরাপর অভিজাতবর্গের নিকট বশ্যতা স্বীকার

১। "জঙ্গ-নামা"য় বর্ণিত দ্বিতীয় অংশের এই গল্পটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। সমসাময়িক কোন ইতিহাসেই এই বিবরণটি স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল "মোক্তল-হোসেন", "শাহাদাৎ-নামা", "মাতম-হোসেন", "সহীদে-কারবালা" প্রভৃতি কয়েকখানি ফার্সী কাব্যে এই বিবরণটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে ইতিহাসে, ইমাম হাসানের জয়নাব নাম্নী এক স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বীরবর হজরত আলী(ক:)র জীবদ্দশায়, জয়নাব বিবির সহিত, ইমাম হাসানের বিবাহ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় জয়নাব বিবির সহিত বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, এবং আততায়ীর হস্তে হজরত আলীর মৃত্যু হওয়ার পর এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল।

২। "জঙ্গ-নামা"য় উল্লিখিত হইয়াছে যে, "খেলাফৎ" লইয়া হজরৎ আলীর সহিত হজরত মোয়াবিয়ার যে যুদ্ধ হয়, তাহা পরে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। সন্ধিপত্রে ইহা লিখিত হইয়াছিল যে, মোয়াবিয়া মৃত্যুকালে ইমাম হাসানকে খালিফা মনোনীত করিবেন। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ নাই।

৩। খালিফা মোয়াবিয়া মৃত্যুকালে এজীদকে খালিফা মনোনীত করিয়াছিলেন। 'ইব্‌নে হাবিব,' 'আব্দর রহমান,' 'আল্ আমির' প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

করিয়া বয়েত১ হইবার জন্য পত্র লিখেন। অনেকেই সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন। কিন্তু ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় এজীদের হস্তে বয়েত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হয়েন। ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের এই প্রকার আচরণে, এজীদ নিজেকে অপমানিত বলিয়া মনে করেন, এবং ছলে বলে কৌশলে ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ফলে, বিষপ্রয়োগে ও কারবালার যুদ্ধে ইমামদ্বয়কে নিহত করা হয়২।

"জঙ্গ-নামা"র তৃতীয় অংশে লিখিত হইয়াছে যে, কারবালার যুদ্ধের অবসান হইলে পর, যখন ইমাম হোসায়েনের পরিবারবর্গকে দামাস্কে সহরে লইয়া গিয়া, কারাগারে আবদ্ধ করা হয়, তখন আম্বাজের অধীশ্বর, মোহাম্মদ হানিফা নামক ইমামের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, এজীদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী মোহাম্মদ হানিফাকে জয়মাল্য প্রদান করেন, এবং ইমামের পরিবারবর্গ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন। জয়নাল আবেদীন৩ মদিনায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া খেলাফতি করিতে থাকেন৪।

১। কোন ব্যক্তিকে পার্থিব ও ধর্ম্মকার্য্যে শ্রেষ্ঠ জানিয়া, নতজানু হইয়া উপবেশন করিয়া, তাঁহার হস্তে হস্ত প্রদান করতঃ তাঁহাকে উপদেষ্টা বা গুরু বলিয়া স্বীকার করা ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাকে 'বয়েত' বলে। এজীদ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের অনুশাসন মান্য করিয়া চলিতেন না, এবং তিনি মহাপুরুষের শিক্ষা মত সাধারণ মুসলমান কর্ত্তৃক খালিফা নির্ব্বাচিত হয়েন নাই। সুতরাং ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার হস্তে বয়েত হওয়া ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই।

২। এই বয়েতের বিবরণটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। এই বয়েতের ব্যাপার লইয়াই যে, কারবালার মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। এজীদ দাম্ভিক ও ক্ষমতাপ্রয়াসী ছিলেন। আধিপত্য করাকেই তিনি অধিকতর পছন্দ করিতেন।

৩। মহাত্মা ইমাম হাসানের পুত্র। ইনি কারবালার যুদ্ধের সময় অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন বলিয়া, যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়েন নাই। ইঁহারই বংশধরেরা পরে "ফাতে মাইদ খলিফা" নামে মিসরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৪। "জঙ্গ-নামার" আম্বাজ সহরের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটি গল্প মাত্র। ইতিহাসে আম্বাজ সহরের কোনই নামোল্লেখ নাই। মহাত্মা হজরত আলী(কঃ), প্রভুকন্যা বিবি ফাতেমা খাতুনের জীবদ্দশায় অপর কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করেন নাই। ফাতেমা বিবির মৃত্যুর পর, তিনি আব্বাসীয়াবংশীয় এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার নামোল্লেখ নাই। সেই মহিলার গর্ভে একমাত্র সন্তান মোহাম্মদ হানিফার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু জীবনে তিনি কোন দিন তরবারি স্পর্শ করেন নাই। কেবল ধর্ম্মালোচনাতেই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কারবালার যুদ্ধের পর, কয়েক জন ধর্ম্মপরায়ণ ও ইমাম-ভক্ত ব্যক্তি, এজীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করেন, এবং তাঁহারাই কারাগার হইতে ইমাম-পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জঙ্গ-নামা-প্রণেতা বলিয়াছেন, হানিফার মাতার নাম হনুফা বিবি ছিল। ইহা যে কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। জঙ্গ-নামায়, মোসেব কাকা, কাকা মোসেব, উম্মর আলী প্রভৃতি যে সকল বীর ও রাজন্যবর্গের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিহাসে তাঁহাদেরও কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহা ব্যতীত, জয়নাল আবেদীন যে কোন দিন খালিফা হইয়াছিলেন, তাহারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

"জঙ্গ-নামা"য় বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাঠকবর্গকে দিলাম, এবং তন্মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহাও বলিলাম। এই বার আমরা "জঙ্গ-নামা"র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া রচনার সন-তারিখ ইত্যাদি নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব।

বটতলা, শিয়ালদহ ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে, মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে সকল পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, আমরা বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে তাহার অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। "জঙ্গ-নামা" নামক কাব্যখানিও বটতলা প্রভৃতি স্থানের ছাপাখানায় ছাপা হয় ও বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ১৩ কি ১৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমরা প্রথমে "জঙ্গ-নামা" কাব্যখানি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন তাহাতে গ্রন্থকারের বিশেষ কোন পরিচয় না পাইয়া, একটু দুঃখিত হইয়াছিলাম। ১৩২১ সালে যখন প্রথমে মুসলমানী সাহিত্যের অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন সর্ব্বপ্রথমে "জঙ্গ-নামা"র কথাই মনে পড়ে। তাই "জঙ্গ-নামা"র হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধানে, বঙ্গদেশের অনেক গ্রাম-পল্লী ভ্রমণ করি। অনেক বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিকে পত্রাদিও লিখি। যে স্থানে যে কোন প্রাচীন মুসলমানী পুথির সন্ধান পাইয়াছি, তথায় গমন করিয়া তাহা দর্শন করিয়াছি। এই ভাবে অনেক অনুসন্ধানের পর, বর্দ্ধমান জেলার রাইগ্রামে, এবং খুলনা জেলার বাঁশদহ ও ইস্মাইলকাটী নামক গ্রামদ্বয়ে, জীর্ণ-দশাগ্রস্ত হস্তলিখিত তিনখানি "জঙ্গ-নামা" পুথির লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুথি তিনখানি দেখিলে বোধ হয় উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তলিখিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহার একখানিতেও লিপিকরের নাম-ধাম ও লিপির সাল তারিখ লেখা নাই। রয়েল সাইজের আট-পেজ আকারের টুকরা টুকরা হস্তনির্ম্মিত তুলট কাগজে উহা লিখিত। পুথির পাতা মুসলমানী কায়দায় সাজান; দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে। হস্তাক্ষর বেশ বড় বড়। এক একটি অক্ষর প্রায় ½ ইঞ্চি বড় হইবে। রাই গ্রামে যে পুথিখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পত্রাঙ্ক ৩১০, ইস্মাইলকাটীতে প্রাপ্ত পুথির পত্রাঙ্ক ৪৮০ ও বাঁশদহ গ্রামে প্রাপ্ত পুথির পত্রাঙ্ক ৪৬০। তিনখানি পুথির বর্ণনাই একরূপ, কোন প্রকার পার্থক্য নাই, এবং এই পুথি তিনখানির হস্তাক্ষর পুরাতন ধরণের। এই তিনখানি পুথিরই শেষভাগে "সায়েরের পরিচয়" নামক একটি অংশ আছে, কিন্তু বটতলা প্রভৃতি স্থানে মুদ্রিত "জঙ্গ-নামা"য় এ অংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন্ সময় এবং কাহার কর্তৃক যে এই অংশটি প্রথমে পরিত্যক্ত হয়, তাহা জানা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, প্রথমে যে পুথির লিপি দৃষ্টে "জঙ্গ-নামা"র মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই পুথি হইতে কোন ক্রমে বোধ হয় এই অংশটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সেই হইতে এই "সায়েরের পরিচয়" অংশটি বাদ পড়িয়া আসিতেছে। আমরা, এই পুথি তিনখানির সহিত, মুদ্রিত "জঙ্গ-নামা" মিলাইয়া পাঠ করিয়াছি। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বিশ্বাস, কেবল প্রুফ দেখার দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সায়েরের পরিচয়টি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতেছি।

"সায়েরের পরিচয়।"

"জঙ্গ-নামার কথা ভাই সহদের সার।
খাদেম১ ইয়াকুব ভণে পরিচয় তার॥
বালিয়া মোকাম ভাই জীরিকপুরে ঘর।
বাপের নাম শাহ ছুন্দি২ দাদা মোজাফ্ফার॥
মুর্শিদ৩ বড়ে-খাঁ গাজী, মুরিদ৪ আমি তাঁর।
প্রথম দিদার৫ পাইনু, জঙ্গল মাঝার॥
চারি সহদর মোরা ভগিনী তিন জন।
পহেলা৬ সন্তান পিতার এই অভাজন॥
হামিদ শফিক আর নসিম ও করিম।
বহিন্৭ সাবেরা আর হাজেরা মরিয়ম॥
আপনার জনেরা সব যে যেখানে আছে।
আর যত আসিতেছে এ সকলের পাছে॥
দোওয়া৮ সবে কর ভাই যত মমিনান্৯।
এহি আর্জ্জি১০ পেশ১১ করে অধম ও নাদান্১২॥
বাঙ্গালার এগার শত এক সাল আর।
মাঘ মাসের জুমা বার১৩ সময় ফজর১৪॥
আল্লার মেহেরে১৫ আর নবিজীর তোফেলে১৬।
"জঙ্গ-নামা" সায় হ'ল ইয়াকুবেতে বলে॥
আল্লা আল্লা বল রে ভাই দিন ব'য়ে যায়॥
নাদান্ ইয়াকুব আলী সবাকারে কয়॥"

এই "সায়েরের পরিচয়" হইতে আমরা কবির নাম, তাঁহার পিতা ও পিতামহের নাম,

১। সেবক।

২। বসিরহাট অঞ্চলে শাহছুন্দি নামক ফকিরের অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কবি ইয়াকুব আলির পিতা কি না, তাহা জানা যায় না।

৩। গুরু, মুক্তির পথ-প্রদর্শক।

৪। মুরিদ—শিষ্য, ভক্ত।

৫। দিদার পাইনু—দর্শন লাভ করিনু।

৬। পহেলা—প্রথম।

৭। বহিন্—ভগ্নী।

৮। দোওয়া—আশীর্ব্বাদ।

৯। মমিনান্—ঈমানদার মুসলমানগণ, ধার্ম্মিক মুসলমান সকল।

১০। আর্জ্জি—দরখাস্ত, বর্ণনা-পত্র।

১১। পেশ—সম্মুখে উপস্থিত করাকে 'পেশ' করা বলে।

১২। নাদান্—নির্ব্বোধ, বোকা।

১৩। জুমা বার—শুক্রবার।

১৪। ফজর—প্রাতঃকাল।

১৫। আল্লার মেহেরে—আল্লার অনুগ্রহে।

১৬। নবিজীর তোফেলে—পয়গম্বর সাহেবের সু-দৃষ্টির ফলে।

এবং ভ্রাতা ভগিনীগণের নাম জানিতে পারিলাম। আর জানিতে পারিলাম যে, তিনি তাঁহার পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। বসিরহাট মহকুমার বালিয়া পরগণা, এবং সেই পরগণার মধ্যস্থিত জীরিকপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও সেইখানে বাড়ী-ঘর ছিল, তাহাও জানিতে পারিলাম১।

গ্রন্থকার প্রথমেই ঈশ্বর-বন্দনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"পহেলা বন্দিনু আল্লা পাক্-করতার।"

[অর্থাৎ "আমি এক, মহান্ ও পবিত্র আল্লাহ্ তায়ালাকে বন্দনা করিয়া, এই পুস্তক রচনা আরম্ভ করিতেছি।"] গ্রন্থকার তাহার পরই লিখিয়াছেন,—

"দ্বিতীয় বন্দিনু যত ফেরেশ্‌তা তাঁহার॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা জঙ্গ-নামায় আছে,—

"দুতিয়া বন্দিনু যত ফেরেশ্‌তা তাহার॥"

[অর্থাৎ সেই মহান্, পবিত্র, অনাদি ও অনন্ত আল্লাহ্ তায়ালার দূতদিগের বন্দনা করিতেছি।] গ্রন্থকার ইহার পরই কয়েক জন শ্রেষ্ঠ ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গীয় দূতের নাম করিয়াছেন। যথা,—

"জীব্রাইল্, মিকাইল্, আর ইস্রাফিল্।
সালাম করিয়া বন্দিনু আজরাইল্॥
আর যত ফেরেশ্‌তারা আছেন আল্লার।
একে একে সবাকারে সালাম আমার॥"

গ্রন্থকার, তৃতীয় বন্দনা করিয়াছেন,—সমস্ত নবী, রসুল, পয়গাম্বর ও স্বর্গীয় গ্রন্থের। যথা,—

"কেতাব আল্লার যত তৃতীয় বন্দিনু।
একে একে নবী ও রসুল যত পেনু॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"কেতাব আল্লার যত তৃতীয় বন্দিনু।
একে একে রসুল বন্দিনু যত পাইনু॥"

এই ভাবে বন্দনা সমাপ্ত করিয়া, কবি বলিয়াছেন,—

"রচিতে কবিতা যদি খাতা২ মোর হয়।
মেহের৩ করিয়া মাফ৪ করিবে সবায়॥

১। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, কবিবর ইয়াকুব আলী বিবাহ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদিগের বংশেও কেহ জীবিত নাই বলিয়া শুনা যায়। কবিবরের পিতৃবংশের কেহ জীবিত আছেন কি না, তাহার সন্ধান করা হইতেছে।

২। খাতা—অপরাধ, ত্রুটি। ৩। মেহের—অনুগ্রহ, দয়া। ৪। মাফ্—মার্জ্জনা, ক্ষমা।

রচনার ঝুঁট[১] সাচ্চা[২] আমি নাহি জানি।
আসল কেতাব যাঁর জানেন যে তিনি[৩]॥

কিন্তু বটতলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"রচিতে কবিতা যদি খাতা মুঝে হয়।
মেহের করিয়া মাফ করিবে সবায়॥
রচনের ঝুট সাচ্চা আমি নাহি ঠেকি।
কেতাব যেমন আছে তাহা আমি লিখি॥"

গ্রন্থকার আর এক স্থানে ইমাম-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

"ইমামের পদ আশে,
ফকির ইয়াকুব ভাসে,
যেই শুনে ইমামের মওত[৪]।
নরক আজাব[৫] তার,
কদাচ হবে না আর,
বেহেশ্‌তে পা'বে, শাহীদী মওত[৬]॥"

কবিবর, গ্রন্থের আরও কয়েক স্থানে তাঁহার মুর্শিদ ও পিতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত্[৭]।
বড়েখান্ গাজী যারে দিল মোলাকাত[৮]॥

*　　*　　*　　*

"বড়ে খাঁ গাজীর পায়,　　অধীন ফকির কয়,
কেতাবেতে খবর পাইয়া।
শাহ বড়েখান্ গাজী,　　নেক্‌কামে[৯] রহে রাজী[১০],
মেহের-নজরে[১১] তাকাইয়া॥"

১। ঝুঁট—মিথ্যা।　　২। সাচ্চা—সত্য।

৩। এই স্থানেই কবিবর বোধ হয়, "মোক্তল হোসেনে"র গ্রন্থকারকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিয়াছেন।

৪। মওত—মৃত্যু।　　৫। আজাব—যন্ত্রণা।

৬। শহীদী মওত—ধর্ম্মযুদ্ধে কিম্বা কোন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলে, তাহাকে "শহীদী" মৃত্যু বলে। এই প্রকার মৃত্যু ঘটিলে, মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বর্গবাসী হইবে। কোন প্রকার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। হজরত ইমাম হোসায়েন শহীদ্ হইয়াছিলেন। যিনি স্থিরচিত্তে তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ শ্রবণ করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, তিনিও শহীদী সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। কবিবরের বোধ হয়, ইহাই বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য।

৭। কেতাবের-বাত—কেতাবের কথা।　　৮। মোলাকাত—দর্শন।

৯। নেক কামে—মঙ্গল কার্য্যে, ধর্ম্ম কার্য্যে, উত্তম কার্য্যে।　　১০। রাজী—সন্তুষ্ট।

১১। মেহের নজর—স্ব-দৃষ্টি।

কিন্তু বটতলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"বড়েখান্ গাজীর পায়, অধীন ফকির কয়,
কেতাবেতে খবর পাইয়া।
শাহে বড়খান্ গাজী, নেক্কামে রহে রাজী,
মেহের নজরে তাকাইয়া॥"

"বাপ নাম শাহ-ছন্দি আল্লার ফকির১।
তাটিয়া সোল্তান্ গাজী বড়ে খাঁ২ পীর॥"

১। বোধ হয়, কবিবরের পিতাও একজন দরবেশ ছিলেন। আরও অনেক স্থানে এই ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন।

২। এই বড়ে খান্ গাজী যে কে তাহা আজিও জানা যায় নাই। কিংবদন্তীতে এইরূপ প্রকাশ যে, বঙ্গাধিপতি শাহ সেকান্দারের এক পুত্রের নাম মোহাম্মদ গাজী। তিনি ফকিরী গ্রহণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। উত্তরকালে তিনিই "বড়ে খান্ গাজী" নামে বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়াছিলেন। একজন "বড়ে খান্ গাজী" বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পীর বলিয়া পরিচিত। বিশেষতঃ দক্ষিণবঙ্গের ভাটী মুলুকে তাঁহার প্রবল প্রতাপ। শুনা যায়, আজিও নাকি 'বাদা' অঞ্চলে "বড়ে খান্ গাজীর" দোহাই দিলে, ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজিও এই জাগ্রত পীরের আস্তানার নির্দ্দেশ হয় নাই।

গোবরডাঙ্গার নিকট, চারঘাট নামক গ্রামে, মরা-যমুনা-তীরে, এক পীরের আস্তানা আছে। তাঁহার নাম শাহ ঠাকুরবর। পীরের সেবায়েৎদিগের নিকট শাহী আমলের যে সকল কাগজ-পত্র আছে, আমরা অনেক বার তাহা দেখিতে চাহিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা আজিও আমাদিগকে সে সকল কাগজ-পত্র দেখান নাই। কিংবদন্তীতে প্রকাশ যে, শাহ ঠাকুরবর, মহারাজ মুকুটেশ্বরের পুত্র। গাজী সাহেবের নিকট ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শাহ ঠাকুরবরের ভগ্নী চম্পাবতীর সহিত গাজী সাহেবের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, কিংবদন্তীতে প্রকাশ। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় "মাইচাম্পার দরগা" আছে বলিয়া শুনিয়াছি। সেখানেও কিংবদন্তীতে নাকি এইরূপ প্রকাশ যে, তিনি বড়ে খাঁ গাজী বা গাজী সাহেবের স্ত্রী। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

যাহা হউক, অতঃপর আমরা "জঙ্গ-নামা"র অপরাপর অংশের কিঞ্চিৎ পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইস্লাম ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাবিচারের দিন, প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ), তাঁহার কন্যা মহামাননীয়া হজরত বিবি ফাতেমাতোজ জোহরা ও জামাতা বীরবর মহাত্মা হজরত আলী, এবং দৌহিত্রদ্বয়—মহাত্মা হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসায়েন, সমস্ত পাপীদিগকে উদ্ধার করিবেন। সকলকে সঙ্গে না লইয়া ইঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন না। খোদা তায়ালার নিকট ইঁহারা বলিবেন, "আলী ও ইমাম ভ্রাতৃদ্বয়ের রক্তের বিনিময়ে, আমরা পাপীদিগকে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।" এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব। যদি সময় ও সুযোগ উপস্থিত হয়, এ সম্বন্ধে এক পৃথক্ প্রবন্ধের অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

"বড়ে খাঁ ভাবিয়া দেলে১,
অধীন ফকির বলে,
শাহ-দুন্দির পহেলা করজন্দ২।
কহেন বড়ে খাঁ গাজী
লায়েকেরে হয়ে রাজী,
তরে সেই, যার যেমন নিবন্ধ॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা পুস্তকে আছে,—

"বড়খান্ ভাবিয়া দেলে, অধীন ফকির বলে,
সাহা দুন্দির পহেলা করজন্দ।
কহেন বড়খান্ গাজী, লায়েকেরে হয়ে রাজী,
তরে জার যেমন নিবন্ধ॥"

জঙ্গ-নামার কবি যে, এজীদ-ইমামের বিরোধের বংশগত কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত আমরা তাহা কবির ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা,—

"পহেলার বাত কহি শুন ভাই যত।
এজীদ ইমাম বৈরী হ'ল যেই মত॥
চারি পুরুষ আগেতে আব্দুল মন্নাফ।
জমজ দু-বেটা তারে দিল বারী আপ্॥
হইল সে দুই বেটা পিঠে পিঠে জোড়া।
বহুত খেঁচিল৩ পিঠ না হইল ছাড়া॥
আবদুল মন্নাফ মর্দ্দ বুঝিয়া আখেরে।
মারিল শম্‌শের৪ খেঁচি পিঠের উপরে॥
দুই জন জুদা৫ হইল হুকুমে আল্লার।
হাশেম একের নাম শুনহ খবর॥
উম্মিয়া৬ দুয়ের নাম বড়ই আকিল্৭।
দুন্নুরে ওস্তাদ হৈল বড়া খোস দিল্॥
হাশেম, উম্মিয়া দোন জাঁহাবাজ৮ হৈল।
দু-জনে ঝগড়া আর কাটাকাটি ছিল॥

১। দেলে—অন্তরে। ২। করজন্দ—সন্তান। ৩। খেঁচিল—আকর্ষণ করিল, টানিল।
৪। শমশের—তরবারী, তলওয়ার। ৫। জুদা—পৃথক্।
৬। ইঁহারই বংশধরেরা উমায়্যা বংশীয় কোরেশ নামে খ্যাত। উমায়্যা বংশীয় খালিফারা ইঁহারই বংশধর।
৭। আকিল—বুদ্ধিমান্। ৮। জাঁহাবাজ—কূট-বুদ্ধিসম্পন্ন চালাক ব্যক্তিকে জাঁহাবাজ বলে।

হাশেমের বেটা ছিল আব্দুল মোতালিব।
বড়া নেক মর্দ্দ[১] ছিল আল্লার হবিব[২] ॥
উম্মিয়ার বেটা ছিল নামেতে হরব।
বড়া ধড়িবাজ ছিল আপনা গরজ ॥
মোতালিব হরবে জঙ্গ রাত দিন ছিল।
মোতালিবের বেটা আবু তালেব হইল ॥
হরবের বেটা হইল সুফিয়ান নাম।
আবু তালেবের সঙ্গে ঝগড়া মোদাম[৩] ॥
আবু তালেবের বেটা আলী জোরওয়ার[৪]।
সুফিয়ানের বেটা মোয়াবিয়া ইয়ার[৫] ॥
আলী আর মোয়াবিয়া ইয়ার দুজনে।
দোহেতে[৬] ঝগড়া ছিল পুসিদা[৭] বাতুনে[৮] ॥
রসুলের দাবে[৯] কেহ জাহের করিয়া।
না করিত ঝগড়া যে ছিল চুপ হৈয়া ॥
আলীর ফরজন্দ হৈল হাসান, হোসেন।
মোয়াবিয়ার বেটা হৈল এজীদ কমিন্ ॥
সেল্‌সেলা আইল এ্যায়সা ঝগড়া হইয়া।
ইমাম এজীদে জঙ্গ ইহার লাগিয়া ॥"

কিন্তু বটতলার পুস্তকে আছে,—

"এজীদ এমামে দোন ঝগড়ার বাত।
পহেলার বাত কহি হইল জ্যায়সা ভাত ॥
চারি পুরুষ আগে ছিল আবদুল্লা মন্নাফ।
জমক দু'বেটা তার দেখিলেন্ আপ্ ॥
*   *   *   *
আব্দুল মন্নাফ মর্দ্দ বুঝিয়া আখেরে।
মারিল সমসের তার পিঠের উপরে ॥" ইত্যাদি।

"জঙ্গ-নামা"র কবি, ইমাম-এজীদে বিরোধের স্ত্রীলোক-ঘটিত যে কারণের উল্লেখ

১। নেক-মর্দ্দ—ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। ২। হবিব—প্রিয়, বন্ধু।
৩। মোদাম সর্ব্বদাই, সকল সময়। ৪। জোরওয়ার—বলবান্, শক্তিশালী।
৫। ইয়ার—সহচর, পার্শ্বচর। ৬। দোহেতে—দুজনাতে, দুই জনে। ৭। পুশিদা—গুপ্তভাবে।
৮। বাতুনে—লুকান অবস্থায়। ৯। রসুলের দাবে—রসুলের ভয়ে।

করিয়াছেন, কবির ভাষায় তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। খলিফা মোয়াবিয়া, এজীদকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"তুমি বটে বেটা মোর এক জাহানেতে১।
তুমি বিনা বেটা বেটী নাহি দুনিয়াতে॥
যে কিছু মনের কথা কহনা আমারে।
হাসেল২ করিয়া দিব আল্লা যদি করে॥"

উত্তরে এজীদ বলিতেছেন,—

* * * * *

আলম্পানা৩ সালামত৪ কহি যনাবেতে৫॥
মনেতে যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই।
তবে আমি কহি যদি জীউ-আম্মা৬ পাই॥
জব্বারের বিবি৭ জয়নাব তার নাম্।
অতিশয় গুণবতী রূপে অনুপম্॥
এক রোজ তাহাকে যে দেখিয়া নজরে।
ছটফট করে জীউ নাহি রহে ধড়ে॥
শয়নে আরাম নাই ক্ষুধা নাই পেটে।
না দেখিয়া বিবিকে যে জীউ মোর ফাটে॥
তাহাকে করিতে নিকাহ্৮ মোর সাদ্।
তোমার হুকুম৯ হইলে, নহে পরমাদ॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা জঙ্গ-নামায় আছে,—

"মনেতে যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই।
তবে যদি কহি আগে জীউ-আম্মা পাই॥
জব্বরের কবিলা জয়নাব তার নাম।
অতিশয় রূপবতী গুণে অনুপাম॥" ইত্যাদি।

১। জাহানেতে—পৃথিবীতে, দুনিয়ায়।
২। হাসেল—সম্পূর্ণ, ইচ্ছা পূর্ণ।
৩। আলম্পানা—পৃথিবীর রক্ষক।
৪। সালামত—স্থায়ী হউক।
৫। যনাবেতে—হুজুরের নিকট।
৬। জীউ-আম্মা—প্রাণ ভিক্ষা।
৭। বিবি—স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, সুন্দরী, ধর্ম্মপরায়ণা।
৮। নিকাহ্—বিবাহের ফার্সী নাম 'নিকাহ'। আরবী ভাষায় বিবাহকে 'আকদ্' বলে। বিধবা অথবা তালাকী স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহকে যাঁহারা 'নিকাহ' ও কুমারী কন্যা বা যুবতীর সহিত বিবাহকে যাঁহারা বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।
৯। হুকুম—আদেশ, অনুমতি।

খলিফা মোয়াবিয়ার আহ্বানে, আবদুল্লা জব্বার দামাস্কে উপস্থিত হইলে, খলিফা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত কবির ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

"বলিল তোমাকে আমি ডাকি এথাতিরে১।
মোর এক বেটী আছে সুঁপিব২ তোমারে॥
দেহাজ করিব৩ তুঝে মেসের সহর।
এক লাখ দিব তুঝে৪ সোণার মোহর॥"

এজীদের কৌশলে ও প্রলোভনে আবদুল্লা জব্বার সম্মত হইলেন। বিবাহের সময়, এজীদ 'বকিল'-বেশে ভগিনীর সম্মতি আনয়ন করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—

"কহিতে লাগিল আসি সভার হুজুরে।
কবুল না কৈল বিবি আব্দুল্লা জব্বারে॥
বিবি বলে শুনিয়াছি এই সমাচার।
পরম সুন্দরী বিবি ঘরে আছে তার॥
হেন রূপবতী ছেড়ে সে কেন আমারে।
মোহাব্বাত৫ করিবেক দেলের৬ ভিতরে॥
যদি সে তালাক দিয়া ছাড়ে সেই বিবি।
তবে ত কবুল আমি করিব সেতাবী৭॥"

তালাকের পর এজীদ পুনরায় যাহা বলিলেন, কবি এই ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

* * * *

ঘড়ি এক বাদে আসি আবদুল্লাকে বলে॥
না করে কবুল তুঝে৮ শুনহ জব্বার।
এই কথা শুনি বিবি হইল বেজার৯॥
মক্কারা বলিয়া তুঝে১০ বিবি যে কহিল।
মাল মুল্লুকের লোভে জয়নাবে ছাড়িল॥
বেলাত মেসের, শাম পাইয়া আমারে।
লায়েক আওরত১১ যে ছাড়িয়া নেকা করে॥

১। এথাতিরে—এ জন্য, এ কারণ। ২। সুঁপিব—সমর্পণ করিব, তোমার সহিত বিবাহ দিব। ৩। দেহাজ করিব—যৌতুক দিব। ৪। তুঝে—তোমাকে। ৫। মোহাব্বাত—প্রণয়ের ভালবাসা। ৬। দেলের—অন্তরের, হৃদয়ের। ৭। সেতাবী—শীঘ্র, অনতিবিলম্বে। ৮। তুঝে—তোমাকে। ৯। বেজার—অসন্তোষ, দুঃখিত। ১০। তুঝে—তোমাকে। ১১। আওরত—স্ত্রীলোক, পত্নী।

কদাচিত যদি বাবা মুল্লুক ছাড়ায়।
এসাই[১] তালাক দিয়া ছাড়িবে আমায়॥
এমন মক্কারা লোকে কেবা কোথা চায়।
শুনিয়া তামাম[২] লোক করে হায় হায়॥"

এজীদের দূত যখন জয়নাব বিবির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য যাইতেছিল, তখন পথিমধ্যে আব্বাস নামক এক জন ভদ্রলোকের সহিত দূতের সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতে, আব্বাস দূতকে যাহা বলিয়াছিলেন, কবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আব্বাস কহিল তবে করি মেহেরবাণী।
আমার পয়গাম[৩] লিয়া জাহনা আপনি॥
এজীদের খবর আগে কহিয়া বিবিকে।
পশ্চাতে খবর মোর কহিবে তাঁহাকে॥"

দূতপ্রবর মুসা আসারী আব্বাসের নিকট বিদায় লইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, মহাত্মা ইমাম হাসানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং হাসান দূতকে যাহা বলিয়াছিলেন, কবি তাহার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"কত দূর গিয়া দেখা ইমামের সাথে।
হাসান্ নরমে বাত লাগিল পুছিতে॥
অনেক দিন পরে দেখা হইল মুসা ভাই।
কোথায় চলিয়াছ তুমি খুসিতে এসাই॥

ইহা শুনিয়া দূত সকল কথা প্রকাশ করিয়া কহিল, এবং মহাত্মা হাসান্ ইহা শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন,—

"শুনিয়া হাসান্ শাহ লাগিল কহিতে।
কহিবে পয়গাম মোর তাহার পিছেতে॥

এজীদ খলিফা হইয়া, মোস্লেম-সাম্রাজ্যের সকল প্রধানগণকে যে আদেশ-পত্র লিখিয়াছিলেন, "জঙ্গ-নামা"র কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

"মুল্লুকে মুল্লুকে দিল ভেজিয়া পরওয়ানা[৪]।
আমি এবে হইনু বাদশা পাঠাও খাজানা॥
সকল মুল্লুকের বাদশা ডরে ডরাইয়া।
খাজানা ও নজরাণা সবে দিলেক ভেজিয়া॥

১। এসাই—এই প্রকার। ২। তামাম—সমস্ত।
৩। পয়গাম—সম্বন্ধ। ৪। পরওয়ানা—সংবাদ, বিজ্ঞাপন, আদেশ।

মদিনা সহরেও এক লিখিল ফরমান১।
লেখা নাহি যায় সেই না-ফরমানী২ বয়ান্ ॥
লিখিল হাসান শাহে আর ইমাম হোসেনে।
আব্দুল্লা উম্মর আর আব্দুল রহমানে ॥
লিখিল লিখনে এইরূপ হকিকত শক্ত।
মাবিয়ার মৃত্যু হইল মিলিল মোরে তক্ত ॥
সকল মুল্লুক এখন হইল যে আমার।
বয়েত হৈল মোর হাতে সাহেব সর্দ্দার ॥
এবে এই লিখন যে লিখি তোমা বরাবর।
বাদশাই হুকুমকে দেলে জান মাতব্বর৩ ॥
আসিয়া এবে আমার সাতে করহ সাক্ষাৎ।
না আসিলে যে ফল পাইবে জানিবে পশ্চাৎ ॥
যে জনা নাহিক আমার হইবে অনুগত।
মোর ক্রোধে হবে সেই বড়ই লাঞ্ছিত ॥
তক্তের৪ উপরে বাদশা হৈয়াছি আমি।
এবে দুই ভাই মুঝে দেহ যে সালামী ॥
এবে মেরা নামে খোতবা পড়হ দুই ভাই।
মক্কা ও মদিনা লইয়া করহ বাদশাই ॥"

এই পত্র যথাসময় মদিনায় পৌঁছিলে, মদিনার প্রধানগণ পত্র পাঠ করিয়া যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন :

'ভাল'ত কমজাত৫ হেন পাইল বাদশাই।
আমাদের উপরে লিখে লিখন এ্যায়সাই।
আব্দুল্লা-উমর বলে গোস্বা দিল হইয়া।
এজীদ কমজাত বুঝিবা শরাব৬ খাইয়া ॥
আমাদের নিকটেতে লিখে এমন লিখন।
শুনিয়া বলেন তবে ইমাম ও হোসায়েন ॥
এতেক যে দেমাগ্ হইল লেউণ্ডি৭ বাচ্চার।
এমন লিখন লিখে সেহ নাহি করি ডর ॥

১। ফরমান—আদেশ-পত্র, হুকুমনামা।

২। না-ফরমানী—প্রভুর আদেশ অগ্রাহ্য করাকে না-ফরমানী বলে।

৩। মাতব্বর—শ্রেষ্ঠ, বড়। ৪। তখ্তের—রাজসিংহাসনের। ৫। কম্জাত—নীচবংশজাত।

৬। শরাব—সুরা, মদ্। ৭। লেউণ্ডি—বাঁদি।

এত বলি মদিনাবাসী সকলে ডাকিয়া।
শুনাইলেন সবাকারে লিখন পড়িয়া॥
হোসায়েন বলেন তবে শুন ভাই সব।
মালুম করিলে সবে এজীদা মতলব॥
নানা যে মোর নূর নবী হবিব খোদার।
আলী শাহা বাপ মোর ছুনিয়া সর্দার॥
মোয়াবিয়ার বেটা যে এজীদ তার নাম।
আউওল আখের মোর নানার১ গোলাম॥
কমজাত মোদেরে আজি ভেজিল লিখন।
ইহার মসলত আমি করিব কেমন?
কি প্রকারে থাকিব মোরা এজীদের তাবে?
বিবেচনা করি তোমরা কহ ভাই সবে।
জোড় হস্তে কহেন সবে শুনহে ইমাম।
বিচার নাহিক কোথা সাহেব ও গোলাম?
আপনি যাবেন সেথা হইয়া তাবেদার।
তোমাদের হুজুরেতে এজীদ কোন ছার?
বাপ যার খেদমতে২ আছিল হামেহাল৩।
তোমাকে খেদমতে চাহে তাহার ছাওয়াল?
জেনা-কার৪ হারামজাদা সেই ত মাতাল।
পাইলে তাহারে মোরা চড়ায়ে ভাঙ্গি গাল॥"

এজীদের ষড়যন্ত্রে যখন মহাত্মা ইমাম হাসান্ জলের সহিত হীরকচূর্ণ পান করিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া হোসায়েনকে ডাকিতে বলিলেন, কবি সেই সময়ের যে করুণ রসের বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গকে তাহার কিঞ্চিৎ উপহার দিতেছি।

"শুন রে কাসেম আলী,　　সেতাবি৫ যাহনা চলি
　　হোসেনকে আনহ ডাকিয়া।
ভাইকে বলিবে তবে,　　হাসেন বিদায় হবে,
　　কেয়ামত৬ সফর৭ লাগিয়া॥
কান্দিয়া কাসেম চলে,　　ভিজিল আঁখির জলে
　　শুনিয়া বাপের এই কথা।

১। নানার—মাতামহের, দাদামহাশয়ের।
২। খেদমত—সেবা, আজ্ঞা পালন।
৩। হামেহাল—সদাসর্ব্বদা।
৪। জেনাকার—পরদারগমনকারীকে 'জেনাকার' বলে।
৫। সেতাবি—শীঘ্র।
৬। কেয়ামত—মহাবিচারের দিন।
৭। সফর—বিদেশ গমন, স্থানান্তরে গমন।

খোকেতে ফাটিল ছাতি, যেন কাঁকুড়ের ভাতি,
আইল হোসেন রহে যেথা ॥
হোসেন কাসেমে দেখে, মন্দা-মন্দা১ হাসি মুখে,
ভাতিজাকে২ করেন মস্কারি।
সবক৩ পড়িতে বুঝি, করিয়াছ দাগাবাজী,৪
বেজার৫ করেছে চড় মারি ?
হাত দিয়া ছাতি পরে, কাসেম আরোজ৬ করে,
চাচা৭ জান্ শুন মেরা বাত।
ইমাম-হাসান-আলী, সফর করিবে বলি,
বিদায় হইবে তেরা সাথ ॥
দু-আঁখি হয়েছে লাল, মুখেতে ভাঙ্গিছে লাল,
কহিলেন ভায়ে আন গিয়া।
দেখ আসি চাচা মেরা, এতীম৮ হইনু মোরা,
বাবাজান্ চলিল ছাড়িয়া ॥
হোসেন এ কথা শুনে, আসিলেন ততক্ষণে,
সের-পাঁও৯ লাঙ্গা১০ যে করিয়া।
দেখেন ভায়ের তরে, হেঁট-সেরে১১ কয় করে,
কলেজা ছেদিছে বিষ্ গিয়া ॥
দেখিয়া হোসেন শাহা, মুখে বলে আহা আহা,
হায় হায় করে খাড়া১২ হৈয়া।
কহে শুন ভাই-জান্, জহর কে দিল কন্,
কহ দেই সের উড়াইয়া ॥
হাসান কহেন শুন, খোদার হুকুম মান,
তাহার কলম১৩ এই মত।
কবুল১৪ করহ ভাই, তবে কিছু সমঝাই১৫
শুটিকত বুঝে নসিহত১৬ ॥

১। মন্দা-মন্দা—মৃদু মৃদু। ২। ভাতিজা—ভ্রাতুষ্পুত্র। ৩। সবক—পাঠ।
৪। দাগাবাজী—প্রবঞ্চনা। ৫। বেজার—দুঃখ দেওয়া, অসন্তোষ করা।
৬। আরোজ—প্রার্থনা, নিবেদন। ৭। চাচা—পিতৃব্য, পিতার ভ্রাতা।
৮। এতীম—পিতৃহীন্। ৯। সের-পাঁও—আপাদ মস্তক। ১০। লাঙ্গা—অনাবৃত।
১১। হেঁটু-সেরে—নত মস্তকে। ১২। খাড়া—দাঁড়ান। ১৩। কলম—অদৃষ্টের লেখা।
১৪। কবুল—স্বীকার। ১৫। সমঝাই—বুঝাই। ১৬। নসিহত—উপদেশ।

পিইতে[১] জহর[২] মোরে, যে জন দিলেন তারে,
কিছু না বলিবে ভাই তুমি।
খোদার করম পর, চারা নাই বেরাদর,
কার পরে দিব দোষ আমি?
কহি বাত্ তার পরে, মেরা লাড়কার[৩] তরে,
মেহের[৪] যে করিবে জেয়াদা[৫]।
আপনা ছাওালে হেন, পেয়ার[৬] করিবা জান,
কদাচিত না বুঝিবা জুদা[৭]॥
যাহার মা-বাপ আছে, জাইয়া তাহার কাছে,
আফ্‌সোসের[৮] দম নাহি ফেলে।
থাকিলে আমার বাপ, পিয়ার করিত আপ্‌
হেন যেন কভু নাহি বলে॥
দুস্‌রা কহিবে ভাই, শুনহ মেহের হই,
দফন করিবে যেই ক্ষিতে।
নবীর রওজা[৯] টেরে, দমন করিবে মোরে,
এই বাত রাখিবে যে চিতে॥
গোর দিয়া মোর তরে, কহিবে যে নানাজীরে,
যেন সে রহম করে নবী।
গোরের বরকত মোরে, যেন তিনি আতা করে[১০],
তবে মেরা মউতের খুবি॥
দোস্ত[১১] দুশ্‌মনের[১২] সাথে, না থাকিবে আদাওতে[১৩]
সবাকার নেকুই[১৪] চাহিবে।
বেটা বেটী আগুলিয়া, গরীব এতীম হৈয়া,
দুনিয়াতে আপনি থাকিবে॥
কদ্‌বানু[১৫] যে জহর, দিল মোরে বেরাদর,
কিছু না বলিবে তরেতার।

১। পিইতে—পান করিতে। ২। জহর—বিষ। ৩। লাড়কা—পুত্র। ৪। মেহের—অনুগ্রহ। ৫। জেয়াদা—অধিক। ৬। পেয়ার—স্নেহ। ৭। জুদা—পৃথক্। ৮। আফসোষ—আক্ষেপ। ৯। রওজা—পয়গম্বর, নবী, রসুল ও সিদ্ধপুরুষদিগের কবরের নাম রওজা। ১০। আতা করা—দান করা। ১১। দোস্ত—মিত্র, সুহৃদ্। ১২। দুশ্‌মন—শত্রু। ১৩। আদাওয়াৎ—বিরোধ। ১৪। নেকুই—মঙ্গল। ১৫। কদ্‌বানু—মহাত্মা হাসানের ভার্য্যা।

ছুশমনের হিকমতে১, জহর দিয়াছে পিতে,
কিছু দোষ না আছে তাহার ॥
কান্দিয়া হাসান বলে, বারেক আইস কোলে,
বিদায় হইনু তোমা হৈতে।
হোসেন শুনিয়া শোকে, গলে গলে মুখে মুখে,
ধরি দোন লাগিল কান্দিতে ॥
এগানা২ জতেক আর, সাত'শ মহিলা আর,
কান্দিয়া করেন সবে সোর।
নাহি জানি কোন চারা, যেমন পাগল পারা,
সবে বলে কি হইল মোর ॥
ইমাম হাসান তবে, দেখিয়া লাড়কা সবে,
কান্দিয়া হইল জার জার৩।
আঁখেতে৪ পড়িছে পাণি, ডাকিছে মধুর বাণী,
আইস কোলে করি একবার ॥
ইলাহির চাহা হৈলে, আর না করিব কোলে,
আইস জাহ্ মিটাইয়া সাধ।
এত বলি শিশুগণে, কোলে করি জনে জনে,
কাঁদে ইমাম ভাবিয়া বিষাদ ॥"

কারবালার ময়দানে কয়েক দিন জল অভাবে যখন হোসায়নের ছয় মাসের শিশু পুত্র মরণাপন্ন হইল, তখন সহরবানু প্রভৃতি তাঁবুর মধ্যে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় মহাত্মা হোসায়েন তাঁবুর বাহিরে ছিলেন। তিনি ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ করিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া, পত্নী সহর বানুকে কহিলেন,—

"সহর বানুকে বলে গোশ্বা দেল হইয়া।
সোর-সার৫ বল এই কিসের লাগিয়া ॥
বিবি কহেন গোশ্বা৬ তুমি হইলে কেমনে।
কলেজা শুখায়ে জায় সবার পাণি বিনে ॥
স্তন্ হইতে দুধ মোর গেল শুখাইয়া।
ছাওয়াল আজেজ৭ হৈল দুধ না পাইয়া ॥
থোড়াই যে আনিয়া পাণি দাও এই বেলা।
বারেক যে পিইয়া পাণি তর করি গলা ॥

১। হেকমতে—শঠতায়। ২। এগানা—আত্মীয়।
৩। জারজার—আকুল ও ব্যাকুল। ৪। আঁখেতে—চক্ষে। ৫। সোর-সার—গোলমাল।
৬। গোষা—রাগ, ক্রোধ। ৭। আজেজ—অস্থির।

হোসায়েন কহেন সব মোনাফেক[১] গণ।
চাহিলেও আমাকে পানি না দিবে কখন ॥
এত দিন কেহ মোরে মোনাফেক হইতে।
দেখিয়াছ কি কোন চিজ্ কখন চাহিতে?
কুফর কম্‌জাত পাণি দিবে যে আমারে।
এতবার[২] কাহার কথায় হৈল তোমারে॥
বিবি কহেন যেরূপে আনিতে পার পাণি।
না আনিলে পেয়ারা[৩] মোর মরিবে এখনি॥
কান্দিয়া যে কহেন বিবি ইমামের পায়।
পাণি বিনা আমার ছাওয়াল মারা যায়॥
এক বিন্দু পাণি বিনা ছাওয়াল হয় খুন্।
হায় হায় মারা যায় যে মোর প্রাণধন॥"

ইহা শুনিয়া, মহাত্মা হোসায়েন সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, অশ্বারোহণে এজীদ-সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"শুন রে কাফের সব বেহায়া অধম।
কিছু নাহি কর মনে আখের শরম॥
খোদাকে পছন্দ নহে কহিযে তোমায়।
আখেরে খারাব হবে নাহি কিছু ভয়?
আলীর ফরজন্দ ও রসুলের নাতি।
ফতেমা আমার মাতা জান খুব ভাতি॥
খোদিজা, আয়েশা, সোলেমা মোর নানি[৪]।
তা সবার মুখ চাহি দেহ থোড়া[৫] পানি॥
গোনা[৬] যদি হৈয়া থাকে আমার হইতে।
আমাকে না দেহ পানি শুন কহি ইতে॥
না করিল গুণা খাতা লাড়কা আমার।
থোড়া পাণি দেহ ভাই ওয়াস্তে খোদার॥
দুধের ছাওাল মোর হারায় পরাণ।
মেহের[৭] করিয়া তার জীউ দেহ দান॥
বে-গুণা সকলে কেন মার শুখাইয়া।
আখেরে পুছিবে আল্লা ইহার লাগিয়া॥
কাফের সকলে কহে শুন হে ইমাম।
তুমি যে হোসেন মোরা চিনিনু তামাম॥
যে দিন তোমার কাছে করিব চাকরী।
সে দিন করিব মোরা তেরা তাঁবেদারী॥[৮]

১। মোনাফেক—অবিশ্বাসী, ধর্মে আস্থাহীন। ২। এতবার—বিশ্বাস, প্রত্যয়।
৩। পেয়ারা—প্রিয়। ৪। নানি—মাতামহী। ৫। থোড়া—অল্প।
৬। গোনা—অপরাধ, পাপ। ৭। মেহের—অনুগ্রহ। ৮। তাবেদারী—আজ্ঞাপালন।

আজি তেরা বাত্ মোরা নাহিক শুনিব।
হৈলে আজেজ কাতরা পাণি নাহি দিব ॥"

ইহা বলিয়া এজীদের সৈন্যগণ মহাত্মা হোসায়েনের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল, কবি নিম্নলিখিতরূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"শুনিয়া কাফের গিধি গোস্বায় অস্থির।
হোসেনের পরে খেঁচে মারিলেক তির।
হোসেনের কোলেতে যে ছাওাল আছিল।
হোসেনে না লাগি তির ছাওালে লাগিল ॥"

তীর শিশুর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল; শিশু তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আর হোসেন—পুত্র-শোকাতুর হোসেন—সেই মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁবুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও শিশুর গর্ভধারিণীকে কহিলেন,—

"মোর্দ্দার ছাওালে লিয়া ফিরিয়া আইল।
সহর বানুর কোলে ছাওয়ালেরে দিল ॥
কহেন ভেস্তের১ পাণি আমি খাওাইয়া।
আনিনু ছাওালে এই আসুদা২ করিয়া ॥"

কিন্তু বটতলার ছাপা জঙ্গ-নামায় নিম্নলিখিতরূপ আছে, যথা—

"মোর্দ্দার ছাওয়াল নিয়া ফিরিয়া আইল।
শহর-বানু৩ কোলে ছাওয়াল এনে দিল ॥
কহেন ভেস্তের পানি আমি খাওয়াইয়া।
আনিনু ছাওয়াল এই আসুদা করিয়া ॥"

অতঃপর কারবালা প্রান্তরে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাত্মা ইমাম হোসায়েনের আব্দল ওহাব নামক জনৈক পার্শ্বচর করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "এজীদ-সৈন্য নদীর জল বন্ধ করিয়াছে; জলের অভাবে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। আপনি আদেশ করুন, আমি শত্রু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বে জল লইয়া আসিতেছি।" মহাত্মা ইমাম তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন, তিনি শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া প্রথমে কহিলেন,—

"রসুল-আওলাদ মরে না-হক্৪ পানি বিনে।
আখেরেতে খারাব হ'বে কেয়ামতের দিনে ॥
আখেরের৫ ভালাই যদি চাহ রে কমজাত।
পানির পথ যে ছাড়ি দেহ কহিতেছি বাত্ ॥"

বটতলার ছাপা পুস্তকে প্রথম দুইটি পদ নিম্নলিখিতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ দুইটি পদের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। যথা—

১। ভেস্ত অশুদ্ধ কথা, 'বেহেশ্ত' শুদ্ধ। ২। আসুদা—প্রাণারাম।
৩। শহর-বানু—ইমাম হোসায়েনের স্ত্রী। ৪। না-হক্—অনর্থক। ৫। আখেরের—পরকালের।

"রসুল আওলাদ মরে নাহিক পানি বিনে।
আখেরে খারাব হবে হেসাবের দিনে॥"

এজীদ-সৈন্য আব্দল ওহাবের এই উক্তির মৌখিক কোন উত্তর দিল না; তরবারির দ্বারা আঘাত করিল। কিন্তু বহুসংখ্যক এজীদ-সৈন্য, ওহাবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। অবশেষে আব্দল ওহাব নিহত হইলেন। আব্দল ওহাবের পর ইমামের আরও কয়েক জন আত্মীয় ও পার্শ্বচর একে একে যুদ্ধে গমন করিলেন এবং সকলেই নিহত হইলেন। জঙ্গ-নামার কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"এইরূপে ছিলেন যতেক পাহাল্‌ওয়ান্।
শাহীদ হইলেন সবে আল্লার ফরমান্॥
ইমাম হোসায়েন তখন ডাহিন বামেতে।
দেখিতে লাগিল শাহা চাহি চারি ওরফেতে॥"

কিন্তু বট্‌তলার ছাপা পুস্তকে আছে, যথা—

"এইরূপে আছিল যতেক পাহাল্‌ওান্।
সহীদ্ হইল দেখ আল্লার করমান্॥
আমির হোসেন তবে ডাইন বামেতে।
নজর করিয়া শাহা লাগেন কহিতে॥"

মহাত্মা হোসায়েনের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, হাসান্-পুত্র মোহাম্মদ কাসেম[১] অগ্রসর হইয়া কহিলেন, 'চাচা! অনুমতি করুন, এই বার আমি যুদ্ধে যাইব।" কাসেম যুদ্ধে গমন করিলেন, এবং কিছু ক্ষণ যুদ্ধ করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কাসেমের মৃত্যুর পর, মহাত্মা হোসায়েনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী আকবর[২] যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আলী আকবরের পর, হোসায়েনের অপর দুই পুত্র, আলী আস্‌গর ও আবদুল্লা আকবর একে একে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন[৩]। জীবিত রহিলেন কেবল জয়নাল আবেদিন্[৪]।

অবশেষে মহাত্মা হোসায়েনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। জঙ্গ-নামার কবি এই সময় হোসায়েনের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি পদ রচনা করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। ইবনে হাবিব বলেন, এই সময় কাসেমের বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর ছিল।

২। আলী আকবরের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমাদের বোধ হয়, এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর ছিল।

৩। আলী আস্‌গরের বয়স ১৩ ও আবদুল্লা আকবরের বয়স ১২ বৎসর ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। জয়নাল আবেদিন এই সময় রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় ছিলেন বলিয়া যুদ্ধে গমন করিতে পারেন নাই।

"কেবল যাইয়া শাহা ময়দানে খাড়া হয়।
দেখিয়া যে বেইমান্ সবে হজিমত খায়১ ॥
হাকিল যে হয়দারী-হাঁক২ ভাবিয়া খোদায়।
ঝন্-ঝনা পড়িল যেন কুফরের মাথায় ॥
কত জন পলাইয়া বাঁচে লস্করের মাঝে।
ভয়ে কম্পবান্ হয় সবে হাঁকের আওয়াজে ॥
হোসায়েন কহেন আছ কোন পাহালওয়ান।
যদি মহিমের সাধ থাকে হও আগুয়ান্৩ ॥"

হোসায়েনের আহ্বানে এজীদ-সৈন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইল। প্রথমে একে একে যুদ্ধ করিয়া যখন বিশেষ কোন সুফল প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহারা এক ব্যূহ রচনা করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। কবি এই সময়ের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই,—

"চুনিন্দা সিপাহী আর যতেক সরদার।
কাটিয়া হোসায়েন শাহা করে সার-খার৪ ॥
পালায় কাফের সবায় কেহ নাহি টিকে।
আইল বলিয়া কেহ পশ্চাতে নাহি তাকে ॥"

এজীদের সকল সৈন্যই কেহ নিহত, কেহ আহত হইল; অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল। তখন মহাত্মা হোসায়েন, ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া জল পানার্থ নদীতে অবতরণ করিলেন। অঞ্জলি পুরিয়া জল তুলিলেন; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের শোকে সে জল পান করিলেন না, ফেলিয়া দিলেন। তখন শত্রুসৈন্য সুযোগ বুঝিয়া প্রথমে দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। হোসায়েন নদী-গর্ভ হইতে উপরে উঠিয়া একে একে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিলেন। ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন। শিমর নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিল। ইহার পর মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধের কথা বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহা অনৈতিহাসিক।

বটতলায় ছাপাখানাওয়ালাদিগের কল্যাণে যে "জঙ্গনামা" কাব্যখানি কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে পারিলাম না। পৃথক্ প্রবন্ধে তুলনায় সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কেহ ইচ্ছা করিলে বটতলার ছাপা জঙ্গনামার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্যভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী

১। হজিমত খায়—ত্রাসিত হয়।

২। হজরত আলী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেন। শত্রুসৈন্য এই শব্দ শ্রবণ করিয়া থরহরি কম্পিত হইত। হজরত আলীর অপর নাম হয়দার। সে কারণ এই শব্দের নাম হয়দারী।

৩। আগুয়ান—অগ্রসর। ৪। সার্-খার—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।
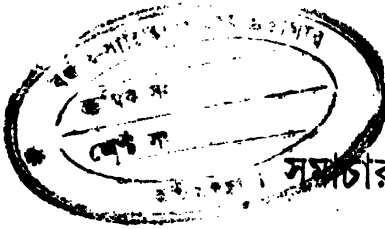
সমাচার-দর্পণ

১৩০২-৩ সালের ষষ্ঠ ভাগ জন্মভূমি পত্রিকায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সমাচারদর্পণ সম্বন্ধে বিবরণ লেখেন। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সমাচারদর্পণের কোনও সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই! পরে যখন তিনি উক্ত সংবাদ-পত্রের কয়েক সংখ্যা সংগ্রহ করিতে পারেন, তখন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ ১৩০৫) "বঙ্গীয় সমাচারপত্রিকা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকাগারে সমাচারদর্পণের প্রচারকাল ২৩ মে ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকার যে ফাইল আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

আলোচ্য সংবাদপত্রের প্রথম প্রচারের সুপরিচিত ইতিহাস বিদ্যানিধি মহাশয় সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বিবরণ শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবদিগের গ্রন্থে[১] পাওয়া যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এই সমাচারপত্রের প্রথম সংখ্যা শনিবার ২৩ মে ১৮১৮ বা ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫ প্রকাশিত হয়।[২] এই তারিখ প্রথম সংখ্যার কণ্ঠদেশে লিখিত আছে। ইহার সমাচার-দর্পণ নামকরণ সম্বন্ধে মার্শমান লিখিয়াছেন যে, বিলাতে প্রচারিত প্রথম সংবাদপত্রের

১। *Life & Times of Carey, Marshman & Ward* or *A History of the Serampur Mission.* 2 vols. London. 1859. Vol II p. 161 ; Letter from J. C. Marshman to Dr. George Smith published in the latter's *Twelve English Statesmen.* 1898. pp. 230-33 ; *Calcutta Review.* XIII (1850), Art. "*Early Bengal Language & Literature* ; *ibid* CXXIV. (1907), pp. 391-93 ; Smith, *Life of William Carey.* London 1885, New Ed 1912 ; E Carey, *Memoir of William Carey.* London. 1836. ইত্যাদি

২। সমাচারদর্পণের পুরাতন সংখ্যা-সকল দুষ্প্রাপ্য ছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু দর্পণের প্রথম সংখ্যা অধিগত হওয়ায় এ সমস্ত মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এমন কি, মার্শমান সাহেব স্বয়ং তাঁহার দুইটি পুস্তকে দুইটি ভুল তারিখ দিয়াছেন। তাঁহার *History of Serampur Mission,* Vol II p. 163, গ্রন্থে, ৩১শে মে রবিবার ১৮১৮ এবং বাঙ্গালার ইতিহাসগ্রন্থে (*History of Bengal.* 1859 p. 251) ২৯শে মে শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ তারিখদ্বয় পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে (*History of Ben. Lang. & Lit.* 1911. p. 877) মার্শমান সাহেবের শ্রীরামপুরমিশনের ইতিহাস গ্রন্থধৃত তারিখ যথাযথ গ্রহণ করিয়া পুনরায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। লং সাহেবের তালিকায় (*Descriptive Catalogue.* 1855. p. 66) ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার ১৮১৮ এইরূপ পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ভুল শ্রীরাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায় ধৃত ১৮১৬ তারিখ। *Cal. Chr. Observer* Feb. 140 (art. Native Press) ইহার তারিখ দিয়াছে ১৮১৯।

Mirror of News এই নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছিল।[৩] সমাচারদর্পণ সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম সমাচারপত্র বলিয়া উল্লিখিত হয়।[৪] কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১৮১৬ খ্রীঃ অঃ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বেঙ্গল গেজেট নামক যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, তাহাই বোধ হয়, এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। বেঙ্গল গেজেট বা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা গঙ্গাধর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বোধ হয়, উক্ত পত্রিকা, কাহারো মতে এক বৎসর, কাহারো মতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল[৫]। এবং রাজনারায়ণ বসুর সুপরিচিত বক্তৃতা[৬] হইতে জানা যায় যে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। উক্ত সংবাদপত্রের ফাইল আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও হস্তগত করিতে পারি নাই এবং এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার কোনও বিস্তৃত বিবরণও দেন নাই। সুতরাং ইহাতে কি কি বিষয় প্রকাশিত হইত, তৎসম্বন্ধে বা ইহার লিখিবার ধরণাদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রথম সমাচার পত্র না হইলেও, সমাচারদর্পণ যে পথপ্রদর্শক হিসাবে সর্ব্বপ্রথম যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী অধিকাংশ সংবাদপত্রের আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

সমাচারদর্পণে সংবাদ ভিন্ন নানা প্রবন্ধাদি ও দেশহিতকর সন্দর্ভ থাকিত। ইহার উদ্দেশ্য ও ইহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, তাহা ইহার পরিচালকগণ প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভেই এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।—

"সমাচারদর্পণ।[৭]

কয়েক মাস হইল শ্রীরামপুরের | [ছা]পাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক[৮] [প্রকা]শ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক | [মা]স ২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তা | [হা]র অভিপ্রায় এই যে

৩। ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ সাহেবের নিকট জে সি মার্শম্যানের পত্র, *Twelve English Statesmen* 1898, p. 23.

৪। Marshman, *History of Serampur Mission.* Vol II, p 167 ; Marshman, *History of Bengal.* p. 251 ; *Cal. Rev.* 1850, Vol XIII ; Smith, *Life of Carey* ; *Friend of India.* 1850, Sep. 19 ; Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature.* p. 877 ইত্যাদি।

৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৫০। কিন্তু বেভারেণ্ড লং তাঁহার *Return of Names & Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records). Cal. 1855. p. 145 পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে উক্ত সংবাদপত্রের আয়ুকাল এক বৎসর মাত্র।

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা, পৃঃ ৫৮।

৭। এই উদ্ধৃত অংশটির মূল অত্যন্ত খণ্ডিত। খণ্ডিত স্থানগুলির যে স্থলে পাঠোদ্ধার হয় নাই, সেখানে তাহাই করিয়া ও অন্যান্য স্থলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৩) যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে লইয়া বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া গেল।

৮। দিগ্‌দর্শন বা যুবা লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ ; Digdarsan or the Indian Youth's Magazine. ইহা বাঙ্গলায় প্রচারিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত।

এতদ্দেশীয় | [লো]কেরদের নিকটে সকল প্রকার | [বি]দ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে | [সক]লের সম্মতি হইল না এই | [কারণ] যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা | [হইত] তবে কাহারো উপকার | [হইত] না অতএব তাহার পরী|[বর্ত্তে] এই সমাচারের পত্র ছা|[পা] আরম্ভ করা গিয়াছে। | [ইহার] নাম সমাচার দর্পণ।—|

[এই স]মাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে | ছাপা যাইবে তাহার মধ্যে | [এই এই স]মাচার দেওয়া যাইবে।

[১ এতদ্দেশে]র জজ ও কলেক্তর[৯] | [ ]র ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্য|[ক্ষেরদের] নিয়োগ।—|

[২ শ্রীশ্রীযু]ত বড় সাহেব যে ২ | [নূতন আই]ন ও হুকুম প্রভৃতি | [প্রকাশ করিবে]ন। |

[৩ ইংগ্লণ্ড] ও ইউরোপের অন্য ২ | [প্রদেশ হইতে] যে যে নূতন সমাচার | [আইসে এবং] এই দেশের নানা | [সমাচার] |

[৪ বাণিজ্যাদি]র নূতন বিবরণ। | [এইখানে ১ম পৃঃ, ১ম স্তম্ভ সমাপ্ত]

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ | ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া। |

৬ ইউরোপদেশীয় লোক কর্ত্তৃক | যে ২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই | সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে | এবং যে ২ নূতন পুস্তক মাসে ২ | ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে সেই | সকল পুস্তকে যে ২ নূতন শিল্প | ও কল প্রভৃতির বিবরণ[৯] থাকে | তাহাও ছাপান যাইবে। |

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতি|হাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক | ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ। |

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে | প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে | তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। | প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের | পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে।[১০] | ইহাতে যে লোকের বাসনা হই|বেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের | ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তা|হে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে। |"

প্রথম দুই সংখ্যায় আলোচিত বিষয়ের তালিকা এখানে দেওয়া গেল।—

১ম সংখ্যা।—

পৃঃ ১—১। সমাচারদর্পণ (২য় স্তম্ভের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)

২। মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার (পৃঃ ২, ১ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত)

৯। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার (৫ম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৬) উদ্ধৃত অংশে এই স্থলে ভুল আছে।

১০। ৩ সংখ্যার শেষে "ইস্তাহার" আছে,—"দুই সপ্তাহের কাগজ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে পুনর্ব্বার এ সপ্তাহের কাগজও বিনামূল্যে দেওয়া যাইতেছে।" অতঃপর ৪ সংখ্যার শেষে "ইস্তাহার"—"এই সমাচারের পত্র তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে দেওয়া গিয়াছে এবং ইহার মূল্য সামান্যত ১৷০ দেড় টাকা প্রতিমাসে লেখা গিয়াছে কিন্তু ইহার বিশেষ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে জ্ঞাত হইবা এই সমাচারের পত্র যে ব্যক্তি কেবল এক মাহার কারণ লইবেক তাহার মাসে মাসে ১৷০ দেড় টাকা দিতে হইবেক যে ব্যক্তি এক বৎসরের কারণ লইবেক তাহার মাস ২ এক টাকা দিতে হবেক।" তাহা হইলে বাৎসরিক মূল্য ১২ বার টাকা।

পৃঃ ২—১। প্রথম স্তম্ভ অত্যন্ত খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় কি, জানা যায় না। তবে এই স্তম্ভের শেষে "রাজকর্ম্মে নিয়োগ" শীর্ষক সমাচার দেখা যায়।

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও

ওলাউঠা

যুবরাজের কন্যার মরণ (পৃঃ ৩, ১ম স্তম্ভ উপর পর্য্যন্ত)

পৃঃ ৩—১। প্রথম স্তম্ভ।—শ্রীশ্রীযুতের গোরক্‌পুর পৌঁছান খবর (heading নাই)

বাণিজ্যের সমাচার (২য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত)

২। দ্বিতীয় স্তম্ভ।—মরিচ উপদ্বীপের ঝড়

মান্দরাজ (৩য় স্তম্ভের উপর পর্য্যন্ত)

৩। তৃতীয় স্তম্ভ।—(কয়েক লাইন খণ্ডিত)

ইংলণ্ডে নূতন কল

সর্প কর্ত্তৃক ছাগ ভক্ষণের বিবরণ (পৃঃ ৪ মধ্যভাগ পর্য্যন্ত)

পৃঃ ৪—১। প্রথম স্তম্ভ।—খণ্ডিত—heading পড়া যায় না, তবে আলোচ্য বিষয় —হিন্দুস্থানে উৎপন্ন নীল, তুলা ইত্যাদির বিবরণ (৩য় স্তম্ভের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত)

পত্রের শেষে এই (খণ্ডিত) "ইস্তাহার" আছে—"এই সমাচারে[র পত্র] অতি ত্বরায় ছাপা হইল সে [কারণ] অধিক সমাচার নাই আ[ ]

২য় সংখ্যা।—

পৃঃ ১।—কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও

বাদশাহের জন্মদিন

নাগপুরের রাজার বিবরণ

পেশোয়া

পৃঃ ২।—(১ম স্তম্ভ খণ্ডিত—আলোচ্য বিষয় পড়া বা বোঝা যায় না।)

চোড়িগড় অধিকার

২৩ আফরেল

বাণিজ্য

মরীচি উপদ্বীপ

উত্তর আমেরিকা

পৃঃ ৩।—উত্তর আমেরিকা (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

অশ্রুত সমাচার

বিবাহের নূতন ব্যবস্থা

ইংলণ্ডের রাজকীয় ব্যয়

তৃতীয় স্তম্ভ খণ্ডিত—গৌড় নগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ

পৃঃ ৪। প্রথম স্তম্ভ একেবারে খণ্ডিত—উল্লিখিত গৌড় সম্বন্ধে প্রবন্ধের তিন স্তম্ভ-ব্যাপী অনুবৃত্তি

পৃষ্ঠার শেষে সমাচারপত্রের গ্রাহকদিগের নাম প্রেরণ সম্বন্ধে ইস্তাহার। (বর্ত্তমান প্রবন্ধের ১০ ফুটনোটে উদ্ধৃত)

সমাচারদর্পণের আকার ১৩"×৯॥"। প্রতি বারের পত্র-সংখ্যা ৪। সপ্তম সংখ্যা (৪ জুলাই ১৮১৮। ২১ আষাঢ় ১২২৫) হইতে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি ইহার কণ্ঠদেশে শোভা পাইত—"দর্পণে মুখ-সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানীহ[11] জানন্তু সমাচারস্থ দর্পণে॥" ৬৪ সংখ্যা (৭ জুলাই ১৮১৮। ২৫ আষাঢ় ১২২৮) হইতে পত্রের শীর্ষদেশে এইরূপ লেখা দৃষ্ট হইবে,—"সমাচারদর্পণ অর্থাৎ সর্ব্বহিতপ্রয়োজনক সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিষয়সূচক সম্বাদপত্র।"[12] ১৮২১ পর্য্যন্ত যে ফাইল পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি সংখ্যার প্রতি পৃষ্ঠা তিন স্তম্ভে বিভক্ত। ১ আগষ্ট ১৮১৮ পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা আমূল সংবাদ ও সন্দর্ভাদি-পূর্ণ থাকিত; তৎপরবর্ত্তী সংখ্যা (৮ আগষ্ট ১৮১৮) হইতে শেষ পৃষ্ঠায় "সেরিফ সেল" বা "জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার" কখনও এক, কখনও দুই, কখনও পূর্ণ তিন স্তম্ভ দেওয়া হইত। ২০ মার্চ্চ ১৮১৯ হইতে পত্রের প্রারম্ভেও অন্যান্য জমীর নিলামের ইস্তাহার দেখা যায়। ১০ এপ্রেল ১৮১৯ হইতে জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার আর শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইত না, প্রথম পৃষ্ঠায় দেখা যাইত। কখন কখন এই ইস্তাহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ স্তম্ভ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া থাকিত (৫২ সংখ্যা, ১৫ মে ১৮১৯)। ৮৩ সংখ্যা, ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯ হইতে শেষ পৃষ্ঠায় "বাজার ভাও"র তালিকা দৃষ্ট হইবে; ইহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তখন মণ হিসাবে দর, বালাম চাল ১॥৵০; "উত্তম গায়ে ঘৃত" ২০৲; মধ্যম ঐ ১৬৲; ভৈঁসা ঘৃত ১৬৲; মধ্যম ভৈঁসা ১৫৲; নীল উত্তম ১৩০৲, অন্যপ্রকার নীল ১১০৲; কাশীর চিনি ১০৲, মধ্যম ৮॥০ ইত্যাদি। (১৮ ডিসেম্বর, ১৮১৯। ৪ পৌষ, ১২২৬)।

এই ত গেল সাধারণ বিজ্ঞাপনাদি সম্বন্ধে। মধ্যে মধ্যে নূতন পুস্তকের বিবরণ ও বিজ্ঞাপন বাহির হইত। ইহার দুএকটি হইতে পুরাতন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ২৫ জুলাই, ১৮১৮ (১১ শ্রাবণ, ১২২৫) সংখ্যায় পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধান (শব্দসিন্ধু) সম্বন্ধে এইরূপ ইস্তাহার পাওয়া যায়,—"এতদ্দেশীয় অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ এ অকিঞ্চন ভগবান অমরসিংহকৃত অভিধান অকারাদিক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়ানরীর

১১। "বৃত্তান্তানিহ" হইবে। এই ভুল ১৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইবে। ১৫ সংখ্যা হইতে শুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে।

১২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩০৫, পৃঃ ২৫৯) "সর্ব্বহিতপ্রয়োজক" উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মূলানুযায়ী নহে।

স্থায় দেশীয় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রভসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ[ ] রূপ ৪৯২ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে [ ]র তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা [ ] তবে মোং উত্তরপাড়ায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতায় শ্রীযুত দেওয়ান [রা]মমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদনমিতি।" ইহা হইতে জানা গেল যে, উক্ত পুস্তক ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল।[১৩]

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রণীত ব্যাকরণের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট গোলমাল রহিয়াছে এবং সে পুস্তকও এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৮১৮, ৩রা অক্টোবরের (১৮ই আশ্বিন, ১২২৫) সমাচারদর্পণে উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ বিজ্ঞাপন আছে।—"নূতন কেতাব। ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আর্জ্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিদ্যা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়া বন্ধ জেল্দ করা ইহার মূল্য ফি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজার সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।" লং সাহেবের তালিকায় ও তদনুকরণে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার তারিখ খ্রীঃ অঃ ১৮২০ দেওয়া হইয়াছে; তাহা উক্ত বিজ্ঞাপন হইতে ভুল প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন[১৪] ইহার কোনও তারিখ দেন নাই। আর একটি কথা। সাধারণতঃ ইহাকে বাঙ্গালী-লিখিত প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ ইহা "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" নহে; বরং ইংরাজী ব্যাকরণ, বাঙ্গালায় লিখিত; তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ বিষয়েরও অবতারণা আছে।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ (১১ আশ্বিন, ১২২৫) হইতে—

"কলিকাতায় নূতন খবরের কাগজ।

এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে

১৩। শব্দসিন্ধু গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ জানা যায়—"গগন গণেশভুজ শকর্ক্ষভূমিতে। গ্রন্থসমাপ্তির শাক জানিবে পণ্ডিতে।" পুনশ্চ পৃঃ ৪৮৮—"অব্দ্রপ্রত্যম্বভূমিঃ পরিগতগগনে শাক ঈদৃগ্বিদ্ধাতিঃ শ্রীযুৎপীতাম্বরাখ্যো বুধগণবিভবঃ পুস্তকঃ নিষ্পপাৎ" ইত্যাদি। পুস্তকের পরিচয়-পত্রে (title-page) "কলিকাতায় ছাপা হইল ১২২৪ সাল" এইরূপ লিখিত আছে। তাহা হইলে ইহার প্রকাশের তারিখ ১৮১৭।১৮১৮। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার ইংরাজী *History of Bengali Lang. & Lit.* গ্রন্থে (পৃঃ ৯০১) ইহার ভুল তারিখ দিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১২) যে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী আছে, তাহাতে ইহার তারিখ লং সাহেবের অনুকরণে ১৮০৯ দেওয়া হইয়াছে।

১৪। *History of Beng. Lang. & Lit.* 1911. p. 902.

প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহার মাস মাস ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর না লইবেন তাঁহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবে।"

এ কাগজটি কি এবং ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, তাহা বুঝা গেল না। সংবাদকৌমুদী নয় ত? অথবা জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত বিখ্যাত কলিকাতা জর্ণাল (Calcutta Journal)?

১২ই ডিসেম্বর, ১৮১৮ (২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২২৫) তারিখের ৩০ সংখ্যা হইতে—

"শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্রা করিয়াছেন।"

১৩ই মার্চ্চ, ১৮১৯ (১লা চৈত্র, ১২২৫) তারিখের ৪৩ সংখ্যা হইতে—

"কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।[১৫]

আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গালা পাঠশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত যত পাঠশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরুমহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর আর প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরুমহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।"

২০শে মার্চ্চ, ১৮১৯ (৮ই চৈত্র, ১২২৫) তারিখের ৪৪ সংখ্যা হইতে—

"শ্রীরামপুরের টোল।

শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহুপ্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতি শাস্ত্রের এক এক জন পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অন্য অন্য শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরে সাহেব

১৫। স্কুল সোসাইটী ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ প্রথম স্থাপিত।

লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।"

৩রা এপ্রিল, ১৮১৯ (২২শে চৈত্র, ১২২৫) ৪৬ সংখ্যা হইতে—

"পুস্তক ছাপান।

* * * *

এইক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান[১৬] করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডীগান পুস্তক নানাপ্রকার লিপিদোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।"

২৯শে মে, ১৮১৯ (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) ৫৪ সংখ্যা হইতে—

"স্কুল সোসৈয়িটী।

আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়েটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় কর (*sic*) গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ষ্টুয়ার্ট সাহেব হইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেন না ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার যশ[১৭] সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বর্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্যে মাস ২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা ছয়

১৬। শব্দকল্পদ্রুম। (*see Second Report of the Cal. School Book. Society* 1819, p. 50)

১৭। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট (Stewart) বর্দ্ধমানে কলিকাতা মিশনারী সোসাইটির তত্ত্বাবধানে একটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটি ইহার এক জন প্রতিনিধিকে ৫ মাসের জন্য উক্ত পাঠশালার রীতি শিক্ষা করিবার জন্য বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছিল। (Long's *Introduction to Adam's Reports*: Lushington, *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent, and Charitable Institutions in Calcutta and its vicinity*. Cal. pp. 145-155)। ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। যথা—"উপদেশ কথা (ইতিহাসের সুবচন) পরন্তু ইংলণ্ডীয়োপাখ্যানের চুম্বক কলিকাতা ১৮২০" ইত্যাদি।

টাকা মাস মাস পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন।"

পরবর্ত্তী ৫৫ সংখ্যায় (৫ই জুন, ১৮১৯। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) পুনশ্চ—

"স্কুল সোসৈয়েটী।

কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক অনেক ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই ২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুরদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসৈয়েটীর এইরূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসৈয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর ও পাঠশালার কর্ত্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং উইলার্ড সাহেবকে বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে[১৮] তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।"

উক্ত সংখ্যায় পুনশ্চ—

"নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধনির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপ্পান্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যকশাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।"

১৮। এ বিষয়ে Long, *Introduction to Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal*, London, 1868 দ্রষ্টব্য।

তখনও বৃদ্ধ কেরীর পুত্র ফিলিক্স কেরীর "ব্যবচ্ছেদবিদ্যা" (Anatomy) প্রকাশিত হয় নাই। যুবক কেরীর উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া হইতে নানা বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক "বিদ্যাহারাবলী" নাম দিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। ইহার মধ্যে শুধু প্রথম খণ্ড ব্যবচ্ছেদবিদ্যা[১৯] ছাপা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ১২ই জুন, ১৮১৯ (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৫) সংখ্যা সমাচারদর্পণে লিখিত হইয়াছিল,—

"নূতন পুস্তক।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লীয় (*sic*) পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক২ নম্বরের মূল্য দুই ২ টাকা।"

১৯শে জুন, ১৮১৯ (৬ই আষাঢ়, ১২২৩) ৫৭ সংখ্যা হইতে—

"জগন্নাথমঙ্গল।

মোং কলিকাতাতে জগন্নাথমঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালিগান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে

১৯। এই গ্রন্থের titlepage বা পরিচয়-পত্র এইরূপ,—"বিদ্যাহারাবলী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় কৃত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্য তাবৎ আয়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদি মূল গ্রন্থাবলী। তৎপ্রথম গ্রন্থ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। Vidyaharabalee or Bengalee Encyclopædia. Vol I. Anatomy. ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ফিলিক্স কেরী কর্ত্তৃক পঞ্চম বার ছাপাকৃত এনসেক্লোপেদিয়া ব্রিটানিকা নামক গ্রন্থাবলী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কৃত। পরিষ্ঠ উলিয়াম কেরী কর্ত্তৃক ভর্জমা বিবেচিত এবং শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ভাষা বিবেচিত ও কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি কর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত। শ্রীরামপুর মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। সন ১৮২০। or The Science of Anatomy translated into Bengalee from the 5th Edition of the Encyclopædia Britanica by F. Carey. Assisted by Sreekanta Vidyalankar & Shree Kavichandra Tarkasiromani, Pundits. The whole revised by the Rev. W. Carey. D. D. Serampor. Printed at the Mission Press. 1820." শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন (*History of Beng. Lang. & Lit.* p. 872) এই পুস্তকের উল্লেখ সময়ে ইহাকে "Hadavali Vidya" (হাড়াবলী বিদ্যা) এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহা ভুল। Anatomy সম্বন্ধীয় পুস্তক বলিয়া বোধ হয় "হারাবলী" স্থানে "হাড়াবলী" হইয়া গিয়াছে এবং হাড়াবলী বিদ্যা ব্যবচ্ছেদবিদ্যা অর্থে ভ্রমক্রমে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনবধান অমার্জ্জনীয়। কারণ, পুস্তকের titlepageএ এবং যে যে স্থলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়, সর্ব্বত্র বিদ্যাহারাবলী Encyclopædia অর্থে ধরিয়া গ্রন্থের নাম ব্যবচ্ছেদবিদ্যা দেওয়া হইয়াছে। মূল গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে এরূপ ভুল হইত না। এ পুস্তক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; প্রবন্ধান্তরে ইহার সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে। সমাচারদর্পণ হইতে উপরোক্ত বিজ্ঞাপন হইতে বুঝা যায় যে, ইহা ক্রমিক সংখ্যায় (serially) প্রকাশ করিবার প্রস্তাব ছিল। ফিলিক্স (Felix) বৃদ্ধ উইলিয়াম কেরীর প্রথম পুত্র। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও বাঙ্গালা ভিন্ন পালী ও ব্রহ্মদেশের ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮২২ খ্রীঃ অঃ ৩৬ বৎসর বয়সে শ্রীরামপুরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। (*Bengal Obtiuary*, p 350)

জগন্নাথদেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিণী ও তাল মানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।"

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮১৯ (২০শে অগ্রহায়ণ, ১২২৬) ৮১ সংখ্যা হইতে—

"নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্ব্বার সহমরণ বিষয়ক বাঙ্গালা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।"

ইহার পূর্ব্বে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮১৮ (১৩ই পৌষ, ১২২৫) ৩২ সংখ্যা হইতে—

"সহমরণ।

কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

সহমরণ সম্বন্ধে আন্দোলন তখন বেশ জোরেই চলিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। সহমরণের সংবাদ অন্যান্য সংবাদের ন্যায় সমাচারদর্পণে অনবরত বাহির হইত।

এই সম্বন্ধে ২২শে মে, ১৮১৯ (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৬) সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

"বেদান্ত মত।

৯ই মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতিবিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল এবং খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিককর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।"

সহমরণ-বিধির সমর্থন করিবার ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ (৩রা আশ্বিন, ১২২৬) ৭০ সংখ্যা হইতে জানা যায়,—

"নূতন পুস্তক।

সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষেধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণ বিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি-প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী

ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে।"

স্কুল সোসায়েটীর উল্লেখ থাকিলেও স্কুলবুক সোসায়েটীর উল্লেখ বেশী পাওয়া যায় না। ইহার স্থাপনের পর তৃতীয় বাৎসরিক সম্মিলনের উপর নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য ২১শে অক্টোবর, ১৮২০ (৬ই কার্ত্তিক, ১২২৭) ১২৭ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

"স্কুলবুক সোসয়িটী।

১১ আক্টোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতি লোকেরা নূতন ২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন।[২০] শ্রীযুত মস্তেগু সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার[২১] কথাক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত কেপ্তেনস্ত্র ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমিদের কথাক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।"

মেণ্ডিস্ (Mendies) সাহেবের[২২] অভিধান সম্বন্ধে ২৭শে জানুয়ারী, ১৮২১ (১৬ই মাঘ, ১২২৭) ১৪১ সংখ্যার ইস্তাহার,—

২০। উক্ত সোসায়েটীর রিপোর্ট (*First Report of the School Book Society*. Cal. 1818. p. 61) হইতে জানা যায় যে, নবাব বাহাদুর হাজার টাকা নহে, ৫০০৲ টাকা এককালীন দান করিয়াছিলেন এবং পৃষ্ঠ-পোষকস্বরূপ বাৎসরিক ১০০৲ টাকা চাঁদা দিতেন।

২১। ইনি মে, ১৮০১ খৃঃ অব্দে ফোর্টউইলিয়াম কালেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের হেড্ মুন্সী নিযুক্ত হন, (Roebuck, *Annals of the Fort William College*. 1819. App III. p 48)। উক্ত কলেজের ডাক্তার গিল-ক্রিষ্ট (Gilchrist) সাহেব যে ঈসপস্ ফেবলের ছয় ভাষায় (হিন্দুস্থানী, পারসী, আরবী, ব্রজভাষা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত) অনুবাদ ইংরাজী অক্ষরে (Roman Character) মুদ্রিত করেন, তাহার বাঙ্গালা অংশের অনুবাদ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য তারিণীচরণ মিত্র করেন [Preface to *Oriental Fabulist* 1803 by Dr Gilchrist ; Buchanan, *College of Fort William* 1805 p. 221]। উক্ত পুস্তকের মুখবন্ধে গিলক্রিষ্ট সাহেব তারিণী বাবুর অনুবাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। স্কুল বুক সোসাইটীর রিপোর্ট (১৮১৮, পৃঃ ৯) হইতে জানা যায়, ইনি উক্ত সোসাইটীর দেশীয় সম্পাদক ছিলেন (Native Secretary), কতকগুলি পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিলেন।

২২। এই পুস্তকের title page এইরূপ,—"An Abridgment of Johnson's Dictionary in English & Bengali, peculiarly calculated for the use of Native as well as European Students, to which is subjoined a short list of French & Latin words and phrases in common use among English authors ; & also the abbreviations and contractions most commonly used in Writing & Printing. Serampur Mission Press. 1822."

"ইস্তাহার।

জানসেন ডেক্সনরী।

সকল লোককে অবগত করা যাইতেছে যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষাতে নানা প্রকার ডেক্সনরী প্রস্তুত হইতেছে ও হইয়াছে কিন্তু অধিক মূল্য প্রযুক্ত অনেকে তাহা লইতে অসমর্থ তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বসাধারণ গ্রহণের কারণ জানসেন ডেক্সনরী যে কেতাব প্রসিদ্ধ আছে সেই কেতাব অনুসারে এক দিকে ইংরেজী শব্দ সাবেক মত থাকিবেক এবং তাহার প্রতিরূপক বাঙ্গালা শব্দ অন্য দিকে বিন্যাস করা যাইবে। ইহাতে যিনি ইংরেজী শিখিতে ইচ্ছা করেন ও যিনি বাঙ্গালা শিখিতে বাসনা করেন সে উভয়েরি যথেষ্ট উপকার হইবেক। এই কেতাব অনুমান তিন শত পৃষ্ঠা হইবেক। ইহার প্রতি কেতাবের মূল্য স্বাক্ষরকারীরা ৮ আট টাকাতে কেতাব পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরা ১২ বার টাকার ন্যূনে পাইবেন না। অতএব যিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আপন নাম এবং কোন মোকামে কাহার নিকট কেতাব পাঠান যাইবে তাহাও লিখিয়া মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে শ্রীজন মেণ্ডিস সাহেবের নিকট পাঠাইবেন যেহেতুক দূরদেশে কেতাব ডাকে পাঠাইতে তাহারদের অনেক ব্যয় হইবেক এবং কি প্রকার বা টাকা পহুঁছিবে অতএব তাহার বেওরা করিয়া লিখিবেন। পরে কেতাব প্রস্তুত হইলে তাহারদের নিকটে পাঠাইয়া টাকা আদায় করা যাইবেক ইতি।"[২৩]

[এই ইস্তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যায়ও বাহির হইয়াছিল]

রামকমল সেনের প্রসিদ্ধ অভিধান সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ ৩১শে মার্চ্চ ১৮২১ এর ১৫০ সংখ্যায় দেখা যায়,—

"ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।

শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব[২৪] ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্ত্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা

২৩। ১৬৭ সংখ্যায় (৭ই জুলাই, ১৮২১। ২৫ শে আষাঢ়, ১২২৮) মেণ্ডিস সাহেব তাঁহার গ্রাহকবর্গকে জানাইতেছেন যে, সমুদয় কেতাব বাঙ্গালায় তর্জমা করা সময় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ। "মার্চ্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুলাই মাস পর্য্যন্ত এক শত বিশ পেজ ছাপা হইয়াছে এই অনুসারে অবশিষ্ট তাবৎ সমাপ্ত হইলে তাহারদের নিকট পাঠান যাইবেক।"

২৪। এই অভিধান যে রামকমল সেন একলা সঙ্কলন করেন নাই, পরন্তু ফেলিক্স কেরী তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থান ভিন্ন অন্যত্রও উল্লেখ পাওয়া যায়। *Bengal Obituary.* Cal. 1857, p 349; Wenger, *Story of the Lallbazar Baptist Church being the story of Carey's Church from 1800.* Cal. 1908. Appendix.

মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"

২রা জুন, ১৮২১ (২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২২৮) ১৫৯ সংখ্যায় "মুগ্ধবোধকৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ" সম্বন্ধে কিঞ্চিদধিক এক পৃষ্ঠাব্যাপি দীর্ঘ ইস্তাহার। সমস্তটা এখানে উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। ইহাতে পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের তালিকা দেওয়া হইত। শেষে "শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ কলিকাতা শিমুল্যা" এই নাম ঠিকানা এবং নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য আছে,—"এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতুক যিনি এ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতি জ্ঞানবান্।" পুস্তকের আকার ৫০০ পৃষ্ঠা হইবেক প্রথম খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড ১ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ ৬ টাকা।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসয়েটী হইতে মুদ্রিত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাঙ্গালা বর্ণমালা[২৫] সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—(১৬৩ সংখ্যা। ৩০শে জুন, ১৮২১। ১৮ই আষাঢ়, ১২২৮),—

"নূতন পুস্তক।

এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুষারিনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি যথ-পথ জ্ঞান ও ব্যাকরণজ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন প্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরক্ষরযুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত ব্যঙ্করাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতিভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন ২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও ণকার ও বকারভেদ ও তিথিবারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্‌কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতু প্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে। এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি যিনি [সম্রা]জ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধিকারাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত [ ] যে সনে যড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।"

এই ত গেল সাহিত্য বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমাচার। এতদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায়

২৫। উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, এই পুস্তকখানি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার এক খণ্ড পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে আছে।

কোম্পানির কাগজের দর, সতীদাহ-সংবাদ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ভিন্নদেশের খবরাখবর, বাণিজ্য, আমদানী ও রপ্তানির হিসাব, ইংলণ্ডের বাদসাহ বা তৎপরিবারের খবর, শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের মফঃস্বল পর্য্যটন্ (tour) বৃত্তান্ত, কলিকাতায় জাহাজ আমদানী, খুন, আত্মহত্যা, চুরী, অপমৃত্যু, গৃহদাহ, নৌকাডুবি, ঝড়, ভূমিকম্প, মাহেশের রথ, লালাবাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) মৃত্যু (১৭ই জুন, ১৮২০), গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ (১৪শে অক্টোবর, ১৮১৮), কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ ইত্যাদি সাময়িক সমাচারও থাকিত। দুএকটি সংখ্যা হইতে তৎকালীন কলিকাতার রাস্তাঘাটের শোচনীয় অবস্থার কথাও[২৬] জানা যায়,—

"সুপ্রীম কোর্টের শেষ সিছিলের সময় যখন কর্ম্ম সমাপন করিয়া গ্রাণ্ডজুরি বিদায় পাইল তখন তাহারা শ্রীযুত জজ সাহেবের নিকট পুলিসের বিষয় এক দরখাস্ত দিল তাহাতে এই লেখা আছে যে কলিকাতার যেমত দৌলত এবং লোক ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহা হইতে দুষ্কর্ম্ম বৃদ্ধি অধিক হইতেছে। দ্বিতীয় গত বর্ষাকালে কলিকাতার রাস্তা ও নরদমা সকল এমন মলিন ছিল যে তাহার দুর্গন্ধেতে অনেক লোকের রোগ হইয়াছিল। অতএব পুলিসের সাহেবেরা অন্য অন্য কর্ম্মে থাকিয়া এই কর্ম্ম করিতে প্রকৃত অবকাশ পায় না। অতএব তাহারা এই দরখাস্ত দেয় যে জজ সাহেব শ্রীশ্রীযুতকে এই সকল বিষয় জ্ঞাত করান যে তিনি ইহার কোন উপায় করিয়া দেন।" (১৪ই নভেম্বর, ১৮১৮। ৩০শে কার্ত্তিক, ১২২৫)

পুনশ্চ—   "কলিকাতার নরদামা।

কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেক অনেক গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাউক।" ইত্যাদি (২৭শে মে, ১৮২০। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২২৭)

নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে,—

"মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলা অবধি বাগবাজার পর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাইটোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানা পর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।" (২রা ডিসেম্বর, ১৮২০। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২২৭)।

দুএকটা আজগুবি খবরও যে থাকিত না, তাহা বলা যায় না। যথা,—

"আশ্চর্য্য চক্ষুলাভ।

ইংলণ্ড দেশে গত বৎসরের যে সূর্য্যগ্রহণে অসত্য লোকেরদিগের বিষয় গত সপ্তাহে ছাপান গিয়াছে সেই গ্রহণ দেখিতে বামচক্ষুহীন একজন সাহেব বাহিরে থাকিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপরে

২৬। এই সংবাদ সমসাময়িক ইংরেজী সংবাদপত্রেও যথেষ্ট পাওয়া যায় (Busteed, *Echoes from Old Calcutta*. Cal. 1888, p. 157)।

হস্ত রাখিয়া গ্রহণ দেখিতেছিল দৈবাৎ সেই বামচক্ষুতে অকস্মাৎ দৃষ্টি হইয়া দুই চক্ষু সমান দৃষ্টি হইল।" ইত্যাদি (২৪শে মার্চ, ১৮২১। ১২ই চৈত্র, ১২২৭)

এই ত গেল বিবিধ বিষয়ক সাময়িক সমাচার। ইহা ভিন্ন সমকালীন যুদ্ধাদি ও অন্যান্য রাজনৈতিক বা শাসনসম্বন্ধীয় সংবাদও থাকিত। এই সকল বিবরণ হইতে দেশের তদানীন্তন ধারাবাহিক ইতিহাস মোটামুটি গড়িয়া লওয়া যায়। পিণ্ডারিদিগের সহিত যুদ্ধ, হোলকার, সিন্ধিয়া প্রভৃতি মহারাষ্ট্র রাজন্যবর্গের সহিত সংঘর্ষ, ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের যুদ্ধের শেষ অবস্থা, বোনাপার্টের সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দিরূপে অবস্থান প্রভৃতি সংবাদ, মোগল বাদশাহের ও লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা সমাচার পাওয়া যায়। এই সকল সংবাদ যদিও কোম্পানীর তরফ হইতে লিখিত ও সুতরাং একতরফা, তথাপি ঐতিহাসিক ঘটনার সমসাময়িক বৃত্তান্ত হিসাবে ইহাদের মূল্য যে একেবারে কিছুই নাই, এ কথা বলা যায় না।[২৭] বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে এ বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নহে; সুতরাং এখানে আমরা বোনাপার্ট সম্বন্ধে দুএকটি কৌতূহলোদ্দীপক সমাচার তুলিয়া দিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করিব।

"বোনাপার্ট।

ইউরোপের শেষ শান্তি হইলে বোনাপার্ট ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইল এবং তাহাকে সেণ্ট হেলিনা নামে উপদ্বীপে রুদ্ধ করিল সেথান হইতে শেষ সমাচার আসিয়াছে যখন বোনাপার্ট শুনিল ইউরোপ দেশে তাহার যে পুত্র আছে তাহার মাতামহ তাহাকে ঈশ্বরারাধনার অধ্যক্ষ করিতে চেষ্টা পাইতেছে তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। বোনাপার্টের উপকারার্থে ছয় ক্রোশ দীর্ঘ একটা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তিনি অদ্যাপি তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন নাই সে উপদ্বীপে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধ্যক্ষ যে আছে তাহার নিকট বোনাপার্টের শুভাশুভ সমাচার দিনের মধ্যে দুই বার যায় এবং বোনাপার্টের কোন চাকর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগের আজ্ঞা বিনা বাহির হইতে পারে না।" ইত্যাদি (২০শে জুন, ১৮১৮। ৭ই আষাঢ়, ১২২৫)

"বোনাপার্ট।

আমেরিকীয় সমাচার পত্রে লিখা আছে যে বোনাপার্টের সহোদর ভ্রাতা তাহাকে মুক্ত করিবার কারণ চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু যদ্যপি বোনাপার্টকে মুক্ত করিতে সে চল্লিশ কোটি টাকা দেয় তথাপি তাহা হইবে না।" (২৯শে আগষ্ট, ১৮১৮। ১৪ই ভাদ্র, ১২২৫)

"বোনাপার্ট।

সান্ত হেলেনা দ্বীপ হইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে গত জুন মাসেতে বোনাপার্ট গ্রহণী পীড়াতে অতিশয় পীড়িত ছিলেন।" (১০ই অক্টোবর, ১৮১৮। ১৮ই আশ্বিন ১২২৫)

২৭। এই সকল সমাচার আলোচনা করিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লেখা যায়।

"বোনাপার্ট।

মোং সেন্ত হেলিনা হইতে ৪ আগস্তের সমাচার আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে সেখানকার অধ্যক্ষেরা বোনাপার্তকে আরও দৃঢ়রূপে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে যে সেনাপতিরদের জিম্বাতে তিনি ছিলেন তাহারদিগকে অকস্মাৎ বিলাতে পাঠাইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার যে নূতন সেনাপতিরদের জিম্বা করিয়াছিল তাহারদের পরীবর্ত্ত করিয়া পুনর্ব্বার নূতন সেনাপতিরদের জিম্বাতে তাহাকে রাখিয়াছে ইহার হেতু আমরা এত দূরে থাকিয়া জানিতে পারি না কেবল কর্ম্ম দেখিতে পাই।" (২রা জানুয়ারি, ১৮১৯। ২০শে পৌষ, ১২২৫)

এই সকল সাময়িক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য সমাচার বা মন্তব্য ১৮১৮ সালের প্রথম বর্ষের সমাচারদর্পণ হইতে চয়ন করিয়া নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল,—

১৮১৮

১। নাগপুরের রাজার বিবরণ (৩০ মে)
   পেশোয়া (ঐ)
   চৌড়িগড় অধিকার (ঐ)
২। গড়মণ্ডল (৬ জুন)
   সোলাপুর (ঐ)
৩। চান্দাগড় (১৩ জুন)
   সুনরগড়দিগর দখল (ঐ)
   রইগড় (ঐ)
   নাগপুরের রাজা (ঐ)
   পেশোয়া (ঐ)
৪। বাজিরাওর স্ত্রীর বিবরণ (২০ জুন)
   হসিংহবাদ (ঐ)
৫। শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়া (২৭ জুন)
   রণজিৎ সিংহ (ঐ)
   বাজিরাও (ঐ)
৯। [সিন্ধিয়া সম্বন্ধে—মূল খণ্ডিত] ২৫ জুলাই
১০। শ্রীত্রিম্বকজী দাংলিয়া (৮ আগষ্ট)
   লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ (ঐ)
১১। গত যুদ্ধের বিবরণ (২২ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ
   শ্রীযুত আপা সাহেব (ঐ)
১২। গত সপ্তাহের শ্রীশ্রীযুতের [যুদ্ধবিবরণের] অবশিষ্ট কথা (২৯ আগষ্ট)—দীর্ঘ প্রবন্ধ,

শ্রীশ্রীযুতের নিকট বাঙ্গালি লোকের নিবেদনপত্র (ঐ)

শ্রীশ্রীযুতের প্রত্যুত্তর পত্র (ঐ)

১৩। শ্রীযুতের [যুদ্ধ সম্বন্ধীয়] অবশিষ্ট কথা (৫ সেপ্টেম্বর)—পূর্ব্বানুবৃত্তি

নর্ম্মদাতীরস্থ দেশের সমাচার [ঐ]

মধ্যম হিন্দুস্থানের সমাচার [ঐ]

১৪। শ্রীশ্রীযুতের [যুদ্ধ সম্বন্ধীয়] অবশিষ্ট কথা—পূর্ব্বানুবৃত্তি (১২ সেপ্টেম্বর)

১৫। ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের পুত্রের বিবাহ (১৯ সেপ্টেম্বর)

১৬। কর্ণাটক নবাবের কর্জ্জের বিষয় (২৬ সেপ্টেম্বর)

১৭। প্রিন্সস চার্লেট আফ ওএল্‌স (৩ অক্টোবর)

শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া (ঐ)

নাগপুর (ঐ)

১৮। দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর (১৭ অক্টোবর, ৫ ডিসেম্বর, ২৬ ডিসেম্বর).

১৯। পশ্চিম দেশের [মহারাষ্ট্র] সমাচার (দীর্ঘ প্রবন্ধ (২১ সেপ্টেম্বর)

গড় কোটা (ঐ)

২০। পশ্চিম দেশের সমাচার (৫ ডিসেম্বর)

ওআহবিরদের বিষয় (ঐ)

২১। যুদ্ধের সমাচার (২৬ ডিসেম্বর)

মুখ্যতঃ সংবাদপত্র হইলেও সমাচারদর্পণে নানাবিষয়ক কৌতূহলোদ্দীপক জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভাদিও থাকিত। ১৮১৮ সালের সমাচারদর্পণ হইতে এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হইল,—

১। বাণিজ্য (২০ জুন)

বেলুন (ঐ)

হিড়িম্বরাজ্য বিষয় (ঐ)

২। জুড়ি দ্বারা মকদ্দমা (২৭ জুন)

৩। বর্ম্মার দেশ (৪ জুলাই, পুনশ্চ ২ জানুয়ারী, ১৮১৯)

৪। স্পানিয়া আমেরিকার যুদ্ধ (১৮ জুলাই)

৫। পৃথিবী ও তাহার সন্তান (২৫ জুলাই)

৬। তর্পিদো কল বিষয় (১৫ আগষ্ট)

৭। ভারতবর্ষের প্রাচীন নগরের বিবরণ (২২ আগষ্ট)

৮। শ্রীনলণ্ডীয়েরদের ধর্ম্ম (১০ অক্টোবর)

৯। দিল্লীর লুট [নাদেরশার আক্রমণ —"ডো সাহেবের" পুস্তক হইতে] (১৭ অক্টোবর)

১০। শাহ আলম বাদশাহ (৭ নভেম্বর)

১১। গোঙ্গা ও বধিরের পাঠশালা (২৮ নভেম্বর)

১২। ডৈঅজিনিস নামে গ্রীকেরদের এক আচার্য্য (ঐ)

১৩। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১২ ডিসেম্বর)

১৪। অবিবাহিতা স্ত্রীবিক্রয় (১৯ ডিসেম্বর)

এই সকল সন্দর্ভাদি ব্যতীত ৪ জুলাই, ১৮১৮ তারিখের সংখ্যা হইতে "ইতিহাস"[২৮] এই নামে নীতিবিষয়ক ছোট গল্প বা কৌতুককর চুট্‌কী কথা থাকিত। উলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খ্রীঃ অঃ প্রথম প্রকাশিত। সমাচারদর্পণে যে সমুদয় নীতি-গল্প থাকিত, তাহা সংগ্রহ করিলে উক্ত ইতিহাসমালার ন্যায় আর একখানি সুন্দর গ্রন্থ হইত, সন্দেহ নাই। বাহুল্য ভয়ে ইহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গল্প মাত্র নমুনাস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"উপস্থিত বক্তা।

এক সময়ে ফ্রান্স দেশের বাদশাহ রোমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট এক যুবা পুরুষকে আপন উকীল করিয়া পাঠাইলেন। উকীল ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিল ও যথোপযুক্ত স্থানে বসিল। ঐ প্রতাপী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ক্রোধপূর্ব্বক যুবা উকীলকে কহিলেন যে তোমার বাদশাহ কি আমার সহিত উপহাস করেন দেখ যাহার দাড়ী উঠে নাই এমত বালককে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া উকীল উত্তর করিল যে যদি আমার বাদশাহ জানিতেন যে জ্ঞান ও বিদ্যা সকলি দাড়ীর মধ্যে আছে তবে এক ছাগলকে পাঠাইলেই উপযুক্ত হইত। ইহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষ আন্তরিক তুষ্ট হইলেন।" (২১ এপ্রিল, ১৮২১)

সমাচারদর্পণের পরবর্ত্তী ইতিহাসের বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। কত বৎসর ইহা চলিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। লং সাহেব তাঁহার *Return of Names and Writings of 515 persons connected with Bengali Literature* (Bengal Govt. Records) Cal. 1855 (p 145) নামক রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ইহার আয়ুষ্কাল ২১ বৎসর। তাহা হইলে ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ ইহার প্রচার বন্ধ হইয়াছিল।[২৯] মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়

২৮। "ইতিহাস" এ স্থলে ইতিকথা বা গল্প অর্থে ব্যবহৃত। সে সময় উক্ত কথার এইরূপ অর্থ ছিল, তাহা কেরীর "ইতিহাসমালা" বা তারাচাঁদ দত্তের "মনোরঞ্জনেতিহাস" ইত্যাদি পুস্তকের নাম হইতে বুঝা যায়।

২৯। লং সাহেবের *Return relating to Bengali publications in* 1857. Cal. 1859. (Beng. Govt. Records) p XXXVII পুস্তকও দ্রষ্টব্য। ইহার প্রচারকাল লং সাহেব ধরিয়াছেন—১৮১৮ হইতে ১৮৪০ খ্রীঃ অঃ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫০) সমাচারদর্পণ ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন মতই ঠিক নহে। কারণ, আমি সম্প্রতি বাঙ্গালা এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে সমাচারদর্পণের ১৮৫১ ও ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ফাইল পাইয়াছি; এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকাগারে ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের ফাইল (অসম্পূর্ণ) পাইয়াছি। এই সকল ফাইল হইতে এই সংবাদপত্রের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়,—

(১) ১৮৫২ খ্রীঃ অঃ ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে বর্ত্তমান ছিল।

(৩) *Cal. Chr. Observer*, 1840, (February p 65-66) হইতে জানা যায় যে, ১৮৪০ পর্য্যন্ত ইহার মৃত্যু হয় নাই।

(৪) ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ, ২৫ ডিসেম্বর দর্পণ অদর্শন হইয়াছিল[৩০] এবং ৩রা মে শনিবার ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ ইহা পুনরুদিত হইয়াছিল। কারণ, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের যে ফাইল আমরা পাইয়াছি, তাহার ৩রা মে তারিখের কাগজে ১ বালম ১ সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দেশ আছে; সুতরাং ইহা নূতন পর্য্যায়ের ক্রমিক সংখ্যা। ইহা ভিন্ন ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত মুখপত্র দেখা যায়,—

"সমচারদর্পণের নমস্কার।

পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকার প্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগকে বহুকালীন বৃদ্ধ বন্ধু স্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরুদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনকথিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের।" ইত্যাদি (১ বালম। ১ সংখ্যা। ১৮৫১, ৩রা মে, শনিবার। ১২৫৮ সাল, ২১শে বৈশাখ)

(৫) ১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিভাষী বা ইংরাজী ও বাঙ্গালা, এই উভয়

৩০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (পঞ্চম ভাগ, ১৩০৫, পৃঃ ২৫৪-৫৫) লিখিত হইয়াছে যে, ইহা ১৮৪২ খ্রীঃ অঃ পাদরীগণের সমরাভাববশতঃ হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত উহার প্রেতাবস্থা, ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে প্রেতোদ্ধার মাত্র হয়। কিন্তু ১৮৪২ খৃঃ অঃ হস্তান্তরিত হওয়ার সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকার লেখক কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দেখান আবশ্যক বোধ করেন নাই। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে দর্পণ হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত লেখকের উক্তি নিতান্ত অমূলক। ১৮৪১ খৃঃ অঃদ দর্পণের অদর্শনের কারণ বোধ হয় এই যে, মার্শমান সাহেব উক্ত তারিখ হইতে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ইহার সম্পাদকীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন।

তাহাতেই লিখিত হইত। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে পুনরুত্থানের পরও ২৪শে এপ্রিল ১৮৫২ পর্য্যন্ত ইহার দ্বিভাষিত্ব বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু কোন্ সময় হইতে ইহা প্রথম দ্বিভাষী হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই।[৩১] *Cal. Chr. Observer* 1840 উল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে (পৃঃ ৬৬) জানা যায়, ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ইহা দ্বিভাষী (ইংরাজী ও বাঙ্গালা) ছিল। সুতরাং বোধ হয়, ইহার প্রথম মৃত্যু ১৮৪১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত ইহা দ্বিভাষী ছিল।

(৬) ১৮৩১ সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—বালম ১৩। (১৮৩২ সালের উপরেও ১৪ বালম লিখিত আছে); সুতরাং ১৮৩১ পর্য্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে প্রথম প্রচার—সে সময় হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইবারই কথা। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত ইহা একাদিক্রমে চলিয়াছিল; কোথাও কোন ক্রমভঙ্গ হয় নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা ১৮২১ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত কোন সংখ্যা খুঁজিয়া পাই নাই।

(৭) ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। পত্রের কণ্ঠদেশে লিখিত আছে,—"Serampur; Published every Saturday Morning।" এই নিয়ম বোধ হয়, পত্রের প্রচার-কাল হইতে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ছিল। সুতরাং ১৮১৮ হইতে ১৮৩১ পর্য্যন্ত সমাচারদর্পণ সাপ্তাহিক ছিল।

(৮) ১৮৩২ খ্রীঃ অঃ হইতে ইহা সপ্তাহে দুই বার প্রকাশিত হইত,—বুধবার ও শনিবার। এই সালের প্রতি সংখ্যার উপর লিখিত আছে,—"Published Every Wednesday and Saturday Morning"। এই নিয়মে ইহা ১৮৩৪—৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তৎপরে পুনরায় ১৮৩২, ১৫ই নবেম্বর হইতে ইহা সপ্তাহে একবার—শনিবার প্রকাশিত হইত। শেষোক্ত তারিখ হইতে উপরে লিখিত আছে,—Published at Serampure every Saturday Morning।" ১৮৩৭—২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পুনরুজ্জীবনের পরও ইহা সাপ্তাহিক ছিল।

(৯) ইহার ১৮১৮ সালে প্রচার-কালে প্রথম সম্পাদক জে সি মার্শমান ছিলেন এবং তিনি বোধ হয় একাদিক্রমে অন্ততঃ ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত এই পদে বিরাজ করিয়াছিলেন। কারণ, ১৫ই নবেম্বর ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ সমাচারদর্পণে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখিতে পাই,—

"চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় দর্পণের বিষয় যে অনুগ্রহ প্রকাশক উক্তি লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ বাধ্য হইলাম তাঁহার ঐ উক্তি দর্পণেকপার্শ্বে সুপ্রকাশিত হইল। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে তিনি লিখিয়াছেন দর্পণ পত্র প্রথমতঃ ৺ডাক্তার কেরী

৩১। পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত লেখকের মতে (পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ২০৫), ১৮২৯ খঃ অব্দে হইতে সমাচারদর্পণ দ্বিভাষী হইয়াছিল। ইহা সম্ভব। কিন্তু আমরা ইহার কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। তিনি আরও বলেন যে, কিছু দিন আবার পারসী ভাষাও উপেক্ষিত হয় নাই। আমরা যে কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি, তাহাতে ইহার কোন নিদর্শন নাই।

সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় ইহা প্রকৃত নহে দর্পণের এই ক্ষণকার সম্পাদক যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তির ঝুঁকিতেই ষোল বৎসরেরও অধিক হইল অর্থাৎ দর্পণের আরম্ভাবধি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।" ইত্যাদি

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে ইহার পুনরুজ্জীবনের পর বোধ হয়, মিঃ টাউনসেণ্ড (ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া-সম্পাদক) ইহার পরিচালনা করিতেন। কারণ, (ক) এই সালের দর্পণের ১ম সংখ্যার (৩রা মে) শেষভাগে লিখিত আছে,—"শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীটৌন্সেণ্ড সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" (খ) ১০ই মে ১৮৫১, ২য় সংখ্যায় কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন,—

"সেলাম পুরঃসর নিবেদনমিদং গবর্ণমেণ্ট গেজেট পাঠ করিয়া আমারদিগের বহুকালের শোক নিবারণ হইল যেহেতুক সত্যপ্রদীপের পরিবর্ত্তে পুনরায় সমাচারদর্পণ প্রকাশ হইতে লাগিল" ইত্যাদি।

সত্যপ্রদীপ টাউনসেণ্ড কর্ত্তৃক সম্পাদিত সপ্তাহিক পত্র। ইহার প্রচার-কাল ১৮৫০ (*Return relating to Bengali publications.* 1859, p. xl) এবং ইহা বোধ হয় কিঞ্চিদধিক এক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই ইহার লীলা সমাপ্তি হইয়াছিল (Long, *Return* etc. 1855. p. 141)। ইহার মৃত্যুর পর তৎশোক নিবারণার্থে টাউনসেণ্ড সম্ভবতঃ সমাচারদর্পণের পুনঃপ্রচারের কল্পনা করিয়াছিলেন।[৩২]

এই কয়েক বৎসরের (১৮৩১-১৮৩৭। ১৮৫১-১৮৫২) সমাচারদর্পণের ফাইলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং শুদ্ধ এই কয়েক ফাইলের উপরেই এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল ১৮১৮ হইতে ১৮২১ সালের দর্পণের ফাইলের বিবরণ দেওয়া গেল; বারান্তরে পরবর্ত্তী ফাইলসমূহের বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে বক্তব্য, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে উক্ত ফাইল আমার ব্যবহারের জন্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শ্রীসুশীলকুমার দে

৩২। *Bengal Academy of Literature* পত্রিকায় (Vol I, No 6, January 6, 1898) উক্ত হইয়াছে যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কালের জন্য দর্পণের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ভবানীচরণ ১৮২২ হইতে সমাচারচন্দ্রিকার পরিচালনা করিতেছিলেন এবং চন্দ্রিকার সহিত দর্পণের বিশেষ মনের মিল ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

মগরাহাটের পশ্চিমের রাঙা মাটি*

১। রাঙা মাটি

প্রায় তিন চারি বৎসর হইল, একবার মগরাহাটের পশ্চিমে, চক্রদহের ভূতত্ব অনুসন্ধান করিতে যাই। এই স্থানের এক অংশের উপরের প্রথম স্তর লাল আঁটাল কাদা ও উক্ত অংশের দক্ষিণের উপরের প্রথম স্তর বালুকা-মিশ্রিত মাটি। উপরোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমে মহিষ ও মানুষের মাথার হাড় পাওয়া গিয়াছে। এই লাল আঁটাল কাদা কোথা হইতে আসিল, সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। চারি দিকের স্তরগুলি কি ভাবে বিন্যস্ত আছে, তাহা অজ্ঞাত। সেই হেতু প্রথমতঃ এই সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধানে লাল আঁটাল কর্দ্দম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে,—

(ক) মগরাহাটের পূর্ব্বউত্তর ও উত্তরের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) বারুইপুরের[১] কোন কোন স্থানে, উপরের প্রথম স্তরের মাটিই লাল আঁটাল। ইহা প্রায় ৫'।৬' ফুট গভীর। কোন কোন স্থানে উপরের ২'।৩' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ২২'।২৩' ফুট অল্প বালি-মিশ্রিত লাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(২) চাংড়িপোতার[২] উপর হইতে ২' ফুট নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়। ইহা প্রায় ১৭'।১৮' ফুট গভীর।

(৩) রাজপুরে[৩] উপর হইতে ২'।৩' ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৮'।১৯' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়।

(৪) হরিনাভির[৪] কোন কোন স্থানে উপর হইতে ২'।৩' ফুট দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৭'।৮' ফুট গভীর, লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপরের ২'।৩' ফুট গভীর দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ১৫'।১৬' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়।

(৫) মেটিয়াবুরুজের[৫] কোন কোন স্থানে উপরের প্রায় ১০' ফুট গভীর সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে সাদা ঝরঝরে বালি বাহির হয়। কোন কোন স্থানে উপরের ১০' ফুট সাধারণ আঁটাল মাটির নিম্নে প্রায় ১৩'।১৪' ফুট লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে প্রায় ১৪' ফুট গভীর কাল আঁটাল কর্দ্দম বর্ত্তমান আছে। কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত কালের জঙ্গল। সম্ভবতঃ উক্ত কাল আঁটাল কর্দ্দম পূর্ব্বে লাল আঁটাল কর্দ্দমরূপে অতীত কালের জঙ্গলের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। কালক্রমে মাটি-চাপা জঙ্গলের অঙ্গার-সংস্পর্শে কাল হইয়া গিয়াছে।

(৬) খুলনার[৬] স্থানবিশেষে উপরের ৪'।৫' ফুট দোআঁশ মাটির পর প্রায় ৭'।৮' ফুট

---

* যশোহর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে পঠিত।

১-৬। খিদিরপুরস্থ ২।১ পদ্মপুকুর স্কোয়ার নিবাসী মিঃ আর, সি বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দম পাওয়া যায়। এই লাল আঁটাল কর্দ্দমের পর প্রায় ১২´।১৩´ ফুট কাল আঁটাল কর্দ্দম দেখা যায়। এই কাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নেই অতীত জঙ্গলের নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই কাল কর্দ্দম পূর্ব্বে লাল ছিল। জঙ্গলের অঙ্গার-সংস্পর্শে কাল হইয়াছে।

(খ) মগরাহাটের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) উস্তির কোন কোন স্থানে ২´।৩´ ফুট সাধারণ পলির পর শাদা বালি ও কোন কোন স্থানে ২´।৩´ ফুট সাধারণ পলির পর ঈষৎ ফেকাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। ইহার স্থূলতা ৩´ ফুট হইবে। এই লাল আঁটাল কর্দ্দম কোন কোন স্তর-বিন্যাসে অত্যন্ত গাঢ় রঙের; এমন কি, গেরী মাটি বলিয়া ভ্রম হয়। এরূপ স্তর-বিন্যাসে ইহা প্রায় উপর হইতে ১০´।১১´ ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। এই গেরী মাটির মত গাঢ় লাল রঙের আঁটাল কর্দ্দম-স্তরের বেধ প্রায় ৩´।৪´ ফুট হইবে।

(২) ডায়মণ্ডহারবার হইতে সরিশা যাইবার পথে এক স্থানে ২´।২.৫´ ফুট সাধারণ দোআঁশ মাটির নিম্নে লাল আঁটাল কর্দ্দম দৃষ্ট হয়। রং গাঢ় লাল।

(৩) সরিশার কিছু পশ্চিমে, কোন স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়। একটি ভদ্রলোক ঐ কর্দ্দম দেখিয়া বলিয়া উঠেন,—"গেরী মাটি কোথা হইতে আসিল ?"

(৪) আলমপুর,[১] নুন্সি ও বজবজে, মাটি খুঁড়িতে লাল বা ফেকাসে লাল রঙের মাটির স্তর বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

(৫) মাকড়দায়[২] এক স্থানে পুকুর খুঁড়িতে অত্যন্ত লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর বাহির হয়। এই কর্দ্দম এত লাল যে, পুকুরের পাঁক পর্য্যন্ত লাল দেখায়।

(৬) মাজুর[৩] নিকট কোন কোন স্থানে উপরের ৩´।৪.৫´ ফুট লাল দোআঁশ মাটির নিম্নে বড় দানাযুক্ত লাল বালি বাহির হইয়াছে। এ স্থানে বলিয়া রাখি, মাজু অঞ্চলের পলি ও দোআঁশ মাটি লাল বা লালচে; কিন্তু কলিকাতার নিকটের গঙ্গার পলি ও দোআঁশ মাটি শাদাটে বা মেটে রং বলিতে যাহা বুঝা যায়, সেইরূপ।

(৭) আমতায়[৩] লাল দোআঁশ ও লাল আঁটাল কর্দ্দম অত্যন্ত সাধারণ। কোন কোন স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম গেরী মাটির মত লাল ও জমীর উপরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার নিম্নে বালি পাওয়া যায়। বালির রং লাল বা লালচে। ইহার দানা কিছু বড়। এই বালি বর্ত্তমান দামোদরের বালি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দামোদরের বালির দানা ছোট ও রং শাদাটে। দামোদরের বালি শাদাটে বটে, কিন্তু কলিকাতার স্তর-বিন্যাসের ও কলিকাতার

১। আলমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। মাকড়দা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। আমতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

গঙ্গার বালি হইতে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত লাল আঁটাল কর্দ্দমের স্তর প্রায় ৬´ ফুট হইবে। কোন কোন স্থানে উপরের ৬´।৭´ ফুট লালচে দোআঁশ মাটির নিম্নে প্রায় ৬´।৭·৫´ ফুট ফেকাসে লাল রঙের আঁটাল কর্দ্দম বাহির হয়।

(৮) তারকেশ্বরে লাল বালি উঠান হয়। ইহা মগরার বালির মত। এই স্থানের কর্দ্দম গাঢ় লাল। ইহা বালির উপরে অবস্থিত।

(৯) মগরার[1] নিকটবর্ত্তী সুলতানগাছার ৩´ ফুট হইতে ৬´ ফুট নিম্নে লাল ও বড় দানা-বিশিষ্ট বালি পাওয়া যায়। এই বালি-স্তরের প্রথম ২″।৪″ ইঞ্চি গাঢ় লাল রঙের ও শক্ত। ইহা মুষ্টির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। উক্ত বালিই মগরার বালি নামে বিখ্যাত। সুলতানগাছার এই বালির উপরের কর্দ্দমস্তর ৩´ হইতে ৬´ ফুট গভীর। এই কর্দ্দমস্তর নিম্নভাগে অত্যন্ত লাল, কিন্তু যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, ততই ফেকাসে বলিয়া অনুমান হয়। জমীর উপরের কর্দ্দম সাধারণত ঈষৎ লাল। জমীর উপর কিছু খুঁড়িয়া, নিম্ন হইতে কর্দ্দম উঠাইয়া, সেই কর্দ্দমে দেওয়ালের গাত্র লেপন করিলে, বাড়ীর রং গাঢ় লাল দেখায়। সুলতানগাছার বালিতে মৃৎপাত্রের অংশ, প্রস্তরগুটিকা ও বালির গুটিকা বা চাপ পাওয়া যায়। মৃৎপাত্রের ক্ষুদ্রাংশটির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ইহা ভাঙ্গিলে ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাটির পরদা দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে করতজ (quartz) লক্ষিত হয়। মৃৎ-পাত্রের ভাঙ্গা ক্ষুদ্র অংশগুলি চুম্বক দ্বারা অত্যন্ত জোরের সহিত আকৃষ্ট হয়। মৃৎপাত্রের অংশটি জল-মিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বুজবুজ করে না। ইহা বালির স্তরের উপরের অংশে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বালি পতনের শেষ অবস্থা মনুষ্যের সভ্যতার সময় ঘটিয়াছে। প্রস্তরগুটিকাগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। এগুলি ভাঙ্গিলে ভিতর কাল দেখায়; কালর সঙ্গে ঈষৎ লাল আভাও লক্ষিত হয়। কাল অংশ ঘষিলে গেরী মাটির মত রং বাহির হয়। গুটিকাগুলির ভিতরে করতজ দেখা যায়। এগুলির—অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্প-সংখ্যকই অতি নিকট হইতে চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত হইলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে গুটিকাগুলি বুড়বুড়ী দেয় না। প্রস্তর-গুটিকাগুলি ক্ষার-প্রস্তরের ধ্বংসে উৎপন্ন হইয়াছে অনুমান হয় ও তৎপরে জলস্রোতে আসিয়া বালির সহিত সঞ্চিত হইয়াছে। এ প্রস্তরগুটিকাগুলিকে লাটেরাইট বলা চলে। বালির গুটিগুলির উপরিভাগ গেরী মাটির মত লাল। ভিতর কাল, কিন্তু ঈষৎ লাল আভাযুক্ত। কাল অংশ ঘষিলে গেরী মাটির মত লাল দেখা যায়। এই কাল অংশের

১। প্রায় ৫ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত কানাইলাল সান্যাল এম্ এস্ সি মহাশয় মগরায় বালির ভূতত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমিও ছিলাম। শ্রীযুক্ত সান্যাল মহাশয় তাঁহার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই। যাহাই হউক, এই অনুসন্ধানের ফলে সুলতানগাছা, মানাদ ইত্যাদি স্থানের ভূতত্বে আমার মোটামুটী ধারণা ছিল। প্রবন্ধ লিখিতে আর যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা সুলতানগাছানিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার অতি অল্পসংখ্যকই অতি ক্ষীণভাবে চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত করিলে বহুসংখ্যক গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বালির গুটির কাল অংশ বুড়বুড়ি দেয় না। এ কাল অংশগুলি পূর্ব্বে, উপরোক্ত প্রস্তরগুটিকা ছিল। ক্রমে ধ্বংস হইয়াছে ও বালির দানা এগুলির চারি দিকে যুক্ত হইয়াছে। সুলতানগাছার বালির সহিত গণ্ডোয়ানা[1] প্রস্তরাবলির অন্তর্গত—"Iron-stone shale"এর ক্ষুদ্রাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১০) বর্দ্ধমানের[2] রাঙ্গা মাটি প্রবাহে দাঁড়াইয়াছে। এই স্থানের কোন কোন অংশের মাটি লাল ও কোন কোন অংশের মাটি অল্প ফেকাসে। স্তর-বিন্যাসের কোন কোন অংশে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যায়। এই লাল বালি কোন স্তর-বিন্যাসের উপর হইতে ২"।৩" ইঞ্চি নিম্নে ও কোন স্তর-বিন্যাসের ৪´ ফুট নিম্নে দৃষ্ট হয়। বাঁকা নদীর শাখা খোদীর তীর হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে, এই বালি মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া যায়। কোন স্থানে উপর হইতে প্রায় ২´ ফুট নিম্নে, ৪´ ফুট গভীর লাল বালিযুক্ত লাল মাটি দেখা যায়।

(১১) আসানসোলের[3] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালাতে বড় দানাবিশিষ্ট লাল বালি পাওয়া যায় ও এই বালির উপরের ২"।৩" ইঞ্চি অত্যন্ত লাল ও ঈষৎ শক্ত। এই শক্ত বালি মুষ্টির ভিতর রাখিয়া চাপ দিলে গুঁড়া হইয়া যায়। সুলতানগাছার বালুকা-স্তরের উপরিভাগে এইরূপ গাঢ় লাল ও ঈষৎ শক্ত ২"।৪" ইঞ্চি বালি পাওয়া যায়। আসানসোলে পাঁচেট যুগের কর্দ্দম-প্রস্তর বর্ত্তমান আছে; ইহা অত্যন্ত লাল। এই স্থানে লাটেরাইট নামক লাল প্রস্তর পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার প্রস্তর হইতে লাল বালি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হয়। আসানসোলে "Iron-stone shale" প্রস্তরও আছে। মগরার বালির ভিতর যেরূপ প্রস্তর-গুটিকা পাওয়া যায়, আসানসোলের জমির উপর ও ক্ষুদ্র নালার লাল বালির ভিতর ঐরূপ প্রস্তরগুটিকা প্রচুর দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই প্রস্তরগুটিকা ও স্থানীয় লাটেরাইট এক ও একই প্রস্তর হইতে উৎপন্ন। আসানসোলের কর্দ্দম প্রচুর লৌহময়।

(গ) মগরাহাটের দক্ষিণের কয়েকটি স্থানের বিবরণ,—

(১) মজিলপুরের[4] স্তর-বিন্যাসে লাল আঁটাল কর্দ্দম-স্তর নাই। উপরের ৩´ ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর প্রায় ৭´ ফুট আঁটাল কর্দ্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক। এক স্থানে

১। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পূর্ণগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দে সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

৩। প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতত্ত্বের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ, এফ্‌ জি এস্‌ মহাশয় ছাত্রদিগকে লইয়া ভূতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য আসানসোলে যান। আমি এই সঙ্গে গিয়াছিলাম ও লাল বালির ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলাম।

৪। খিদিরপুরস্থ ২।১ পদ্মপুকুর রোয়ার নিবাসী মিঃ আর, সি, বান্দার্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি জমির উপর দেখা যায়। ইহার বেধ প্রায় ৪´।৫´ ফুট, লাল কর্দ্দমের রং বেশী ফেকাসে হইলে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়।

(২) ফুটীগোদার[১] স্তর-বিন্যাসে লাল কর্দ্দম-স্তর দৃষ্ট হয় নাই। এ স্থানের উপরে ৩´ ফুট দোআঁশ মাটি, তাহার পর ৬´ ফুট আঁটাল কর্দ্দমস্তর। আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে কাল পাঁক দেখা যায়।

(৩) পিলারটাটে লাল আঁটাল কর্দ্দম নাই। এ স্থানের উপরে ৭.৫´ ফুট বালি-মিশ্রিত আঁটাল কর্দ্দম ও ইহার নিম্নে কাল পাঁক।

২। রাঙা মাটির উৎপত্তি

মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরের যে যে স্থানে লাল কর্দ্দম পাওয়া গিয়াছে, তাহা রঙে প্রায় এক প্রকার। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্ত যে লাল মাটি পাওয়া যায়, তাহার রঙে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। বিশেষত্ব এই যে, মগরাহাট হইতে যতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, ততই লাল রং ক্রমে বেশী গাঢ় হইতে থাকে ও স্তরগুলিও অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয় ও লাল কর্দ্দমের সহিত লাল বালি বাহির হয়। মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর, উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে লাল কর্দ্দম-স্তরের কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, ঐ সকল একই নৈসর্গিক কারণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে এই নৈসর্গিক কারণ ব্যতীত আরও কোন বিশেষ অবস্থা ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে এই দেশের কর্দ্দমস্তরের রঙের বিশেষত্ব বা ক্রমিক-গাঢ়তা ঘটিয়াছিল। বিশেষ অবস্থা এই যে, দামোদরের একটি শাখা ডায়মণ্ডহারবারের উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া, মগরাহাট পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। এই শাখা এখন বিদ্যমান নাই। শিবপুরের নিম্নে গঙ্গা, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরে প্রবাহিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটি পূর্ব্বে মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে পূর্ব্বোল্লিখিত রঙের বিশেষত্বের বা ক্রমিক-গাঢ়তার সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাউক, লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি-স্থান কোথায়। আমরা দেখিয়াছি, আসানসোল ও মগরার লাল বালির উপর ২´´।৩´´।৪´´ ইঞ্চি গভীর গাঢ় লাল রঙের শক্ত বালি পাওয়া যায়। উভয় স্থানের বালিতে ক্ষার-প্রস্তর-গুটিকা পাওয়া যায়। এগুলি লাটেরাইটের অংশ। দুই স্থানের বালিতে Ironstone shale নামক প্রস্তরের ক্ষুদ্র অংশ দেখা যায়। আসানসোলের পাঁচেট ও লাটেরাইট প্রস্তর-ধ্বংসে লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি হয়। দামোদর আসানসোলের গণ্ডোয়ানা প্রস্তরাবলির[২] ভিতর দিয়া প্রবাহিত

১। খিদিরপুরস্থ ২১৷১ পদ্মপুকুর স্কোয়ার নিবাসী মিঃ আর, সি, বানার্জ্জির নিকট হইতে সংগৃহীত।

২। The Coal fields of India (Raniganj Section) by George A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

হইতেছে। কিছু নিম্নে দামোদরের কয়েকটি প্রবল শাখা—মানাদ, সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু প্রভৃতি স্থানের ভিতর দিয়া বহিত। এখন এগুলি মজিয়া গিয়াছে। ইহাদিগের পথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে কতকটা প্রদর্শিত আছে। মানাদ সম্বন্ধে এখনও প্রবাদ আছে যে, এ স্থানে অনেক নদী মিশিয়া একটি প্রকাণ্ড জলরাশির সৃষ্টি করিয়াছিল। আসানসোল হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানের পূর্ব্ববিবৃত লাল কর্দ্দম ও লাল বালির বিবরণ ও ভূতত্ত্ব, বিশেষতঃ দামোদরের বিলুপ্ত শাখাগুলির পথ, বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে, আসানসোলের পাঁচেট, লাটেরাইট ও Ironstone shale প্রভৃতি প্রস্তর হইতে উৎপন্ন ধ্বংস পদার্থ ও মৃৎপাত্রাংশ প্রভৃতি আসানসোলের জমীর উপরের দ্রব্যাদি, দামোদর ও দামোদরের শাখা জলস্রোতে বহন করিয়া, সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু, আমতা, মাকড়দা, এমন কি, মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে, জলের বহন করিবার ক্ষমতায় ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্তির অনুসারে প্রস্তরগুটিকা, মৃৎপাত্রাংশ, লাল বালি ও লাল কর্দ্দম বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাহা হইলে সুলতানগাছা হইতে মগরাহাট পর্য্যন্ত স্থানের, লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তিস্থান আসানসোল অঞ্চলের পাঁচেট, লাটেরাইট ইত্যাদি প্রস্তরাবলী। মগরাহাট (চক্রদহ), উত্তি, সরিশা, সরিশার কিছু পশ্চিমের স্থান ও মাকড়দার জলস্রোত অতি কম থাকায় লাল কর্দ্দম-স্তর বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মাজু, আমতা, তারকেশ্বর, সুলতানগাছা প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে জলস্রোত কিছু বেশী থাকায় বালি সঞ্চিত হইয়াছিল। এই স্থানগুলিতে বালি পড়িয়া নদীর তলদেশ যতই উচ্চ হইতে লাগিল, জলের বহু দূর পর্য্যন্ত বালি ও কর্দ্দম বহিবার শক্তি ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। সেই জন্ত যে সকল স্থানে পূর্ব্বে বালি পড়িয়াছিল, তাহার উপর এখন লাল কর্দ্দম পড়িতে লাগিল ও বালি নদীর আরও উজান দিকে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে অনেক নদী ও নালা মজিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে কালে দামোদরের বহু উজান দিকে অবস্থিত আসানসোলের নালাগুলিতে বালি পড়িয়া পূর্ব্বের প্রবল জলস্রোত ক্ষীণ করিয়া ফেলিল। এখন বালি নালাতেই সঞ্চিত হয় ও লাল কর্দ্দমযুক্ত জল নদীপথে বাহির হইয়া আসে ও তীর-ভূমির উপর লাল কর্দ্দম নিক্ষেপ করে। পূর্ব্বোক্ত জলস্রোত কমিবার আর একটি বিশেষ কারণ, বৃষ্টিপাত পূর্ব্ব অপেক্ষা কমিয়া আসা। ইহার বিষয় পরে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বৃষ্টিপাত পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে বলিয়া আসানসোলের প্রস্তরাবলি হইতে লাল বালি ও লাল কর্দ্দমও কম উৎপন্ন হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, আসানসোল অঞ্চল লাল বালি ও লাল কর্দ্দমের উৎপত্তি-স্থান হইলে জমডাল, আমতা প্রভৃতি ইহার নিম্নের দিকের স্থানসমূহের দামোদর-গর্ভে শাদাটে রঙের বালি পাওয়া যায় কেন? তবে কি দামোদর-গর্ভে এখন যেরূপ শাদাটে বালি বিক্ষিপ্ত হয়, পূর্ব্বেও সেইরূপ হইত? আবার দেখা যায়, আমতার জমী খুঁড়িলে লাল বালি পাওয়া যায়; মাজুতেও তাই। এ সকল স্থান দামোদরের উপরে বা অতি সন্নিকটে। বর্ত্তমান কানা নদী ও কুন্তল নদী ইত্যাদি দামোদরের শাখা ছিল। উক্ত শাখার পলিভূমির উপর মানাদ,

সুলতানগাছা, তারকেশ্বর, মাজু ইত্যাদি স্থান। এই সকল স্থানে কুন্তল ও কানা ইত্যাদি নদীগুলির মজা গর্ভদেশ খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমতা ও মাজুর মাটি খুঁড়িলে লাল বালি বাহির হয় ও এই স্থানগুলি বর্ত্তমান দামোদরের উপর বা অতি সন্নিকটে। এই সকল বিষয় হইতে স্থির বলা যাইতে পারে, আসানসোলের নিম্নে বর্ত্তমান দামোদর-গর্ভ খুঁড়িলে, উপরের শাদাটে বালির পর লাল বালি বাহির হইবে। আসানসোলের নালাগুলি বালি পড়িয়া রুদ্ধ হওয়ায় কেবল লাল কর্দ্দমময় জল বাহির হইয়া আসে ও দামোদরের দুই পারে (বাঁধ না থাকিলে) বহু দূর পর্য্যন্ত এখনও লাল কর্দ্দম নিক্ষেপ করিত। আর আসানসোলের উত্তর-পশ্চিমে[১] ও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত দামোদর ও বরাকর নদদ্বয় ধরিয়া গেলে পাঁচেট বা লাটেরাইট প্রস্তর পাওয়া যায় না, এই জন্যই এ অঞ্চলের বালি শাদা। এই বালিই ক্রমে নিম্নের দিকে অনডাল, আমতা প্রভৃতি স্থানে দামোদর-গর্ভে আসিয়া পড়িয়াছে ও পূর্ব্বের লাল বালিকে চাপা দিয়াছে।

লাটেরাইট প্রস্তর আসানসোল হইতে উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদ জিলাতে[২] ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। আসানসোলের উত্তরের এবং বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত লাটেরাইটময়[২] দেশ দিয়া যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে, এই নদীগুলি গঙ্গার জলে লাটেরাইট প্রস্তরের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন লাল কর্দ্দম আনিয়া দেয় ও পূর্ব্বেও দিত। মগরার পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত যে লাল কর্দ্দম-স্তর লক্ষিত হয়, উহা গঙ্গার এই লাল কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রায় ৫৫০০ বৎসর হইল,[৩] অতীত-জঙ্গলময় দ্বীপগুলি কর্দ্দম-চাপা পড়িয়াছে। আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের নিদর্শন[৪] প্রায় ৮।১০ হস্ত বা ১২´।১৫´ ফুট নিম্নে পাওয়া যায়। কলিকাতা ও আমতা এক অক্ষাংশে। গঙ্গা-দামোদর পলিভূমির গঠন, দক্ষিণে বিস্তৃতি লাভ ও পতন[৫] যেরূপ ভাবে হইয়াছে, তাহাতে এক অক্ষাংশের কতকগুলি পরিবর্ত্তন মোটামুটি এক প্রকার ধরা যাইতে পারে। কলিকাতা ও আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গল একই সময়ে হইয়াছিল ধরিয়া লইলাম। আর ধরিয়া লইব, এই দুই স্থানের অতীত জঙ্গল একই সময়ে, একই কারণে নিমজ্জিত ও মাটি-চাপা পড়িতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে দেখা যায়, $\frac{৫৫০০}{১২}$ = ৪৫৮ বা $\frac{৫৫০০}{১৫}$ = ৩৬৭ বৎসরে এক ফুট কর্দ্দম আমতা অঞ্চলে অতীত জঙ্গলের উপর পড়িয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ৪০০ বৎসরে

১। The Coal fields of India (Raniganj section) by george A. Stonier, Late Chief Inspector of mines in India.

২। A Manual of the geology of India Revised and largely rewritten by R. D. Oldham A R. S. M. page 174-177.

৩। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—মৎকৃত।

৪। আমতানিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

৫। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—মৎকৃত।

মোটামুটি এক ফুট করিয়া কর্দ্দম আমতা অঞ্চলে সঞ্চিত হইয়াছিল। কলিকাতা অঞ্চলে মোটামুটি ২৬০ বৎসরে এক ফুট করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।[১]

আমরা দেখিয়াছি, আমতা অঞ্চলে অতীত মাটি-চাপা জঙ্গলের উপর অন্ত কর্দ্দমস্তর ব্যতীত লাল কর্দ্দমস্তর প্রায় ৬´।৭.৫´ ফুট দেখা যায়। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অতীত জঙ্গলের উপর অন্ত কর্দ্দমস্তর ব্যতীত মোটামুটি ১৩´ ফুট হইতে ২০´ ফুট, এমন কি, ২২´ ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল কর্দ্দমস্তর দেখা যায়। নানা পার্থক্য ও বিশেষত্ব থাকিলেও উপরোক্ত বিষয়গুলি হইতে ইহা বলা যায়, দামোদর যত লাল কর্দ্দম বহন করিয়াছে, গঙ্গা তাহা হইতে অনেক বেশী লাল কর্দ্দম আনিয়াছে। আর দেখা যায়, যতটা দেশ হইতে লাল কর্দ্দম ধৌত হইয়া দামোদরে আসিয়াছে, তাহা হইতে যতটা দেশ ধৌত হইয়া লাল কর্দ্দম গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা অনেক বেশী।

কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে মোটামুটি ১৩´ ফুট হইতে ২০´ ফুট, এমন কি, ২২´ ফুট পর্য্যন্ত গভীর লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হয়। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে যখন লাল আঁটাল কর্দ্দম উপরে বর্ত্তমান থাকে, তখন ইহার বেধ কিছু কম হয়। সম্ভবতঃ ধৌত হওয়ায় কমিয়া গিয়াছে। লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তরের উপর কোনও স্থানে ২´।৩´ ফুট দোআঁশ মাটি ও কোন স্থানে ১০´ ফুট আঁটাল কর্দ্দমস্তর লক্ষিত হয়। তাহা হইলে এই স্থানগুলিতে দোআঁশ মাটি ও আঁটাল কর্দ্দম, লাল কর্দ্দমস্তর হইতে নূতন। যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম উপরেই বর্ত্তমান আছে, সে স্থানের নিকট যে দোআঁশ মাটি পাওয়া যায়, তাহা লাল আঁটালের ঢালু গাত্রের উপর পড়িতে দেখা যায়। তাহা হইলে এ স্থানেও দোআঁশ মাটি, লাল আঁটাল কর্দ্দম হইতে নূতন। অবশ্য যে স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দমের নিম্নে দোআঁশ মাটি পাওয়া যাইবে, সে স্থানে দোআঁশ মাটি পুরাতন। এরূপ ব্যাপার কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্তরবিন্যাসে দেখা গিয়াছে। আর গঙ্গার পলিভূমির গঠন ও বিস্তৃতি লাভ[১] হইতে দেখা যায় যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানসমূহ উত্তরের ও পূর্ব্ব-উত্তরের স্থানসমূহ হইতে নূতন। মগরাহাটের দক্ষিণে কোন কোন স্থানে (যেমন মজিলপুরের এক স্থানে) ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি উপরে দেখা যায়। ইহা প্রায় ৪´।৫´ ফুট গভীর; ইহার নিম্নে বালি। এ স্থানে বলিয়া রাখি, লাল কর্দ্দম, অত্যন্ত ফেকাসে হইলে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত হয়। বেশী পরিমাণ লৌহ থাকিলে কর্দ্দমের রং গাঢ় লাল হয়। লৌহের পরিমাণ যতই কম হয়, কর্দ্দমের রং ততই ফেকাসে দেখায়। লৌহের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইলে কর্দ্দম ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দেখায়। যাহাই হউক, এই ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লাল আঁটাল কর্দ্দমস্তর হইতে অনেক বিভিন্ন। বিভিন্নতা এই,—একটি লাল, একটি ঈষৎ লাল আভাযুক্ত, একটি আঁটাল, অন্যটি দোআঁশ, একটি বহু পুরাতন, একটি নূতন। মোটামুটি বলা যায়, ঈষৎ লাল আভাযুক্ত দোআঁশ মাটির

১। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—দ্রষ্টব্য।

উৎপত্তিস্থান ও নিক্ষেপণ হিসাবে লাল আঁটাল কর্দ্দমের সহিত এক প্রকার। কিন্তু কাল হিসাবে ও যতটা লাল কর্দ্দম গঙ্গায় পূর্ব্বে আসিত ও পরে যতটা আসিয়াছে, সেই হিসাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লাল কর্দ্দমস্তর পুরাতন ও এইগুলির স্থূলতাও অত্যন্ত অধিক; আর দেখা গিয়াছে যে, মগরাহাটের দক্ষিণের স্থানগুলি নূতন ও এ স্থানে যে ঈষৎ লাল আভাযুক্ত কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়, তাহার স্থূলতা কম, দোআঁশলা ও রঙে অত্যন্ত ফেকাসে। এই সকল হইতে অনুমান হয়, গঙ্গা যে দেশ হইতে লাল কর্দ্দম পায়, সেই দেশ, পূর্ব্বে বেশী লাল কর্দ্দম উৎপন্ন করিত ও বেশী লাল কর্দ্দম সেই দেশ হইতে ধৌত হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িত। ইহা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে।

এখন মোটামুটি কাল নির্ণয় করা যাউক। কলিকাতার নিকট লাল আঁটাল কর্দ্দমের উপর প্রায় ১০ ফুট সাধারণ আঁটাল দেখা যায়। মেটে রং বলিতে যে রং বুঝা যায়, এই আঁটালের সেই রং। কলিকাতার নিকটে পলি পতনের হার ২৬২ বৎসরে এক ফুট। ইহা যে স্থান (নলগোঁড়া) হইতে লওয়া হইয়াছে, সে স্থানের পলি দোআঁশলা ও সে স্থানের ভূমি যেমন পতিত হইতেছে, তেমন পলিও সঞ্চিত হইতেছে। খুব কম দিন পর্য্যন্ত পলি সঞ্চয়ের কোন বাধা হয় নাই[১]। উপরোক্ত সাধারণ আঁটালের পতনের হার দোআঁশলা মাটি পতনের হার হইতে কিছু বিভিন্ন হইবে। আর সাধারণ আঁটাল মাটি বহু দিন ধরিয়া ধৌত হইতেছে ও ইহার উপর বহু দিন আর কর্দ্দম সঞ্চয় হয় নাই। এই সকল বিষয় হইতে যদি ১০´ ফুট সাধারণ আঁটালের স্থানে ১৩´ ফুট ধরি, তাহা হইলে অনেক ভ্রম সংশোধিত হয়। এখন ২৬২ × ১০ = ২৬২০, ২৬২ × ১৩ = ৩৪০৬। তাহা হইলে মোটামুটি ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গায় লাল কর্দ্দম বেশী আসিত ও যে স্থান হইতে লাল কর্দ্দম উৎপন্ন হইত, তাহাও বেশী ধৌত হইত ও কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে লাল আঁটাল কর্দ্দম ১৩´ ফুট হইতে ২২´ ফুট গভীর। এখন ২৬২ × ১৩ = ৩৪০৬, ২৬২ × ২২ = ৫৭৬৪। তাহা হইলে মোটামুটি ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া গঙ্গা বেশী লাল কর্দ্দম পাইয়াছে ও লাল কর্দ্দম উৎপত্তির স্থান বেশী ধৌত হইয়াছে; শেষ কথা—প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বৎসর ধরিয়া লাল কর্দ্দম উৎপত্তিস্থানে বেশী বৃষ্টি হইত ও লাল কর্দ্দমও বেশী উৎপন্ন হইত। ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টি ও লাল কর্দ্দম উৎপন্ন ও ধৌত হওয়া বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে।

৩। সংক্ষিপ্ত সার

(১) মগরাহাটের পূর্ব্ব-উত্তর ও উত্তরে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর পাওয়া যায়, ঐ সকল

১। অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—মৎকৃত।

গঙ্গার জল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই কর্দ্দম বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত লাটেরা-ইট প্রস্তরময় দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে।

(২) মগরাহাটের পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কর্দ্দম-স্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। দামোদরের একটি শাখা বর্ত্তমান ডায়মণ্ডহারবারের কিছু উত্তরে, পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া মগরাহাটে পৌঁছিয়াছিল। গঙ্গা কালীঘাটের পথ হইতে, উলুবেড়িয়ার পথ কাটিয়া, ঐ পথে চালিত করিলে ডায়মণ্ডহারবারের উত্তরস্থিত দামোদরের শাখাটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই শাখাটির জন্যই মগরাহাটের যতই পশ্চিমে ও তৎপরে উত্তরে যাওয়া যায়, লাল আঁটাল কর্দ্দমের স্তরগুলির রং ক্রমে গাঢ় হইতে থাকে ও ক্রমে লাল বালিও দেখা যায়।

(৩) আসানসোলের নিম্নে, দামোদর-গর্ত্ত খুলিলে মগরার বালির মত লাল বালি পাওয়া যাইবে। এই লাল বালির উপরিস্থিত শাদাটে বালি আসানসোলের উপর হইতে দামোদর-পথে আসিয়া এই নিম্ন দামোদরে আসিয়া পড়িয়াছে ও লাল বালি চাপা দিয়াছে।

(৪) সুলতানগাছার বালি পতনের শেষ কাল, মনুষ্য-সভ্যতার সময়।

(৫) গঙ্গা, দামোদর অপেক্ষা বেশী পরিমাণ লাল কর্দ্দম বহন করে। দামোদর লাটেরা-ইট প্রভৃতি প্রস্তরময় দেশের যতটা পরিসরের ধোয়াট প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা গঙ্গা অনেক বেশী পরিসরের ধোয়াট্ বহন করিয়া থাকে।

(৬) আমতা অঞ্চলে বা কলিকাতার এক অংশে দামোদর-পলিভূমিতে ৪০০ বৎসরে ১ ফুট করিয়া পলি সঞ্চিত হইয়াছে।

(৭) বঙ্গদেশের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থিত দেশসমূহে পূর্ব্বে যেরূপ বৃষ্টি হইত ও প্রস্তর ধৌত হইত, এখন তত বৃষ্টি হয় না ও সেই জন্য প্রস্তরগুলিও তত ধৌত হইতে পারে না। প্রায় ২৫০০ হইতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় ৫০০০ ও ততোধিক বর্ষ ধরিয়া বেশী বৃষ্টি হইত ও বিশেষভাবে প্রস্তর পরিবর্ত্তন করিতে ও ধৌত করিতে পারিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

গঙ্গা-দামোদর পলিভূমি।

(গভর্মেণ্টের ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে অঙ্কিত।)

দামোদর
মানাদ
সুলতানগাছা
মগরা
কুন্তী নদী
কানা নদী
তারকেশ্বর
কানা দামোদর
দামোদর
হুগলী নদী
মাকরদা
রাজাপুর বিল
মার্জু
আমতা
শিবপুর
কলিকাতা
কাটা গঙ্গা
মেটিয়াবুরুজ
আলিপুর
নুঙ্গি
বজবজ
উলুবেড়িয়া
দামোদর
আলমপুর
রাজপুর
চাংড়িপোতা
বারুইপুর
চাঁদপালা
দামোদরের বিলুপ্ত শাখা
মগরাহাট
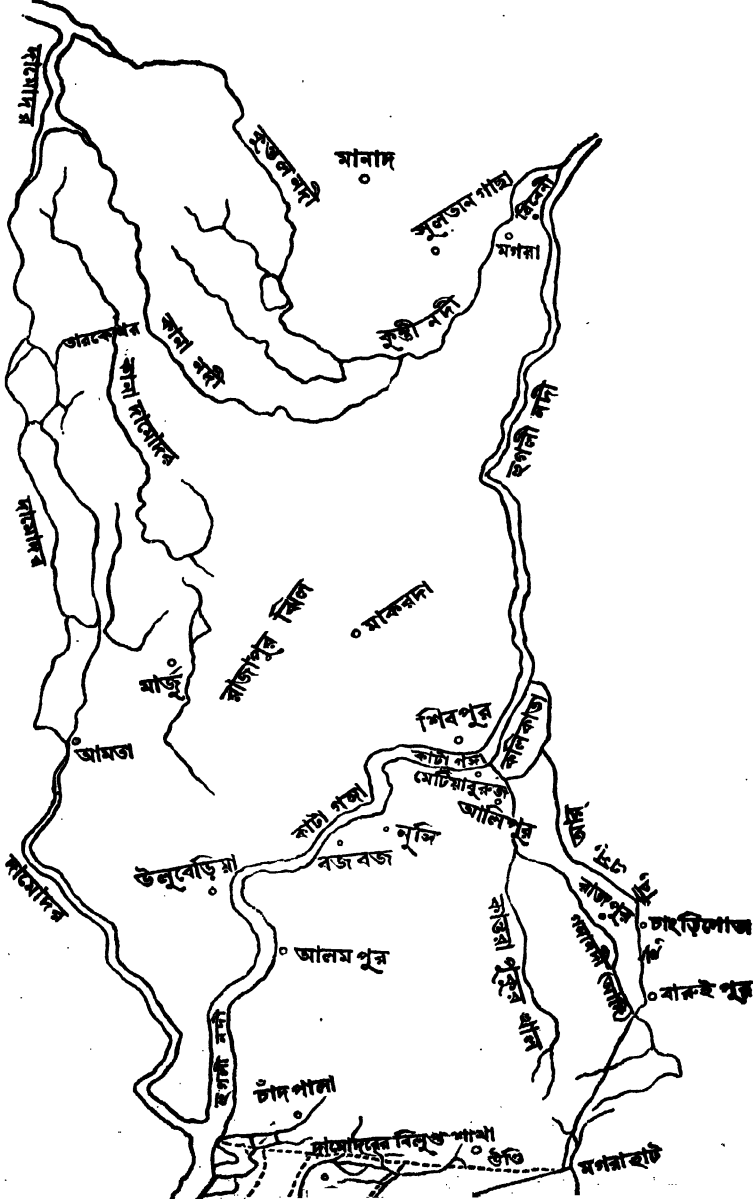
ঋকার-তত্ত্ব

§ ১। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্থানান্তরে[1] এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, আজো কিছু বলিব। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ আমার ঐ পূর্ব্বোক্ত কথার সহিত বর্ত্তমান কথা কয়টি মিলাইয়া পড়িতে পারেন। বক্তব্য বিষয়ে বৈদিক ও অন্যান্য বহু প্রমাণ সেই স্থানে দিয়াছি, অতএব এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না।

§ ২। বৈদিক ভাষায় ঋকার নিজের স্বাভাবিক রূপ ভিন্ন আরো কয়েক প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই সমস্ত রূপকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করিব, (১) স্বরাদি, ও (২) ব্যঞ্জনাদি। স্বরাদি ও ব্যঞ্জনাদি আবার প্রত্যেক চারি ভাগে বিভক্ত।

§ ৩। (১) স্বরাদি রূপ, যথা—

(ক) ঋ=অ র্, যথা—

√ কৃ হইতে (ক র্+উ+তি) ক রো তি (ঋ০)।
√ ভৃ „ (ভ র্+অ+তি) ভ র তি (ঋ০)।

(খ) ঋ=ই র্, যথা—

√ হৃ হইতে (জি-হি র্+স+তি) জি হী র্ষ তি (অথ০)।
√ কৃ „ (চি-কি র্+স + তি) চি কী র্ষ তি (অথ০)।[2]
√ কৄ[3] „ কি র (ঋ০, লোট্, ম০ এক০)।

(গ) ঋ=উ র্, যথা—

√ কৃ হইতে (কু র্+উ+ম স্) কু র্মঃ (ঋ০);
„ „ (কু র্+উ+হি) কু রু (ঋ০)।
„ „ (কু র্+উ) কু রু (=ঋত্বিক্), নিঘণ্টু, ৩. ১৮।
√ তৄ „ (ত—তু র্+ই) ত তু রি (ঋ০, =বিজেতা, দ্রঃ—পা০ ৭, ১,১০৩)।
√ ভৃ „ (ব্-ভু র্+স+তি) ব্ ভু র্ষ তি (ব্রা০; দ্রঃ—√ মৃ হইতে মু মূ র্ষ তি, ইত্যাদি, পা০ ৭, ১, ১০২)।

১। বা ঙ্ লা র উ চ্চা র ণ, প্রবাসী, ১৩১৮, বৈশাখ।

২। তুলঃ—পাণিনি, ৭.১.১০০, ও ইহার ব্যাখ্যা—"লাক্ষণিকস্যাপ্যত্র গ্রহণম্"—কাশিকা।

৩। ঋকার ঋকারেরই দীর্ঘ ভিন্ন কিছু নহে; হ্রস্বও উচ্চারণে কখনো দীর্ঘ হয়, আবার দীর্ঘও উচ্চারণে হ্রস্ব হয়। এই জন্যই পাণিনি কতকগুলি উকারান্ত ও ঋকারান্ত ধাতু হ্রস্ব হয় বলিয়া বিধান করিয়াছেন (৭.৩.৮০)। Macdonell সাহেব নিজের (বড় ও ছোট উভয়) বৈদিক ব্যাকরণেই বিদারণার্থক প্রচলিত দৄ ধাতুকে হ্রস্ব-ঋকারান্ত করিয়াই ধরিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব হিসাবে ইহা ঠিক হইলেও ব্যাকরণ হিসাবে ঠিক বলা যায় না।

(ঘ) ঋ=এ র্, এ রে

ঋকারের বস্তুত এতাদৃশ উচ্চারণ থাকিলেও সংস্কৃতের মধ্যে আমরা ইহা দেখিতে পাই না, সংস্কৃতের সহোদরা বা অপর কোনো তাদৃশ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ অবেস্তায় ইহা পাওয়া যায়। যথা—

সংস্কৃত	অবেস্তা
বৃ ক	বে হ্ র্ ক।[৪]
মৃ ত	* মে র্ ত, মে ষ।[৫]
পৃ ত না	* পে র্ ত না, পে ষ না (=সংগ্রাম)।
কৃ ত	কে রে ত।
আ ভৃ ত	আ বে রে ত।

§ ৪। ব্যঞ্জনাদি রূপ যথা-

(ক) ঋ=র, যথা-

ঋ জু (ঋ০) হইতে র জি ষ্ঠ (ঋ০, অবেস্তা র জি স্ত ;
লৌকিক সংস্কৃত ঋ জি ষ্ঠ, পা০ ৬, ৪, ১৬২)।
√ কৃ হইতে ক্র তু (দ্রঃ—উণাদি, ১, ৮০)।
√ দৃ হ্ „ দৃ হ (ঋ০, লোট্ ম০ এ০), দৃ ঢ় (ঋ০),
কিন্তু দ্র হ ৎ (ঋ০, 'দৃঢ় করিয়া')।
√ দৃ শ্ „ দ্র ষ্টু ম্ (ঋ০), দ্র ক্ষ্য তি (ব্রা০)।
√ মৃ দ্[৬] হইতে ম্র দ (ঋ০)।
স্র ক্ ন্ (ঋ০) ও স্র ক (ঋ০) উভয়ই হয়।

(খ) ঋ=রি, যথা—

√ কৃ হইতে ক্রি য় তে (ঋ০)।
√ মৃ „ ম্রি য় সে (ঋ০)।[৭]

৪। এখানে উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে এ র্ শব্দের মধ্যে হ আগম হইয়াছে। তুলঃ—বর্ত্তমান বিহারী ভাষায় (সর্ব্বিয়া—বত্তি জেলা, ও মধিসী—চম্পারণ জেলা) ম হ তা রি (=মা, মা তৃ শব্দ হইতে)।

৫। সংস্কৃত ত´=অবেস্তা ষ, See A Practical Grammar of the Avesta Language by K. E. Kanga, p. 37 ; Jackson's Avesta Grammar, Part 1. $ 163 ; Burgmann, Vol IV. 156.

৬। √ মৃ দ্ ও √ ম্র দ্ বস্তুত একই।

৭। √ ঋ (গতি)=√ রি (প্রবাহ), উভয়ই বৈদিক।

(গ) ঋ=রু, যথা—

বৃক্ষ=রুক্ষ[৮] (ঋ০, ৬, ৩,৭)।[৯]

√ দৃ (তুলঃ—দৃতি=চর্ম্ম বা চর্ম্মপুটক) অথবা √ দৄ হইতে

দ্রু (ঋ০, দারু, দারুপাত্র), দ্রুম (ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ, ৫,১১)।[১০]

(ঘ) ঋ=রে,[১১] যথা—

গৃহ হইতে * গ্রেহ, গেহ (বাজ০ স০ ৩০,৯)।

গৃহ্য „ * গ্রেহ্য, গেহ্য (ঋ০ ৩,১০,৭ ; বাজ০ স০, ১৬,৪৪)।

৮। সায়ণ এখানে ইহার অর্থ 'দীপ্ত' করিয়াছেন, কন্তু মূলে "ওষধী" শব্দের সহিত ইহার প্রয়োগ থাকায় বৃক্ষ অর্থই ভাল মনে হয়।

৯। পালি ও প্রাকৃতে বৃক্ষ স্থানে রুক্‌খ সুপ্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত রুক্ষ শব্দই পালি-প্রাকৃতের নিয়মে (অনাদিস্থিত ক্ষ=ক্‌খ) রুক্‌খ হইয়াছে। বৃক্ষের বকার অন্তস্থ হওয়ায় সহজেই তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য—√ বৃধ্—√ ঋধ্, বৃদ্ধি—ঋদ্ধি, বৃষভ—ঋষভ (জৈন সাহিত্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবকে বুঝাইতে বৃষভ শব্দও প্রযুক্ত হয়, দ্রঃ—লঘীয়স্ত্রয়, ১), বৃণোতি—উর্ণোতি।

১০। এই দ্রু শব্দ যে, √ দৃ অথবা ইহারই অপর রূপ √ দৄ ('বিদীর্ণ করা' বা 'বিদীর্ণ হওয়া') হইতে হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্য-ধাতুমালার (Aryan Roots) ইহা (√ দেরু, √ দৃ) অন্যতম। সংস্কৃত ও অবেস্তার দ্রু, সংস্কৃত দারু (অবেস্তা দাউরু), দৃতি, তরু, গ্রীক *drus* (=বৃক্ষ, বিশেষভাবে ওক), *drumos* (ওকের জঙ্গল, coppice), ও ইংরাজী *tree, tear* প্রভৃতি শব্দ এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন। দ্রষ্টব্য—Eur-Aryan Roots of J. Baly, Vol. I. p. 496 ; সংস্কৃতে দ্রু ও তরু শব্দের বড় বিচিত্র ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। অমরের টীকাকার ভানুজী-দীক্ষিত উণাদি সূত্র অনুসারে (১.১৭) দ্রু শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—"দ্রবতি উর্দ্ধং, দ্রু গতৌ...ড়ুঃ," যেমন শতদ্রু, ইত্যাদি। তরু শব্দের ব্যুৎপত্তি "তরতি, তরন্ত্যনেন ইতি বা (উণা০ ১.৭)। কিন্তু দারু শব্দের ব্যুৎপত্তি উণাদিসূত্রে (১.৩) ঠিকই করা হইয়াছে—"দীর্য্যতে ইতি দারু।" পাণিনি দ্রুম শব্দের ব্যুৎপত্তি ঠিক দিয়াছেন (৫.২.১০৮), দ্রু শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ম প্রত্যয়; কিন্তু তিনি দ্রু শব্দের ব্যুৎপত্তি দেন নাই। এখানে দ্রু শব্দের অর্থ দারু বা কাঠ, অতএব দ্রু, অর্থাৎ দারু বা কাঠ আছে বলিয়া বৃক্ষ দ্রুম। দ্রুম শব্দ সংহিতার মধ্যে পাওয়া যায় না, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে (৫ ১১) আছে, নিরুক্তেও পাওয়া যায় (৪.১৯, ইত্যাদি)। সংহিতার সময়ে দারু অর্থে দ্রু শব্দই ছিল। পরে দ্রু আছে বলিয়া বৃক্ষ-অর্থে দ্রুম হইল। তাহার পরে আবার দ্রু, দ্রুম উভয়ই বৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। স্পষ্টই দেখা যায়, পাণিনির সময় পর্য্যন্ত দ্রু দারু-অর্থেই প্রচলিত ছিল, পরে ঐ অর্থ লুপ্ত হওয়ায় অবিশেষে উভয় শব্দই বৃক্ষবাচী হইয়া পড়িলে পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ পাণিনির উল্লিখিত (৫.২.১০৮) সূত্রে দ্রুম শব্দ ব্যাখ্যা করিতে ব্যাকুল হইয়া লিখিতে বাধ্য হইলেন—"দ্রুর্বৃক্ষঃ সোঽস্যাস্তি অবয়বত্বেনেতি দ্রুমো হ্যপি বৃক্ষ এব" (!)।—সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ববোধিনী টীকা। দীর্ণ হয় বলিয়াই কাষ্ঠ দ্রু, দারু। অথবা ভূমি বিদীর্ণ করিয়া ইহা উঠে বলিয়া ঐ নাম হইতে পারে। তুলঃ—উদ্ভিদ্ (√ ভিদ্ বিদারণে)।

১১। প্রাকৃত-প্রভাবে রকারটা লুপ্ত হইয়া কেবল একার থাকে।

মৃ দু র হইতে * ম্রে দু র, মে দু র (শতপথ)।[১২]

ঋকারের এই যে উচ্চারণ যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এই জন্যই তাঁহাদের শিক্ষা-গ্রন্থসমূহে তাহার বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়, (পূর্ব্বোল্লিখিত বা ঙ্‌ লা র উ চ্চা র ণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে তাঁহাদের মতে কৃ ষ্ণো হ সি (বাজ॰ সং, ২,১) উচ্চারিত হইবে, ক্রে ষ্ণো হ সি।

§ ৫। বৈদিক ভাষায় ঋকারের যে পরিবর্ত্তন প্রদর্শিত হইল, লৌকিক সংস্কৃতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি অনুধাবন করিলেই ইহা বুঝা যাইবে; এ জন্য লৌকিক সংস্কৃতের অপর উদাহরণ না দিয়া আমরা এখন ঋকারের সহিত পালি-প্রাকৃতের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ভাষার সহিত এই দুই ভাষার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে, যাঁহারা এই দুই ভাষা বলিতেন, তাঁহাদের বাপ-দাদাদের নিকট ঋকারের পূর্ব্ব-প্রদর্শিত উচ্চারণগুলিই পরিচিত ছিল। বক্ষ্যমাণ উদাহরণে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

§ ৬। স্বরাদি রূপ (§ ৩), যথা—

(ক) ঋ = অ র্‌ (অর), যথা—

√ মৃ হইতে ম র তি (পা॰); ম র ই (প্রা॰)।

(খ) ঋ = ই র্‌ (ইর), যথা—

√ গৄ হইতে গি র তি, গি ল তি (পা॰); গি র ই, গি ল ই (প্রা॰)।

(গ) ঋ = উ র্‌ (উর), যথা—

√ কৃ হইতে কু রু মা ন (পা॰)।

§ ৭। ব্যঞ্জনাদি রূপ (§ ৪)। প্রয়োগে আদিতে ব্যঞ্জন (র) দেখা না গেলেও মূলত তাহা ছিল, পরে পালি-প্রাকৃতের উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।[১৩] উদাহরণ যথা—

(ক) ঋ = *র = অ, যথা—

কৃ ত হইতে * ক্র ত, ক ত (পা॰), ক অ (প্রা॰)।

নৃ ত্য „ * ন্র ত্য, ন চ্চ।

১২। সংস্কৃতে প্রচলিত বে ত ন শব্দ বস্তুত এই নিয়মেই √বৃত্‌ হইতে হইয়াছে,—√ বৃ ত + অ ন = * ব্রে ত ন = বে ত ন (তুলঃ—ব র্ত্ত ন, বৃ ত্তি)। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণিকগণ ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—√ বী + তন (উণা॰ ৩,১৫০)।

১৩। See William's Philological Lectures on Sanskrit and the Derived Languages, by R. G. Bhandarkar, Bombay, 1914, p. 39.

(খ) ঋ = *রি[14] = ই, যথা—

ঋ ণ হইতে রি ণ (প্রা॰)।

ঋ তে " রি ত্তে (পা॰)।

শৃ ঙ্গ " * শ্রি ঙ্গ, সিঙ্গ।

সৃ গা ল[15] হইতে * স্রি গা ল, সি গা ল (পা॰), সি আ ল (প্রা॰)।

(গ) ঋ = *রু[14] = উ, যথা—

বৃং হ য় তি হইতে ব্রূ হে তি (পা॰)।[16]

বৃ দ্ধ " * ব্রু ড্‌ঢ, বু ড্‌ঢ।

(ঘ) ঋ = * রে = এ

বৃ হ ৎ ফ ল হইতে * বে হ ৎ ফ ল, বে হ প্‌ ফ ল (পা॰)।

বৃ ন্ত হইতে * ব্রে ন্ত, বেণ্ট (প্রা॰)।[17]

ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে, পালি ও প্রাকৃত ভাষার দ্বারাও সমর্থিত হয় যে, ঋকারের পূর্ব্বপ্রদর্শিত (§§ ৩, ৪) উচ্চারণসমূহ প্রচলিত ছিল।

§ ৮। এখন আমরা ঋকারের বস্তুত মূল উচ্চারণ কি ছিল এবং কিরূপেই বা তাহার উল্লিখিত পরিবর্ত্তনগুলি হইল, দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা-সমূহে ঋকারের উচ্চারণ লইয়া মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, (ঋ॰ প্রা॰, ১৮, কাশী॰ ৩৫ পৃ॰ ; বা॰ প্রা॰, ১,৬৫) ইহার উচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূল (জিহ্বামূলীয়), এবং ইহা সেখানে হনু-মূল[18] দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২,১৮) লিখিত হইয়াছে যে, ঋকার উচ্চারণ করিতে হইলে হনু-দ্বয় পরস্পর উপসংশ্লিষ্টতর হইবে, এবং জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা ব র্স্ব-নামক স্থানে আঘাত করিতে হইবে। আমরা টবর্গ উচ্চারণ করিতে

১৪। কখনো কখনো প্রয়োগেও ইহাই থাকে, র লুপ্ত হয় না।

১৫। ইহাই ইহার বৈদিক রূপ (শত. ১২.৫.২.৫), পরে শৃ গা ল হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন অনেক হইয়াছে, যথা,—বৈদিক ব সি ষ্ঠ, স্তা ল, সূ ক র যথাক্রমে পরে ব শি ষ্ঠ, শ্তা ল, শূ ক র।

১৬। এখানে 'বৃং' শব্দের গুরুমাত্রা স্থির রাখিবার জন্য হ্রস্ব উকারকে দীর্ঘ করা হইয়াছে।

১৭। বো ণ্ট ও বি ণ্ট শব্দও হয় (চণ্ড, ২.৫ ; হেমচন্দ্র, ৮.১.১৩৯ ; শুভচন্দ্র, ১.২.৯৩ ; লক্ষ্মীধর, ১.২.৮৩ ; বররুচি, ১.১০ ; ত্রিবিক্রম, ১.২.৮৩ ; ক্রমদীশ্বর, ২.৬৭)। বে ণ্ট হইতে বাঙ্‌লায় বোঁ ট, বে ট। বৃ ন্ত— *ব্র ন্ত—ব ণ্ট (পালি), ইহা হইতে বাঙ্‌লায় বাঁ ট। প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার (ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা, ৩৫২ পৃ॰) বো,ণ্ট পদও দিয়াছেন, ইহা হইতে আমাদের (বো ণ্ট ক—বো ণ্ট অ—) বোঁ টা হইয়াছে।

১৮। অর্থাৎ বিবৃত মুখের দুই পার্শ্বভাগ ("হনুশব্দ আস্যপার্শ্বভাগয়োর্বর্ত্ততে"—বৈদিকাভরণ-টীকা, তৈ॰, প্রা॰, ২. ১২)।

মুখ-বিবরের উপরিভাগে যে স্থানটা জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করি, সেই স্থান, ও দন্তমূল, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম ব র্স্ব।[১৯]

পাণিনি-সম্প্রদায় ও অন্যান্য অনেকে বলেন, এবং ইহা সাধারণত খুব প্রসিদ্ধও আছে, ঋকারের উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা, ইহা মূর্দ্ধন্য—"স্যুর্মূর্দ্ধন্যা ঋটুরষাঃ" (পাণিনি-শিক্ষা, ১৭)। মূর্দ্ধা বলিতে মু খ বি ব রে র উ প রি ভা গ (তৈ০ প্রা০, ২,৩৭, বৈদিকাভরণ), যে স্থান হইতে টবর্গ উচ্চারিত হয়।

§ ৯। পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত পাণিনি-সম্প্রদায়ের মতের খুব বেশী পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তালু হইতে দন্তের দিকে ক্রমশ এই কয়টি স্থান আছে,—(১) তালু, (২) মূর্দ্ধা, (৩) বর্স্ব, (৪) দন্তমূল ও (৫) দন্ত। পূর্ব্বমতবাদীরা (১) তালু ও (৪) দন্তমূলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে দুই ভাগে, অর্থাৎ (২) মূর্দ্ধা ও (৩) বর্স্ব, এই দুই অংশে ভাগ করিয়া ইহাদের নিম্ন (৩) অংশে, আর পরমতবাদীরা ইহাদের উচ্চ (২) অংশে ঋকার উচ্চারিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

§ ১০। প্রয়োজনবোধে প্রসঙ্গত আমরা এখানে রকারেরও উচ্চারণ আলোচনা করিয়া লইব। ঋকারের ন্যায় রকারেরও উচ্চারণ মূর্দ্ধা হইতে হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ; কিন্তু কাহারো কাহারো মতে ইহা দন্তমূলীয় (বাজ০ প্রা০, ১,৫৮; ঋ০ প্রা০, ১ম পটল, ৩৬ পৃ০; যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা, শিক্ষাসংগ্রহ, কাশী০ ৩৩ পৃ০); এবং ইহা উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা দন্তমূলের উপরিভাগে (দন্তমূলে নহে) আঘাত করিতে হয় (বাজ০ প্রা০ ১,৭৭)। পাঠকগণ এইরূপ ভাবে উচ্চারণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঋক্প্রাতিশাখ্যে (১ম পটল, ৩৭ পৃ০) আবার উক্ত হইয়াছে যে, কাহারো কাহারো মতে রকারের উচ্চারণ-স্থান বৎর্স্ব (বর্স্ব ?), ইহা বাৎর্স্ব্য[২০] বর্ণ। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যেরও (২·৪১) ইহাই অভিমত মনে হয়। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, রকার উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাগ্রের মধ্য-স্থান দিয়া দন্তমূলের ভিতরে উপরিভাগে আঘাত করিতে হয়।

§ ১১। তাহা হইলে রকারের উচ্চারণ তিন প্রকার দাঁড়াইতেছে,—(১) মূর্দ্ধায়, (২) বর্স্বে ও (৩) দন্তমূলে। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত (৩) উচ্চারণটি ত্যাগ করিলে, ঋকারের সহিত ইহার উচ্চারণগত সাম্য আছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মতে ঋকার ও রকার উভয়ই মূর্দ্ধা বা বর্স্বে উচ্চারিত হইয়া থাকে। মূর্দ্ধা, বর্স্ব ও দন্তমূল, এই তিন স্থানে রকার উচ্চারণ করিয়া পাঠকেরা ঐ তিন রকারের পরস্পর ভেদ অবধারণ করিবার

১৯। "ব র্স্বা নাম রেফ-টবর্গ-স্থানয়োর্মধ্যপ্রদেশাঃ,"—বৈদিকাভরণ-টীকা (তৈ, প্রা, ২,১৮); "ব র্স্বেষু ইতি দন্তপঙ্‌ক্তেরুপরিষ্টাদ্ উচ্চপ্রদেশেষু,"—ত্রিভাষ্যরত্ন-টীকা (ঐ)। তুলঃ—ব ৎ র্স্ব (? ব র্স্ব) শব্দের দন্তমূলাদ্ উপরিষ্টাদ্ উচ্ছূনঃ প্রদেশঃ,"—ঋ, প্রা, ১ম পটল, কাশী, ৩৭ পৃষ্ঠা, উব্বট-ভাষ্য।

২০। বা ৎর্স্ব পাঠ বোধ হয় অশুদ্ধ, উব্বটের টীকা দেখিলে বোধ হয়, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২,১৮) ব র্স্ব বলিতে যাহা বুঝায়, বৎর্স্ব শব্দও এখানে তাহাই বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য টীকা, ১৯।

চেষ্টা করিতে পারেন ; কিন্তু বলা বাহুল্য, বিশেষ সাবধান না হইলে এইরূপ অতি সূক্ষ্ম ভেদের অবধারণ অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

§ ১২। এখন আবার একবার ঋকারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ঋকার একটি স্বরবর্ণ এবং ইহা হ্রস্ব, অতএব ইহার এক মাত্রা। প্রাতিশাখ্যকারগণ (বাজ° প্রা°, ১,৫৯-৬১) এক একটি মাত্রাকে সময়ে সময়ে দুই ভাগে, বা চারি ভাগে, বা কখনো কখনো আট ভাগেও বিভক্ত করিয়া থাকেন ; ইহাদের যথাক্রমে নাম অ র্দ্ধ মা ত্রা ($\frac{১}{২}$), অ ণু মা ত্রা ($\frac{১}{৪}$), ও প র মা ণু মা ত্রা ($\frac{১}{৮}$)। ঋকারের বিচারে তাঁহারা ইহার ঐ এক মাত্রাকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া বলেন যে, ইহার আদিতে এক অণুমাত্রা ($\frac{১}{৪}$), অন্তে আর এক অণুমাত্রা ($\frac{১}{৪}$) এবং মধ্যে অর্দ্ধমাত্রা ($\frac{১}{২}$) ; এইরূপে মোট ($\frac{১}{৪}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}=১$) এক মাত্রা হয়। ইহার মধ্যে মধ্যের অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে রকারের (ব্যঞ্জন বলিয়া তাহার অর্দ্ধমাত্রা)। ঋকারের আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকার এরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এরূপ মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে আর পৃথক্ ভাবে শুনিতেই পাওয়া যায় না ("ঋবর্ণে রেফলকারৌ সংশ্লিষ্টৌ অশ্রুতিধরৌ এ ক ব র্ণৌ"—বাজ° প্রা°, ৪,১৪৬)।[২১] এই রকার সাধারণ রকার হইতে হ্রস্বতর, অথবা সমানও হইতে পারে (ঋ° প্রা°, ৮,১৪ ; দ্রঃ—অ° প্রা°, ১,৩৭, ৭১)। প্রাতিশাখ্যের এই বর্ণনায় বুঝা গেল, ঋকারের মধ্যে লঘুতর রকার আছে।[২২]

§ ১৩। এখানে প্রশ্ন হয়, ঋকারের মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধমাত্রা ত রকারের হইল, এখন অপর অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ আদ্য ও অন্ত্য অণুমাত্রাদ্বয় কাহার ? ইহার আপাতত একটা উত্তর দিতে পারা যায় যে, ইহারা আলোচ্য স্বরেরই স্বকীয়, এই অর্দ্ধমাত্রাই ($\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}$) ঋকারের বিশেষত্ব, ইহাই ইহাকে স্বর বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছে। প্রাতিশাখ্যে (বাজ° প্রা°, ৪,১৪৬) উক্ত হইয়াছে যে, এই আণুমাত্রিক স্বর দুইটি ক ণ্ঠ্য ("কণ্ঠ্যাণুমাত্রয়োর্মধ্যে...")। ভাল, এই কণ্ঠ্য স্বর কি ? অকার ভিন্ন কিছু নহে। প্রাতিশাখ্যে (বাজ° প্রা°, ১,৭১ ; ঋ° প্রা°, ১,৮, কাশী° ৩৫ পৃ° ; যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শি° স° ৩১ পৃ°) অবর্ণকেই কণ্ঠ্য বলা হইয়াছে। অতএব বলিতে হয়, রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রিক অকার যোগ করিলেই ঋকারের ঠিক উচ্চারণ পাওয়া যায়। অকারের অণুমাত্রা কতটুকু সময়, তাহা ঠিক করা বড় শক্ত। প্রাতিশাখ্যবিদ্‌গণ স্ব র ভ ক্তি র স্থলে (তৈ° প্রা° ২১,১৫) ইহা ব্যাখ্যা করিতে

২১। দ্রষ্টব্য—ত্রিভাষ্যরত্ন ও বৈদিকাভরণ ব্যাখ্যায় (তৈ, প্রা, ২১,১৫) উদ্ধৃত বররুচি "ঋলোর্মধ্যে ত্বভ্যর্দ্ধমাত্রা রেফলকারয়োঃ"—যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা, শিক্ষা-সংগ্রহ, ৩২ পৃ°,। ঋকারে যেমন রকার, ৯কারেও সেইরূপ লকার, উভয়েরই এক নিয়ম।

২২। প্রাতিশাখ্যের এই কথা অবেস্তার দ্বারা সমর্থিত হয়। সংস্কৃতের ঋ অবেস্তা বর্ণমালায় বহু স্থলেই এ-র্-এ, ইহা স্বরবর্ণের মধ্যে। এখানেও মধ্যে রকার রহিয়াছে। এই রকারের আদিতে ও অন্তে যে একার রহিয়াছে, তাহা হ্রস্ব, ইংরাজী fed শব্দের e'র ন্যায় ইহা উচ্চারিত হয়। অবেস্তার একার তিনটি হ্রস্ব (short), দীর্ঘ (long) ও মধ্যম (middle) ; এ-র্-এ স্থলে হ্রস্ব।

গিয়া বলেন যে, এই অণুমাত্রিক স্বর এত সূক্ষ্ম যে, ইহাকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিতে হয়।[২৩] "ব র্‌ হিঃ" (তৈ০ স০ ১,৬,৮), এখানে মধ্যবর্ত্তী রকারের আদিতে ও অন্তে অণুমাত্রা করিয়া স্বর আছে (বকার-স্থিত অকার এখানে গণ্য করা হইতেছে না)। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দ্রুতভাবে (যেমন আমরা করি—ব র্হিঃ) উচ্চারণ করিলে প্রাতিশাখ্যবিদ্‌গণের মতে তাহা ঠিক হয় না, রকার ও হকারের মধ্যে ঈষৎ একটু ব্যবধান দিতে হইবে। এইরূপে এখানে রকারের যে উচ্চারণ হয়, ঋকারেরও ঠিক সেই উচ্চারণ। ইহাই প্রাতিশাখ্যের অভিপ্রেত মনে হয় (বাজ০ প্রা০, ৪,১৭ ; তৈ০ প্রা০, ২১,১৫, টীকা)।

§ ১৪। স্বরের অণুমাত্রার কিঞ্চিৎ পরিচয়, বোধ হয়, আমরা বর্ত্তমান গৌড়ীয় ভাষা-সমূহ হইতে পাইতে পারি। 'সে পথে আ স তে-আ স তে (=আসিতে-আসিতে) পড়ে গেল', এখানে মনে হয়, মধ্যবর্ত্তী সকারে অকারের একটু অতি সামান্য ধ্বনি মিলিয়া রহিয়াছে। যদি তাহা না থাকে, তবে আ স্তে-আ স্তে (=ধীরে-ধীরে) হয়। যে ঘ না, বা দ না, এখানেও ঘকারে ও দকারে একটু অকারের ধ্বনি আছে বোধ হয়, কেন না, যে ঘ্না, বা দ্না বলা হয় কি ?[২৪] যদি এই সকল স্থানে সত্য-সত্যই অকারধ্বনি পাওয়া যায়, তবে আমরা ইহাকে অণুমাত্রিক অকার বলিতে পারি। যাহাই হউক, অণুমাত্রিক অকারটা যে, কিরূপ, উল্লিখিত আলোচনায় তাহার একটা অন্তত আভাসও পাওয়া যাইবে। এইরূপে আদি ও অন্তে অণু-মাত্রিক অকার ও মধ্যে অর্দ্ধমাত্রিক রকারের উচ্চারণে ঋকার উচ্চারিত হইত। অতএব উচ্চারণ হিসাবে তাহার রূপ ছিল অ-র্‌-অ।

§ ১৫। সকলেই শিক্ষা-প্রাতিশাখ্য পড়িয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ঠিক-ঠাক অনুসরণ করিয়া নানা কারণেই উচ্চারণ করিতে পারে না। মানুষ চায় নিজের ভাবটা প্রকাশ করিতে, তা সে যেরূপে যত সহজে পারে, তাহার বাগ্‌যন্ত্র যেরূপে যতটুকু তাহাকে সহায়তা করিতে পারে, সে সেইরূপই করিয়া থাকে ; ব্যাকরণের শত-সহস্র নিয়ম ইহাতে বাধা দিতে পারে না। তাই ঋকারের মূল উচ্চারণ কথ্য ভাষায় এক-একটু ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কেহ-কেহ আদির, কেহ-কেহ বা অন্তের অণুমাত্রিক অকারকে এরূপ করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে যথাক্রমে অন্তের ও আদির অণুমাত্রিক অকার একবারে লুপ্ত হইয়া গেল, অর্থাৎ মূল অ-র্‌-অ কাহারো-কাহারো নিকটে অ-র্‌ (অর্‌), এবং কাহারো-কাহারো নিকটে র্‌-অ (র) হইয়া পড়িল ; যাঁহারা পূর্ব্বের অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রা দিয়া (অর্থাৎ পূর্ণ এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিলেন, তাঁহাদের নিকট অ-র্‌ (অর্‌) হইল, আর যাঁহারা পরবর্ত্তী অণুমাত্রিক অকারকে আরো একটু বেশী মাত্রায়

২৩। ইন্দ্রিয়াবিষয়ো যোঽসাবণুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
চক্ষুর্ভিরণুভির্মাত্রাপরিমাণমিতি স্মৃতম্‌॥

২৪। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

(এক মাত্রায়) উচ্চারণ করিতেন, তাঁহাদের নিকট র্-অ (র) হইল। মূলত ঋ হ্রস্ব স্বর বলিয়া একমাত্রিক, ইহার এই দুই রূপান্তরেও সেই এক মাত্রাই স্থির থাকিল,[২৫] কেবল তাহার আকৃতিটার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ঋকার এইরূপেই অর্ ও র হইয়াছে মনে হয়।

§ ১৬। ঋকারের অন্যান্য পরিবর্ত্তনও প্রধানত এইরূপেই হইয়াছে। উচ্চারণ-ভেদে পূর্ব্বোক্ত অ-র্-অ, ইহাই ই-র্ (ইর্) ও র্-ই (রি), এবং উ-র্ (উর্) ও র্-উ (রু) প্রভৃতি হইয়াছে। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন পরিবর্ত্তনের একটা যুক্তি আমাদের মনে এইরূপ হয়,—পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, √ কৃ হইতে চি-কির্-স-তি, চি কী র্ষ তি ; √ হৃ হইতে জি-হির্-স-তি হইতে জি হী র্ষ তি, √ কৄ হইতে কি র তি ; এই সকল স্থলে ঋকার ই র্ হইয়াছে। আবার √ কৃ হইতে ক্রি য় তে, √ ভৃ হইতে ভ্রি য় তে, ইত্যাদি স্থলে তাহা রি হইয়াছে। এ স্থলে বলা যাইতে পারে,—

ঋকারের পর (ব্যবহিতই হউক বা অব্যবহিতই হউক) কোনো তালব্য বর্ণ থাকিলে প্রায়ই সেই ঋকার স্থানে ই র্ অথবা রি হয়।

√ কৄ (=ক্+অ-র্-অ)+অ+তি, এখানে শেষে তি-স্থিত ইকারকে উচ্চারণ করিবার জন্য উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্র প্রথম হইতেই উদ্যত হয়, যেমন কাহাকেও আঘাত করিতে হইলে আমাদের হস্ত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বেগে সেই দিকে ধাবিত হইবার জন্য উদ্যত হইয়া পড়ে। এই হেতু ককারস্থিত ঋকারের, অর্থাৎ যাহা একই কথা, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরিবর্ত্তিত রূপ অ-র্-এর কণ্ঠ্য স্বর অকারকে ঠিক উচ্চারণ না করিয়া, উচ্চারকের বাগ্‌যন্ত্র (শেষের তালব্য ইকারে লক্ষ্য থাকায়) তাহার স্থানে তালব্য স্বরই (অর্থাৎ ইকারই) উচ্চারণ করিয়া ফেলে। ক্রি য় তে, ভ্রি য় তে; এখানেও এই নিয়ম, √ কৃ+য+তে, √ ভৃ+য+তে, এখানেও ঋকারের পর তালব্য যকার থাকায় বাগ্‌যন্ত্র ইহা উচ্চারণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হয় বলিয়া পূর্ব্ববৎ ঋকারকে রি উচ্চারণ করিয়া ফেলে, অর্থাৎ ঋকারের পূর্ব্ব-বর্ণিত স্বরভাগকে কণ্ঠ্যের পরিবর্ত্তে তালব্য করিয়া ফেলে।

§ ১৭। ই র্ ও রি ইহাদের ইকার একার হইলে (টিপ্পনীয় গু ণ বি ধি) এ র্ ও রে হইয়া যায়, এবং উদাহৃত (§§ ৩,৪) পদসমূহ হয়।

§ ১৮। ঋ-স্থানে উ র্ অথবা রু হইবার নিয়ম সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে,

পদের মধ্যে ঋকারের (ব্যবহিত বা অব্যবহিত) পরে বা কখনো কখনো পূর্ব্বে কোনো ওষ্ঠ্য বর্ণ থাকিলে প্রায় তাহার ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

২৫। ব্যঞ্জনের যদিও অর্দ্ধমাত্রা, তথাপি স্বরসন্নিধানে ব্যঞ্জন স্বরেরই অঙ্গীভূত হইয়া যায় ; তাহারই মাত্রার মধ্যে ইহাকে গণা করা হয়, অর্থাৎ স্বরেরই কাল, ইহার কাল ; স্বর ও ব্যঞ্জনে মিলিয়া একটি কালমাত্রা হয়। যেমন ব ষ ট্, এ কালে বকারে একমাত্রা, এবং ষকার ও টকারের একত্র এক মাত্রা—এই দুই মাত্রা। অবশ্য লঘু-গুরু-ভেদে এই মাত্রাদ্বয়ের ভেদ আছে। এই শব্দে শেষ ষকার ও টকারের মধ্যে ষকার অর্দ্ধমাত্রা ($\frac{১}{২}$) + তাহার অকার এক মাত্রা (১) + এবং টকার অর্দ্ধমাত্রা ($\frac{১}{২}$), মোট দুই (২) মাত্রা, এরূপ হিসাব ভুল, এবং তাহা কেহ করে না। ব্যঞ্জন যে, স্বরেরই অঙ্গীভূত, এ সম্বন্ধে প্রাতিশাখ্যে বহু কথা আছে (তৈ, প্রা, ২১,১, ইত্যাদি)।

√ কৃ+উ (+হি) হইতে কুরু, এখানে উ ওষ্ঠ্য বলিয়া তাহার উচ্চারণে বদ্ধলক্ষ্য বাগ্‌যন্ত্র ককার-উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই ওষ্ঠদ্বয়কে উপশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে (তৈ০ প্রা০, ২,২৪), এবং তাহাতেই ঋকারের অর্থাৎ অ-র্‌অ-এর পূর্ব্বের ভাগ উ র্‌ হইয়া যায়। কিন্তু ক রো তি, এ স্থলে √ কৃ+উ+তি=(ইহার মধ্যবর্ত্তী উকার ওকার হইয়া যাওয়ায়) √ কৃ+ও+তি, এই জন্য ঋকার উর্‌ না হইয়া অর্‌-ই হয় ; অর্থাৎ ও=অ+উ, ইহা কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে জাত ; অ কণ্ঠ্য ও উ ওষ্ঠ্য ; এই হেতু ঋকারের অব্যবহিত পরবর্ত্তী হইতেছে ওকারের কণ্ঠ্য অংশ অকার ; ইহারই প্রতি বাগ্‌যন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য থাকায়, ঋকারের অর্থাৎ অ-র্‌-অ ইহার আদি অংশের, অনুমাত্রিক কণ্ঠ্য অকারের কোনো পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক হওয়ায় কেবল তাহা একমাত্রিক হইয়া অর্‌ হইয়া যায়। √ ভৃ হইতে ব ভূর্ ষ তি, এখানেও ওষ্ঠ্য বর্ণ ভকারের সংসর্গে ঋকার উর্‌ হইয়াছে। পাণিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার বিধান হইতেছে (৭,১,১০২)—"উদ্‌ ওষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য।"

§ ১৯। বলা বাহুল্য, এ নিয়ম কয়টি অব্যভিচারী নহে। কিরূপে ঋকারের ঐ সকল পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা এখানে তাহাদের উদ্দেশ্য। প্রথম-প্রথম হয় ত এই নিয়মেই স্বাভাবিক গতিতে ঋকার পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পরে যখন ঐ অর্‌, ইর্‌, উর্‌ প্রভৃতি উচ্চারণ লোকের নিকট সহজ প্রথার মত হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিশেষ-বিশেষ স্থানে এক-একটা বিশিষ্ট উচ্চারণ বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। যেমন আমরা বঙ্গদেশে ইহাকে একবারে রি করিয়া ফেলিয়াছি, অথবা যেমন তাহা উড়িষ্যায় একবারে রু হইয়া পড়িয়াছে,—যদিও উভয় স্থানে সংস্কৃত শব্দ লি খি বা র সময় ঋকারই লিখিত হইয়া থাকে। এইরূপেই, মনে হয়, মূল এক উচ্চারণের স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে।

§ ২০। ঋকারের আসল উচ্চারণটা মূল বৈদিক সংস্কৃতেই কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে। আরো বুঝা যাইবে যে, রকারই নানারূপে তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কৃতে কতক স্থানে উচ্চারণে না হউক, অন্তত আকারেও (বর্ণেও) ঋকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পালি-প্রাকৃতে তাহাকে আর মোটেই পাওয়া যায় না, রকারই তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পালি-প্রাকৃতের ব্যাকরণকারগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, ঋকার তাহাতে নাই।[২৬] এই জন্যই সিংহলী[২৭] ও বাঙ্‌লা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাতে আমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাই না, যদিও সংস্কৃত শব্দগুলিতে লিখিয়া থাকি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

২৬। অপভ্রংশে কচিৎ দুই একটা পদে দেখা যায়, কৃ বা (কৃপা), নৃ ব (নৃপ), হে, চ, ৮, ৮২, ৮৩।

২৭। ভারতের প্রাদেশিক আর্য্য-ভাষাসমূহের তত্ত্বালোচনায় সিংহলীকেও স্থান দিতে হইবে, ইহারা পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ।

'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্য

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের সপ্তম ঋকে যে 'রুক্ষঃ' শব্দটি আছে, উহা 'বৃক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ নহে; ছান্দসে কোথাও ঐ অপভ্রংশ পাওয়া যায় না। 'ওষধীষু' সপ্তমীতে আছে, আর 'রুক্ষঃ' প্রথমার পদে 'অগ্নিঃ' এই উহ্য কর্ত্তাকে সূচিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, 'ওষধী' শব্দের কাছাকাছি আছে বলিয়া 'বৃক্ষ' অর্থের সূচনা হয় না। 'রুক্ষঃ'—অর্থ 'দীপ্তঃ'; এই অর্থেরই অল্প পরিবর্ত্তনে ঐ শব্দটি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে; আমাদের 'রুক্ষ মেজাজে' এই শব্দই ব্যবহৃত। ঋক্‌টির প্রথম ছত্র, পদপাঠে ঠিক এইরূপ পাইবেন,—

দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্-
বৃষা রুক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।

সূর্য্যের মত তেজ বা রশ্মি বিস্তারকারী যাঁহার (অগ্নির) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই প্রার্থিত ফল-বর্ষণকারী রুক্ষ অর্থাৎ দীপ্ত অগ্নি ওষধীগুলির মধ্যে (গাছ-পালা পোড়াইলে যে শব্দ হয়, সেই) শব্দ করেন। ইত্যাদি।

'ঋ' অক্ষরটির আদিম উচ্চারণ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'ভারতবর্ষের বর্ণমালা' ও 'ব্যাকরণের সন্ধি' নামক প্রবন্ধ দুইটিতে অনেক কথা লিখিয়াছি। 'অ' স্বরের 'আ' যেমন একটা দীর্ঘ উচ্চারণ, তেমনই আবার 'অ' ও 'আ' উচ্চারণ যদি যুক্ত-ভাবে দীর্ঘ করা যায়, তাহা হইলে যে 'ই' উচ্চারণ ফুটিয়া ওঠে, ইহা Helmholtz ও Koenig যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন; 'ব্যাকরণের সন্ধি' প্রবন্ধেও ঐরূপ স্বর পরি-বর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। দীর্ঘ 'ঋ', জ, শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ 'ঈ'রূপে ফুটিয়া ওঠে, ইহা ঠিক নহে; উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়। বিস্তৃত ভাবে দৃষ্টান্ত দিবার সময় হইল না। 'ঋ' স্বরের বিকারে যেখানে যেখানে 'উর্' হয়, সেখানেই দেখিবেন যে, accented 'উ' ধ্বনি অক্ষরটির অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে যুক্ত আছে, এই স্বর সংযোগের ফলেই বিকার ঘটিয়া থাকে। অন্তস্থ 'ব' অক্ষরটির উচ্চারণ যে 'উ-অ', তাহা বলিতে হইবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ঋক্ষ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর

ঋ ক্ষ শব্দটি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলিয়া লইতে চাই যে, যদিও তর্কের খাতিরে মানিয়াই লইতে হয় যে, উহা বৃ ক্ষ হইতে হয় নাই. আলোচ্য স্থলে উহার উদাহরণ গ্রাহ্য নহে, তথাপি পাঠকগণ দেখিবেন, আমার সিদ্ধান্ত বিচলিত হয় নাই; অন্য উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ঋ ক্ষ শব্দটি বৃ ক্ষ হইতেই হইয়াছে কি না, তাহা এখনকার লোকের পক্ষে ঠিক করিয়া বলা শক্ত; তবে আমার মনে যেরূপ হইতেছে, তাহাতে এখনো আমার মত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ দেখিতেছি না। আমি নিজেই উল্লেখ করিয়াছি, সায়ণ ঋ ক্ষ শব্দের অর্থ দী প্ত করিয়াছেন। বিজয়বাবু সায়ণকেই অনুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য লিখিয়াছেন। তিনি মন্ত্রটির আলোচ্য অংশের পদপাঠ তুলিয়াছেন। মূলটিও তুলা দরকার,—

"দিবো ন যস্য বিধতো নবীনোদ্
বৃষা ঋ ক্ষ ওষধীষু নূনোৎ।"

সায়ণ ও তদনুসরণে বিজয়বাবু ঋ ক্ষ শব্দ এখানে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, পদপাঠও তাঁহাদের অনুকূল; কিন্তু আমি ইহাকে সপ্তম্যন্ত (ঋ ক্ষে), এবং তাহাও আবার বহুবচনে (বৃক্ষেষু) ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। তাহা হইলে এই দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়ায়—'(কাম-) বর্ষণকারী (অগ্নি) বৃক্ষ ও ওষধি-সমূহে (তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার সময়) অত্যন্ত গর্জ্জন করিতেছে।' পদপাঠ যে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত, তাহা নহে, স্থানে-স্থানে ইহাতেও ত্রুটি আছে। বেদের অন্যান্য মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, স্থানে-স্থানে পূর্ব্বপদে পরপদের বিভক্তি-বচন যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করা দরকার, তাহাতেই অর্থ ভাল হয়, অথচ ব্যাখ্যাপদ্ধতির নিয়মভঙ্গ হয় না; এবং কেবল নবীন নহে, প্রাচীন ব্যাখ্যাতারাও এইরূপ করিয়াছেন। একটা মন্ত্র তুলিয়া দেওয়া যাউক—

"ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি
দেব আ মর্ত্যেষ্বা।" ঋগ্বেদ, ৮,১১,১।

পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত "ঋ ক্ষ ওষধীষু" ইহার সহিত "দেব আ মর্ত্যেষ্বা" ইহার রচনা তুলনা করিবেন। এখানেও পদপাঠ আছে—

"দেবঃ (প্রথমান্ত) আ মর্ত্যেষু আ।"

সায়ণের ভাষ্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে অগ্নে, দেবো দ্যোতমানস্ত্বং মর্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ দেবেষু চ মধ্যে ব্রতপা অসি। ব্রতানাং কর্ম্মণাং রক্ষিতা ভবসি।" পাঠকগণ এখানে দেখিবেন, সায়ণ দে ব শব্দটিকে দুইবার ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, একবার প্রথমার একবচন করিয়া, এবং অপর বার সপ্তমীর বহুবচন করিয়া; কিন্তু মূলে দেব-শব্দ একবার বৈ

ছুইবার নাই : মূলে ছুইটা আ শব্দ আছে, ইহার অর্থ সমুচ্চয়, অর্থাৎ আ=চ। সায়ণ ইহা লক্ষ্য রাখিয়া "মনুষ্যেষু চ দেবেষু চ" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। (পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, দে ব পদে পরবর্ত্তী ম র্ত্যে ষু পদের সপ্তমীর বহুবচন যোগ করিতে হইয়াছে।) আবার পদপাঠে দে ব শব্দে প্রথমার একবচন থাকায় "দে বো স্তো ত মা নঃ" বলিয়াছেন। বস্তুত দে ব শব্দটিকে প্রথমান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা এখানে চলে না, ইহা সমুচ্চয়ার্থক ছুইটি আ-শব্দই সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। এই মন্ত্রটি বাজসনেয়িসংহিতাতেও (৫,১৬) উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে মহীধর দে ব শব্দকে প্রথমে প্রথমান্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজেই সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"যদ্বা আকারদ্বয়ং সমুচ্চয়ার্থং। দে বে ইতি সপ্তম্যন্তং পদম্। হে অগ্নে ত্বং দেবে আ দেবেষু চ, মর্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ ব্রতপা অসীতি পূর্ব্ববৎ।" *

এরূপ মন্ত্র আরো তুলিতে পারা যায়, কিন্তু এখন আর বেশী তুলিয়া কাজ নাই। আমি বলিতে পারি, Roth, ভাণ্ডারকর প্রমুখ দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরা আমার পক্ষে সম্মতি দিবেন।

"ছান্দস" ভাষায় অন্যত্র যদি রু ক্ষ না পাওয়া যায়, নাই-ই গেল, কিন্তু ঋগ্বেদের ভাষা ত ছান্দস, এবং তাহাতেও ত প্রচুর প্রাকৃতভাব (Prākritism) পাওয়া যায়।

প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি একবাক্যে বলিতেছে—বৃ ক্ষ হইতে রু ক্‌খ (=রু ক্ষ) হইয়াছে (হেমচন্দ্র, ৮,২,১২৭; বররুচি, ১,৩২; লক্ষ্মীধর, ১,৪,৭; সিংহরাজ, ৪,১; মার্কণ্ডেয় ১,৩৮)। এ কথা কি একবারেই অগ্রাহ্য করা যাইবে?

আদিস্থিত অন্তস্থ ব-কারের যে লোপ হয়, তাহার উদাহরণ দিয়াছি। বৈদিক ভাষাতে আরো প্রচুর উদাহরণ আছে। বৈ (=তু+বৈ), তৈ, স, ১,৭,১,৫; ৬,২; ২,২,৪,৮; ইত্যাদি; যা ব (=তু+যাব), তৈ, স, ২,১,৫,৮; ইত্যাদি; অ ন্ব র্ত্তি ষ্যে (=অনু+ব র্ত্তি ষ্যে) অথ, স, ১৫,১,৫৬। বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিলাম না।

এই সব ভাবিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, আলোচ্য স্থলে রুক্ষ শব্দ বৃ ক্ষে র ই অপভ্রংশ।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, ঋগ্বেদের ঐ যে রু ক্ষ (=দীপ্ত), তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত অর্থে বাঙ্‌লার "রুক্ষ মেজাজ" ইত্যাদি স্থলে প্রযুক্ত হয়। দীপ্ত অর্থে (সায়ণের মতে) রুক্ষ শব্দের প্রয়োগ ঐ এক উল্লিখিত মন্ত্র ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। যে শব্দটি বিপুল সাহিত্যের মধ্যে একখানিমাত্র গ্রন্থের একটি মাত্র মন্ত্রে একবার মাত্র কোন একটি অর্থে প্রযুক্ত, এবং এই-রূপে নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত, তাহা হঠাৎ একবারে লাফ দিয়া বঙ্গভাষায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ত মনে করিতে পারি না,—যদি তাহার উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগ করা না হয়। ঋগ্বেদের রু ক্ষ আমাদের বাঙ্‌লার ঐ সকল স্থলে আসিয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে বিজয়বাবুকে প্রমাণ দিতে হইবে, কেবল প্রতিজ্ঞা করিলে চলিবে না।

---

* এই মন্ত্রটি অথর্ব্ববেদেও (১৯, ৫৯, ১) আছে, কিন্তু সায়ণ সেখানে ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদের এই একই মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্য দেখিলে বোধ হয়, তাহা এক লেখনীর নহে।

বৈদিক সংস্কৃতেও (মন্ত্রভাগে নহে, ব্রাহ্মণভাগে) রূ ক্ষ শব্দ আছে (রু ক্ষ নহে)। ইহা √ রূ ক্ষ (পারুষ্যে) হইতে হইয়াছে। ইহার অর্থ পরুষ, কর্কশ, শুষ্ক, অস্নিগ্ধ, অচিক্কণ, ইত্যাদি। অমরে (৩,২২৫) লিখিত হইয়াছে—"রূক্ষস্ত্বপ্রেম্ণ্যচিক্কণে।" এখন 'রূ ক্ষ মেজাজ', 'রূ ক্ষ স্নান', 'রূ ক্ষ কথা' ইত্যাদি স্থলে আলোচ্য শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট। ইহার ব্যাখ্যার জন্ম ঋগ্বেদের রু ক্ষ শব্দের সহিত যোগ অন্বেষণের কোন আবশ্যকতা দেখি না। সংস্কৃতের এই রূ ক্ষ শব্দই বাঙ্‌লায় (মারাঠীতেও) কাহারো-কাহারো হাতে রু ক্ষ, আবার কাহারো কাহারো নিকটে রু ক্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছে (ম-আগম সম্বন্ধে তুলঃ—বৈদিক সংস্কৃত ম ক্ষু= লৌকিক সংস্কৃত মংক্ষু ; ম য়ূ র প ক্ষী=ম য়ূ র পং ক্ষী=ম য়ূ র প খী) প্রাকৃতে রূ ক্ষ হইতে রু ক্‌ খ হয় ; তাহা হইতে বাঙ্‌লা-প্রভৃতিতে রু খা ইত্যাদি। অতএব বিজয়বাবুর লৌকিক রু ক্ষ শব্দ আলোচনায় তাঁহার নিজপক্ষ কোনোরূপে সমর্থিত হইতেছে না।

ঋ-সম্বন্ধে বিজয়বাবুর লিখিত নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ দুইটি আমি এখনো দেখিতে পাই নাই, দেখিয়া যদি আবশ্যক মনে করি, আমার প্রবন্ধকে কাটিব, ছাঁটিব, বাড়াইব বা একেবারে পরিবর্ত্তিত করিব।

Helmholtz ও Donders এর স্বরপরীক্ষার এবং Scott ও König এর Phonautograph এর কথামাত্র শুনিয়াছি, বিশেষ কিছুই জানি না। Helmholtz সাহেব না হয় দেখাইয়াছেন যে, 'অ' ও 'আ' উচ্চারণ যদি যুক্তভাবে দীর্ঘ করা যায়, তা হইলে 'ই' উচ্চারণ ফুটিয়া উঠে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ঋকারতত্ত্ব বিচারের কি হইল, বিশেষ করিয়া খুলিয়া না বলিলে বিজয়বাবুর এই মন্তব্যটির তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে না।

বিজয়বাবু বলিতেছেন, "দীর্ঘ ঋ, জ শ প্রভৃতির সংযোগে যে দীর্ঘ ঈরূপে ফুটিয়া উঠে, ইহা ঠিক নহে।" কেন? জীর্ণ, শীর্ণ, এখানে ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তিনি বলেন, "উহা প্রাকৃতিক উচ্চারণের ফলেই হয়।" ইহার তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। স্পষ্ট করিয়া লিখিলে চিন্তা করিয়া দেখিতে পারা যায়। তাঁহার শেষ কয় পংক্তিও আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই বলিয়া এবার হাঁ-না কিছুই বলিতে পারিলাম না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

রুক্ষ শব্দ সম্বন্ধে মন্তব্য

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ঋক্ষ শব্দ রূক্ষ অর্থে দেখিয়াছি। উক্ত ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকে চতুর্থ অনুবাকে আছে :—"ঋক্ষা বা ইয়ং অলোমকাসীৎ। সাকাময়ত। ওষধীভির্বনস্পতিভিঃ প্রজায়েয়েতি।" সায়ণ ব্যাখ্যা দিতেছেন—এই (পৃথিবী) [পূর্ব্বে] অলোমকা (ওষধ্যাদি লোমরহিতা) এবং ঋক্ষা (মার্দবরহিতা, ক্রূরা) ছিলেন। [তিনি কামনা করিলেন যে, ওষধি ও বনস্পতি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব]" এখানে সায়ণমতে ঋক্ষ অর্থে স্পষ্টতই মৃদুতারহিত—ক্রূর—রূক্ষ। ঋকার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হইতে পারে, বলিয়া এ কথার উল্লেখ করিলাম।

পত্রিকাধ্যক্ষ।

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি

বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর নাম আপনাদের কাহারও অপরিচিত নহে। আমার জন্মভূমি আজিমগঞ্জ গ্রামের অতি সন্নিকটেই তাঁহার লীলাভূমি। কিছুকাল হইল, কয়েক দিবসের অবকাশ পাইয়া আমি তথায় গিয়াছিলাম। রাজপুতানা-নিবাসী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভট্ট নাথুরামজী মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি শিলালিপির প্রতিলিপি তুলিতে সিদ্ধ-হস্ত। আবশ্যকীয় জৈন লিপিসমূহের অনুলিপি সমাধা হইবার পর বড়নগরের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ভট্টজীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, উক্ত স্থান গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অট্টালিকাগুলির ভগ্নাবশেষ-চিহ্ন পর্য্যন্তও প্রায় বিলুপ্ত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাণী ভবানীর বর্ত্তমান বংশধর কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনি সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আমাদিগকে তৃপ্ত করিয়া জনৈক কর্ম্মচারীকে পথ-প্রদর্শকস্বরূপ আমাদিগের সঙ্গে দিলেন। অনেকগুলি ভগ্নাবশেষ প্রাচীন মন্দির পরিদর্শন করিলাম। কিন্তু কোন মন্দিরে কোন প্রকার শিলালিপি অথবা মন্দির-স্থাপয়িতার নির্ণয় করিবার উপযোগী কোন নিদর্শন দৃষ্ট হইল না। কিন্তু দুইটি মন্দিরে প্রস্তরফলক উঠাইয়া লওয়ার চিহ্ন দৃষ্ট হইল এবং অন্য দুইটি মন্দিরে দুইখানি শিলালিপি আমাদের নয়নগোচর হইল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়; তথাপি লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, একখানি মই সংগ্রহ করিয়া, ভট্টজি অতি কষ্টে তাহার ছাপ লইলেন। দ্বিতীয় মন্দিরেও ঐ প্রকারে ছাপ লওয়া হইল। গভীর বন, বসিবার স্থান মাত্র নাই, সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিবার শক্তি হ্রাস হইতেছিল। ভট্টজি মইখানির উপরে দাঁড়াইয়া ছাপ লইতে ব্যস্ত ছিলেন। আর আমি ক্লান্ত হইয়া সেই অরণ্যমধ্যেই বসিয়া পড়িলাম। যাহা হউক, কার্য্য শেষ হইবামাত্র আমরা বাটী ফিরিলাম। পরদিন পুনরায় আমরা বহির্গত হইলাম এবং পূর্ব্বদিন যেখানে প্রস্তর-লিপির ছাপ লইয়াছিলাম, তাহার অন্য দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও একখানি প্রস্তরলিপি দেখিতে পাইলাম। পরে উক্ত বড়নগর রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী গণেশ-মন্দিরে একখানি প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হইল। অবশেষে তথাকার প্রসিদ্ধ গোপাল-মন্দিরের প্রস্তর-খণ্ডের ছাপ লওয়া হইল।

এক্ষণে সেইগুলি পরিষদের সম্মুখে স্থাপন করিলাম; এইগুলি যত দূর আমি পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। প্রথমটির তারিখ শকাব্দ ১৬৬৩, অর্থাৎ ১৭৫ বৎসর প্রাচীন। বিপ্র শ্রীরামনাথ গঙ্গাতীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পলাশীর যুদ্ধের ১৬ বৎসর পূর্ব্বের। দ্বিতীয়টি ১৬৮৩ শক, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিজ শ্রীরামপ্রসাদ কর্ত্তৃক শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করে। ইহা পলাশীর যুদ্ধের কেবল মাত্র ৭ বৎসর পরে। তৃতীয়টির

তারিখ শক ১৭১৯, খৃষ্টাব্দ ১৭৯৭। ঐ সময়ে শ্রীলোচন নামক কোনও ব্যক্তি শিবের মন্দির স্থাপন করেন। ইহা ১২০ বৎসর প্রাচীন, কিন্তু সেই সময়ের শ্রীলোচন নামক কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। চতুর্থটি শক ১৬৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৭৭২ সালের অর্থাৎ ১৪৪ বৎসরের প্রাচীন। "দয়াসিন্ধু দয়ারাম" কর্ত্তৃক কোন শিবমন্দির স্থাপনের এই প্রস্তর-ফলকটি এক্ষণে গণেশ-মন্দিরে বিদ্যমান। ইনি দিঘাপতিয়া-রাজবংশের আদি পুরুষ। পঞ্চমটি রাণী ভবানীর কন্যা শ্রীমতী তারা দেবীর গোপাল-মন্দির-সংলগ্ন প্রস্তর-লিপির। ইহার তারিখ শক ১৭০০, খৃষ্টাব্দ ১৭৭৮, অর্থাৎ ১৩৮ বৎসর প্রাচীন। ষষ্ঠ লিপিটির কোন তারিখ লেখা নাই। সপ্তমটি শক ১৭৬৯, খৃষ্টাব্দ ১৮৪৭ অর্থাৎ ৬৯ বৎসর পূর্ব্বের।

১। শিব-মন্দির

শাকে রামর্ত্তুকালক্ষিতিপরিগণিতে জাহ্নবীতীর-
দেশে কৈলাসাবাসপাদক্ষরদমিতসুধাসিক্তচিত্তা-
ন্তরাত্মা। বিপ্রঃ শ্রীরামনাথো মঠমতিশয়িতং রা-
মনাথেশ্বরায় প্রাদাদুচ্চৎপতাকং পরং (পর) পদমতু
লং লব্ধুকামঃ শিবায়॥ শকাব্দাঃ। ১৬৬৩

২। শিব-মন্দির

ওঁ শ্রীহরিঃ সন ১১৬৭ সাল
শাকে রামগজাঙ্গেন্দুমিতে সম্বৎসরে গতে
উত্তরায়ণে সিতে পক্ষে বৈশাখে পূর্ণিমাতিথৌ
শ্রীলরামপ্রসাদেন দ্বিজেন শম্ভুসেবিনা
রচয়িত্বা মঠং শৈবং ভক্ত্যা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং

৩। শিব-মন্দির

/৭ ওঁ শ্রীশ্রীশিবঃ শরণং। রন্ধ্রক্ষৌণ্যব্ধিচন্দ্রে শকপতি-
গণিতে হায়ণে চারুগেহে প্রাদাৎ স্বর্গীয় পিত্রোর্ম্মণিম-
য়বিলসদ্দীপ্যমানে ধরণ্যা(ং) স্বধূর্ন্যাঃ ক্ষেত্রপূর্য্যাং দ্বি-
জনৃপবিবুধৈর্ম্মণ্যমানে শিবায় শ্রীল শ্রীলোচনা-
খ্যো নিজগুণবিদিতো নির্ম্মলাত্মা সুশীলঃ

৪। গণেশ-মন্দির

সপ্তদশশতে সংখ্যে
শাকে চ রসবর্জ্জিতে
দয়াসিন্ধু দয়ারাম(ঃ)
ভবায় ভবনং দদৌ

৫। শ্রীগোপাল-মন্দির

খশূন্যমৈত্রশাকে শ্রী
ভবানীতনুসম্ভবা
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা
শ্রীমদ্গোপালমন্দিরং।

৬। শিব-মন্দির[১]

ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্র
বঙ্গভূমীন্দ্রভামিনী
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রী
ভবানীশ্বরমন্দিরং

৭। দেবীপুর-মন্দির[২]

নবষণ্মিত্রমে শাকে
রামরুদ্রস্য কামিনী
মন্দিরং মোহিনীশস্য
নির্ম্মমে রামমোহিনী

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

১। এই মন্দিরের শিলালিপি এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। তবে পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায় যে, এখানে এই লিপির অনুযায়ী শিলালিপি ছিল এবং এই বড়নগরে ও কাশীধামে রাণী ভবানী একইরূপ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া একই দিনে ও একই শুভক্ষণে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

২। দেবীপুর বড়নগরের অপর পারে অবস্থিত, কাঁকিনার কোন রাজমহিষী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

মন্তব্য :—এই লিপিগুলির চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রেরিত হইবার পর মূল পাঠের সহিত শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ বাবু কর্ত্তৃক ধৃত পাঠের দুই এক স্থানে সামান্য অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত পাঠ অনুসারে সংশোধিত করিয়া লিপির পাঠ মুদ্রিত হইল।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি—১৯৭ পৃঃ

মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি—১৯৭ পৃঃ

১। শিব-মন্দির। ২। গণেশ-মন্দির। ৩। শ্রীগোপাল-মন্দির।

আর্য্যভট

পৃথিবী স্থির, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্রূপ বিশ্বাসও করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধরূপ সত্য মত আর্য্যভট প্রচার করেন। তাঁহার মতে পৃথিবী সূর্য্যদেবকে পরিভ্রমণ করেন এবং স্বীয় মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া আবর্ত্তন করেন—তিনি অচলা নহেন; তিনি সচলা; পরন্তু সূর্য্যদেব ও আকাশমণ্ডলই অচল ও স্থির। তাঁহার মতে[১] পৃথিবীর দুই গতিই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখী। তাঁহার দশ-

---

১। কুঙিশিবুণ্লৃষ্খৃ প্রাক্। ১। গী।

[সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইতেছে—

যুগরবিভগণাঃ খ্যুঘৃ শশি চয়গিয়িঙুশুছ্লৃ কু ঙিশিবুণ্লৃষ্খৃ প্রাক্।

শনি ঢুঙ্বিঘ্ব গুরু খ্রিচ্যুভ কুজ ভদিঝ্নুখৃ ভৃগুবুধ সৌরাঃ॥

[এক যুগে—

রবির ভগণ—৪,৩২,০০,০০,

কারণ, খু = ২,০০,০০

যু = ৩০,০০,০০

ঘৃ = ৪,০০,০০,০০;

চন্দ্রের ভগণ—৫৭,৭৫,৩৩,৩৬

কারণ, চ = ৬

য = ৩০

গি = ৩,০০

রি = ৩০,০০

৫,০০,০

শু = ৭০,০০,০০

ছৃ = ৭,০০,০০,০০

লৃ = ৫০,০০,০০,০০;

কু অর্থাৎ ভূমির ভগণ—১৫,৮২,২৩,৭৫,০০, (পূর্ব্বাভিমুখে)

কারণ, ঙি = ৫,০০

শি = ৭০,০০

বু = ২৩,০০,০০

ণ্লৃ = ১৫,০০,০০,০০,০০

খৃ = ২,০০,০০,০০

ঘ = ৮০,০০,০০,০০;

শনির ভগণ—১৪,৬৫,৬৪

কারণ, ঢ = ১৪,০০,০০

গীতিকায় পৃথিবীর ভগণ উল্লেখকালে তিনি প্রথম মতের আভাস দিয়াছেন এবং গোলপাদের মধ্যে উভয় মতের বর্ণন উপলক্ষ্যে সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।২

ঙি = ৫,০০
ণি = ৬০,০০
ঘ = ৪
ব = ৬০ ;

শুক্রের ভগণ—৩৬,৪২,২৪

কারণ, খি = ২,০০
রি = ৪০,০০
চু = ৬,০০,০০
যু = ৩০,০০ ০০
ভ = ২৪ ;

কুজের ভগণ—২,২৯,৬৮,২৪

কারণ, ভ = ২৪
দি = ১৮,০০
লি = ৫০,০০
ঝু = ৯,০০,০০
সু = ২০,০০,০০
খ = ২.০০ ০০ ০০ .

ভৃগু এবং বুধের ভগণ সূর্য্যের ভগণের সমান।

আর্য্যভটের নিয়মানুসারে সংখ্যালিখন-প্রণালী—

(১) ক হইতে ম পর্য্যন্ত যথাক্রমে ১ হইতে ২৫ ; যথা, ক=১, খ=২, ঙ=৫, দ=১৮, ব=২৩, ভ=২৪, ম=২৫ ।

(২) য=৩০, র=৪০, ল=৫০, ব=৬০ শ=৭০, ষ=৮০, স=৯০, হ=১০০।

(৩) কোন অক্ষরের পর অকার থাকিলে, সেই অক্ষর নির্দ্দেশিত সংখ্যাকে "একক" স্থানে লিখিতে হইবে।

(৪) কিন্তু ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ঐ ও, ঔ যোগ থাকিলে সংখ্যার পরে যথাক্রমে ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬টি শূন্য যোগ করিতে হইবে।

(৫) এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ থাকিলে সেই সেই হ্রস্ব স্বরের নির্দ্দেশিত সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

২। অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং ॥ ৯ ॥ গো।

[নৌকাস্থিত কোন ব্যক্তি সম্মুখ দিকে যাইতে যাইতে তীরস্থ অচল পদার্থসমূহকে যেমন পশ্চাদ্দিকে চালিত দেখে, লঙ্কায় অবস্থিত কোন ব্যক্তিও সেইরূপ অচল আকাশমণ্ডলকে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে দেখে।

উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি ॥ ১০ ॥ গো।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

আর্য্যভট একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহার নাম আর্য্যভটীয়। ইহাতে ১০টি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আর্য্যা ছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। কিন্তু ইহাতেই জ্যোতিষের যাবতীয় জ্ঞাতব্য-বিষয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ রহিয়াছে। এরূপ ক্ষুদ্র আয়তনে এত জ্ঞানরাশি পূর্ণ করা অসামান্য প্রতিভার কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থকে জ্যোতিষগ্রন্থের রত্নস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আর্য্যভটীয় চারি ভাগ বা পাদে বিভক্ত। প্রথমটি গীতিকাপাদ। ইহাতে জ্যোতিষের সত্য সূত্রভাবে ১০টি গীতিকা ছন্দে গ্রথিত, কিন্তু শ্লোক ১৩টি আছে। গ্রহগুলির ভগণ, তাহাদের পাত, উচ্চ, মন্বন্তর, কল্প, যুধিষ্ঠিরের সময়, সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহগণের ব্যাস, আকাশকক্ষা, মনুষ্য ও যোজনের পরিমাণ ও জ্যোৎপত্তি কথন প্রভৃতি ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সচরাচর "দশগীতিকা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আর্য্যভট বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য দশগীতিকায় একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন—বর্ণমালার সাহায্যে তিনি তাঁহার অভীষ্ট সংসিদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। ব্যঞ্জন বর্ণমালায় পাঁচটি বর্গ আছে, তাহার প্রত্যেকে পাঁচটি বর্ণ আছে; সুতরাং পাঁচটি বর্গে ২৫টি বর্ণ হইল। তিনি কাদি হইতে মান্ত পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ১ হইতে ২৫ সংখ্যা অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। তারপর য হইতে হ পর্য্যন্ত বর্ণের ক্রমান্বয়ে ৩০ হইতে ১০০ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বরবর্ণের কেবল ৫টি হ্রস্ব ও শেষ চারিটি দীর্ঘ ধরিয়া এক, শত, দশসহস্র আদি শতগুণ বৃদ্ধিরূপে অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিতে ৯ স্বরের উর্দ্ধে যাইতে হয় নাই।

দ্বিতীয় পাদটির নাম গণিতপাদ। ইহাতে গণিতের সূক্ষ্ম স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। বৃত্ত ও ব্যাসের স্থূল অনুপাত ২২ ও ৭ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহার সূক্ষ্ম রূপ ৩·১৪১৫৯৫... ও ১ দ্বারা ইউরোপীয়গণ স্থির করিয়াছেন। আর্য্যভট এই গণিতপাদে সেই অনুপাত ৬২৮৩২ ও ২০০০০ দ্বারা প্রকাশিত করিয়াও লিখিয়াছেন যে, উহা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু যথার্থের নিকটবর্ত্তী।[৩] ইহার দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বে গণিতের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা যে quadrature of circle এর অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। তিনি এই গণিতপাদে ক্রমজ্যার অনুপাতে ব্যাসার্দ্ধের উল্লেখও করিয়াছেন; সুতরাং ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ জ্ঞাত থাকিলে পরিধির ষড়ংশের জ্যা অবগত হওয়া

৩। চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রানাং।
অযুতদ্বয়বিষ্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্তপরিণাহঃ॥ ১০॥ গ।

[যাহার ব্যাসের পরিমাণ ২০,০০০, এইরূপ বৃত্তের পরিধির আসন্ন পরিমাণ

(৪+১০০)×৮+৬২,০

৬২৮৩২।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

যাইতে পারে।[৪] তিনি গীতিকাপাদে লিখিত জ্যার্দ্ধের আনয়ন করিবার প্রণালী এই গণিত-পাদে ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। এই গণিত ত্রিকোণমিতি জানিবার ফল। ইহার দ্বারাই আর্য্যভট গ্রহগণের ব্যাসাদি নিরূপণ করিবার স্থূল সহায়তা পাইয়াছিলেন।

কালক্রিয়াপাদে কালের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই আর্য্যভট স্বীয় জন্মসময় ও আর্য্যভটীয় লিখনকালে তাঁহার বয়ঃক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ২৩ বৎসর জন্মসময়ে যুগের তিনটি পাদ এবং ৬০ বৎসরের ৬০টি গত হইয়াছে। অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগরূপ তিনটি পাদ ও কলিরূপ পাদের ৩৬০০ বৎসর অতীত হইলে তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছিল; সুতরাং তিনি যে কলির ৩৫৭৭ বৎসর অথবা ৩৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা জানা যাইতেছে।[৫]

এই কালক্রিয়াপাদে তিনি গ্রহগণের ক্রম-অবস্থিতি দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার মতে গ্রহগণ শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র এই অধঃক্রমে শূন্যে অবস্থিত এবং ইহাদের সকলের নিম্নে পৃথিবী "মেধী" (খোঁটা)রূপে অন্তরিক্ষে বিরাজমান।[৬] ইহার পূর্ব্ব আর্য্যায় তিনি লিখিয়াছেন যে, চন্দ্র সকলের অধঃস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডলপূর্ত্তিও অল্প সময়ে সম্পাদিত হয় এবং শনি দূরস্থ হওয়ায় তাহার মণ্ডল পূরণ করিতে দীর্ঘ সময় লাগে।

৪। পরিধেঃ ষড়্‌ভাগজ্যাবিষ্কম্ভার্দ্ধেন সা তুল্যা॥ ৯। গ।

[পরিধির ছয় ভাগের জ্যা (=chord) ব্যাসার্দ্ধের তুল্য]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং দশগীতিকা মতে circular measure ৩৪৩৮ কলা অর্থাৎ ৫৭.৩ অংশ। ইউরোপীয় মতে ৫৭.২৯৫৭৮।

৫। ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।

ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥ ১০॥ কা।

[গীতিকাপাদের তৃতীয় (ডাঃ কার্ণের সংস্করণ অনুসারে) শ্লোকে আর্য্যভট বলিয়াছেন, ব্রহ্মার একদিন =১৪ মনু, ১ মনু=৭২ যুগ (অর্থাৎ চতুর্যুগ) ; আর্য্যভটের মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই যুগের এক এক পাদ (চতুর্থাংশ) মাত্র। আর্য্যভটের মতে কল্পাদি হইতে ছয় মনু গত হইয়াছে ; সপ্তম মনুর সপ্তবিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে। অষ্টাবিংশতি যুগের তিন যুগ-পাদ গত হইয়াছে। আর্য্যভট এই শ্লোকে বলিতেছেন (সপ্তম মনুতে অষ্টাবিংশতি যুগে) "চতুর্থ যুগপাদের (অর্থাৎ কলিযুগের) ৩৬০০ তিন হাজার ছয় শত বৎসর গত হইলে আমার জন্ম সময় হইতে ২৩ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে"; অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগের ৩৬০০ বৎসর গত হইলে আর্য্যভটের বয়স ২৩ বৎসর হইয়াছে। ইহাই তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন-কাল।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

৬। ভানামধঃ শনৈশ্চরসুরগুরু-ভৌমার্কশুক্রবুধচন্দ্রাঃ।

তেষামধশ্চ ভূমির্মেধীভূতা খমধ্যস্থা॥ ১৫॥ কা।

[নক্ষত্রমণ্ডলের নীচে যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষ্যায় অবস্থিত। সকলের নীচে পৃথিবী যেন আকাশমধ্যে মেধী—(খলমধ্যে স্থিত, ধান্যমর্দক বলীবর্দাদি বন্ধনার্থ স্থাপিত স্থূল শঙ্কু) রূপে অবস্থিত। এই শ্লোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

এইরূপে গ্রহগণের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অল্প দীর্ঘ মণ্ডল দ্বারা নিরূপণ করিবে।[৭] এরূপ লিখন সত্বেও টীকাকার বাহ্বাস্ফোট করিয়া লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভট পৃথিবীর সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ-মতের নিরাকরণ করিতেছেন। এ স্থলে আর্য্যভটের ভাব যে অন্যরূপ, তাহা বেশ বোধ হইতেছে। এখানে সূর্য্যদেবই "মেধ" এবং পৃথিবীই গ্রহস্থলে তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। কারণ, ইহা না ধরিলে তাঁহার পূর্ব্বাপর লিখনের পরস্পর বিরোধ হয়—কোন ধীর ব্যক্তি তাহা করেন না। অপিচ তিনি সর্ব্বত্রই পৃথিবীকে গ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ শব্দদ্বারা তাহার সূর্য্যপরিত ভ্রমণ সূচিত করিয়াছেন। যথা—(ক) দশগীতার পাঠক ভপঞ্জরে ভূগ্রহের ও অন্য গ্রহের ভ্রমণ জ্ঞাত হইয়া পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। (খ) গ্রহের পরম অপক্রম ২৪ অংশ।[৮] অপক্রমকে obliquity of the ecliptic বলে। (গ) গীতিকাপাদের এই নিম্ন গীতিকার দ্বারাও সূর্য্যের স্থিরতা ও পৃথিবীর পরিভ্রমণ যোজনে প্রকাশিত হইতেছে। যথা,—

৭। মণ্ডলমল্পমধস্তাৎ কালেনাল্পেন পূরয়তি চন্দ্রঃ।
উপরিষ্টাৎ সর্ব্বেষাং মহচ্চ মহতা শনৈশ্চারী ॥১৩॥ কা।

[সকলের নিম্নে থাকাতে চন্দ্রমণ্ডলের পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং সেই জন্য চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়েই নিজ মণ্ডল পূরণ করেন। সকলের উপরে থাকাতে শনিকক্ষার পরিধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই জন্য মণ্ডল পূরণ করিতেও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

অল্পে হি মণ্ডলেঽল্পা মহতি মহান্তশ্চ রাশয়ো জ্ঞেয়াঃ।
অংশাঃ কলাস্তথৈবং বিভাগতুল্যাঃ স্বকক্ষাসু ॥ ১৪ । কা ॥

[অল্প মণ্ডলে রাশি, অংশ কলাদির যোজন পরিমাণ অল্প বুঝিতে হইবে। সেইরূপ মণ্ডল বৃহৎ হইলে তাহাতে রাশ্যাদির যোজন পরিমাণ অধিক বুঝিতে হইবে।

রাশি=যে কোন বৃত্ত-পরিধির ১২ ভাগের এক ভাগ।

অংশ=যে কোন রাশির ৩০ ভাগের এক ভাগ, ইত্যাদি।

অতএব বৃত্ত-পরিধির যোজন পরিমাণ অনুসারে রাশ্যাদির যোজন পরিমাণেরও অল্পাধিক্য হইবে।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

দশগীতিকাসূত্রমিদং ভূগ্রহচরিতং ভপঞ্জরে জ্ঞাত্বা।
গ্রহভগণপরিভ্রমণং স যাতি ভিত্ত্বা পরং ব্রহ্ম ॥ ১১ । গী ॥

ভপঞ্জরে ভূ-রূপ-গ্রহের চরিত (অর্থাৎ স্বরূপ) যাহাতে জানা যায়, এইরূপ দশগীতিকাসূত্র সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ স্থির করিতে পারিলে পরং ব্রহ্ম লাভ হয়।

৮। ভাগপক্রমো গ্রহাংশাঃ   *   ।
*   ~   *   ॥ ৬ । গী ॥

[ছন্দের অনুরোধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, গ্রহাপক্রম ভ (=২৪) অংশ। গ্রহের পরম অপক্রম মাত্র ২৪ অংশ, এই গ্রহ অর্থে সূর্য্য। কারণ, পরে অন্যান্য গ্রহের বিশেষ উল্লেখ আছে। ঘটিকা মণ্ডল এবং অপক্রম মণ্ডলের অন্তরাল ২৪ অংশ। Obliquity of the Ecliptic=24 degrees.

—[শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতেও ইহা ২৪ অংশ, জয়পুরের রাজা জয়সিংহ মহম্মদ শার সময় উহা ২৩ অংশ ২৮ কলা স্থির করেন। অধুনা ইউরোপীয়গণের মতে উহা ২৩।২৭।

প্রাণেনৈতি কলাং ভং খযুগাংশো গ্রহজবো ভবাংশেঽর্কঃ ॥ ৪ ॥ গী।

নক্ষত্র প্রাণ সময়ে এক কলা গমন করে। গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর গতি আকাশকক্ষার যুগাংশ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ অংশ। এই আকাশ-কক্ষার ষষ্টি অংশে সূর্য্যদেব অবস্থিত। (ঘ) গোলপাদের ৯।১০ আর্য্যার দ্বারা আর্য্যভট পৃথিবীর গ্রহ সম্বন্ধে যত গোল বা সন্দেহের নিরসন করিয়া ভূভ্রমবাদের বিশেষরূপে স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন। যথা,—

অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াং ॥ ৯ ॥ গো।
উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি ॥ ১০ ॥ গো।

নৌকাস্থ ব্যক্তি যেমন অগ্রে অগ্রসর হইলেও পৃথিবীকে পশ্চাৎগামিনী দেখিয়া থাকে, সেইরূপ অচল নক্ষত্ররাশি পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতির দ্বারা তাহা লঙ্কার ঠিক পশ্চিমগামী বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রবহ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিয়া গ্রহ ও তারাগণের উদয়াস্তের কারণ হইতেছে (?)। তাই আকাশমণ্ডল লঙ্কার ঠিক পশ্চিমে ভ্রমণশীল দৃষ্ট হইয়া থাকে (?)।

এ স্থলের "সগ্রহ" শব্দটির প্রতি মনোনিবেশ করিলে আর্য্যভটের ভাবে কোন সন্দেহ থাকিবে না। গ্রহ শব্দদ্বারা অন্য গ্রহ বুঝাইতে পারে না। কারণ, সেগুলি ত ভপঞ্জর বা আকাশ-মণ্ডলেরই অন্তর্গত। সুতরাং পারিশেষ্য গ্রহশব্দ দ্বারা পৃথিবীই বুঝাইতেছে।

আর্য্যভটের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত বরাহমিহির। ইনি একজন প্রধান জ্যোতিষী। ইঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত তাঁহার গণিত-জ্যোতিষ। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতা ইঁহার ফলিতজ্যোতিষ। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ইনি আর্য্য-ভটের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রগ্রহণ গণিতের দোষ প্রদর্শন ও অন্য বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যসংস্থান নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি আর্য্যভটের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সূর্য্যপরিত ও আবর্ত্তনরূপ পৃথিবীর উভয় গতির নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা,—

ভ্রমতি ভ্রমস্থিতেব ক্ষিতিরিত্যপরে বদন্তি নোড়ুগণঃ।
যদ্যেবং শ্যেনাদ্যাঃ ন স্যাৎ পুনঃ স্বনিলয়মুপেয়ুঃ ॥৬
অন্যচ্চ ভবেদ্ভূমেরহ্না ভ্রমরংহসা ধ্বজাদীনাং।
নিত্যং পশ্চাৎ প্রেরণমথাল্পগা স্তাৎ কথং ভ্রমতি ॥৭

এ স্থলে যে ভ্রম অনিবার্য্য, বরাহমিহিরও তাহাই করিয়াছেন। কালক্রিয়াপাদে আর্য্যভট পৃথিবীকে "মেধী"রূপ বলায় পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া বরাহমিহির তাহাই ধরিয়া মত খণ্ডন করিতেছেন। মেধী বলিলে গণিতের যে ফল হয়, কুম্ভকার-চক্রের মধ্যস্থিত মৃৎপিণ্ড

বলিলেও গণিতের সেই ফলই দাঁড়ায়। সুতরাং বরাহ বলিলেন, কেহ কেহ বলেন—তারাগণ ভ্রমণ করে না, চক্রমধ্যস্থিত পৃথিবী ঘুরিতেছে। তাহা যদি হয়, পক্ষিগণ নিজ নিজ আবাস-স্থানে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিবে না, ইহা হইল সূর্য্যপরিত ভ্রমণের খণ্ডন (?)। আবর্ত্তন-মত স্বীকার করিলে, পৃথিবীর প্রাত্যহিক ভ্রমণবেগপ্রযুক্ত যে বায়ু উত্থিত হয়, তাহার আঘাতে পৃথিবী প্রতিহত হইয়া মন্দগামিনী হইবে এবং পতাকাগুলি সর্ব্বদাই পশ্চাৎগামী দৃষ্ট হইবে। এরূপ যখন হয় না, তখন পৃথিবীর আবর্ত্তনও অসিদ্ধ। বরাহের এ যুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর।

ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রায় ১২৯ বৎসর পরে তাঁহার ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার খণ্ডনযুক্তি সারগর্ভ হইলেও তাহা সত্যের সমক্ষে স্থির থাকিতে পারে না। যথা,—

প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি তর্হি কুতো ব্রজেৎ কমধ্বানং।

আবর্ত্তমানমূর্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়া কস্মাৎ॥ ১৭॥ তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়।

ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর সূর্য্যপরিত গতির স্বরূপ না জানিয়া নক্ষত্রের প্রাণ সময়ে কলাপরিমিত গতির স্বীকার করিয়া, তাহাই পৃথিবীর প্রতি আরোপ করিয়াছেন। বাস্তবিক পৃথিবীর আবর্ত্তন-গতির পরিমাণও তাই। তার পরেই তিনি বলিতেছেন, পৃথিবী যায় কোথায়? পথই বা কৈ? আর পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিলে অট্টালিকা আদি উচ্চ বস্তুগুলি পড়িয়া যায় না কেন?

ইঁহাদের পরে লল্ল ও শ্রীপতিও বরাহের অনুরূপ যুক্তির দ্বারা আর্য্যভটের মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জ্যোতিষের পরিভাষা যেরূপ বুঝিয়া থাকেন, আর্য্যভট কোন কোন স্থলে তাহার বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,—(১) আর্য্যভট 'যুগ' শব্দে মহাযুগ অথবা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগচতুষ্টয়ের সমষ্টি বুঝিয়াছেন এবং প্রত্যেক যুগকে যুগপাদ বলিয়াছেন[৯]; মহাযুগ পরিভাষা প্রথম সূর্য্যসিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয়। (২) তিনি দশগীতিকায় ৭২ যুগে মন্বন্তর ধরিয়াছেন এবং কালক্রিয়াপাদে ১০০০ যুগ-পরিমিত কালকে গ্রহ-সামান্তযুগ বলিয়াছেন এবং ১০০৮ যুগকে ব্রহ্মার দিন বলিয়াছেন[১০]। ইহা মনুসংহিতার ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত।

৯। যুগরবিভগণাঃ খ্যুঘৃ ১। গী। অর্থাৎ মহাযুগ বা ৪৩২০০০০ বৎসরে রবির ভগণ খু=২০০০০ যু=৩০০০০০ ঘৃ=৪০০০০০০ এই সংখ্যার সমষ্টি ৪৩২০০০০ হইল। তাঁহার জন্মবোধক আর্য্যা দ্রষ্টব্য।

১০। দিব্যং বর্ষসহস্রং গ্রহসামান্তং যুগং দ্বিষট্‌কগুণং।
অষ্টোত্তরং সহস্রং ব্রাহ্মো দিবসো গ্রহযুগানাং॥৮॥ কা।

[আর্য্যভট পূর্ব্বে বলিয়াছেন, ১ রবি বর্ষ=১ মনুষ্যের বর্ষ, ৩০ মনুষ্য বর্ষ=১ পিত্র্য বর্ষ, ১২ পিত্র্য বর্ষ =১ দিব্য বর্ষ। এখানে বলিতেছেন—১২০০০ দিব্য বর্ষ=১ গ্রহ সামান্ত যুগ (যখন সকল গ্রহ সমসূত্রে ফিরিয়া আসে), ১০০৮ গ্রহযুগ=১ ব্রাহ্ম দিবস।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

আর্য্যভটের মতে বুধবার মেষ রাশির আদিতে সত্যযুগের প্রবৃত্তি হয়, বৃহস্পতিবারে দ্বাপরের শেষ হয় এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গমন করেন১১। ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মত ও বিশ্বাস। বরাহমিহির কিন্তু ইহার বিপরীত মত বৃহৎসংহিতায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যখন যুধিষ্ঠির পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন, তখন সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালের শকাব্দপূর্ব্ব ২৫২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে১২। ইহা জ্যোতিষী গর্গ মুনির মত। কিন্তু তিনি মুনিগণের উক্ত নক্ষত্রে অবস্থিতি দ্বাপরান্তে ও কলির প্রারম্ভে দিয়াছেন।

আর্য্যভট কলি-অব্দই ব্যবহৃত করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তখনও তাঁহার অধ্যুষিত প্রদেশে শকাব্দের প্রচলন হয় নাই। বরাহ পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ৪২৭ শকাব্দকে করণাব্দ স্বীকার করিয়া তাঁহার গ্রহস্ফুট আদি গণনা করিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম-বৎসর। বৃহৎসংহিতায় শকাব্দ কালের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কৃতি সূর্য্যসিদ্ধান্তে চাতুরী করিয়া উহা উল্লিখিত করেন নাই; যেহেতু উহার দ্বারাই তিনি আর্য্যভটের সত্য খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কারণ, উহা সূর্য্যপ্রোক্ত গ্রন্থ; সুতরাং মনুষ্যোক্তি হইতে গরীয়ান্। কিন্তু ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণির বাসনা ভাষ্যে যেরূপ শব্দভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তকে বরাহ-রচিত বলিয়াই জানিতেন (?); কিন্তু সমাজ-শাসনে স্পষ্টভাবে জিহ্বাগ্রে তাহা আনয়ন করিতে সংকুচিত হইতেন। কারণ, তিনি শিরোমণিতে অয়নগতির পরিধিবৎ মত মঞ্জুলাদির লিখন হইতে প্রকাশ করিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখিত অয়নচক্রের দোদুল্যমানতা মত গ্রহণ করেন নাই; অপিচ বাসনা ভাষ্যে আগম বা বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্তের পরিধিবৎ ভাবই উপন্যস্ত করিয়াছেন ।

কাহো মনবো ঢ মনুযুগ শ্খ গতাস্তে চ মনুযুগ ছনা চ।
কল্পাদের্যুগপাদা গ চ গুরু দিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং। ৩। গী।

[১ ব্রাহ্ম দিবস = ১৪ মনুযুগ বা মন্বন্তর,
১ মন্বন্তর = ৭২ যুগ,
১ যুগ = সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপ ৪ পাদ।

কল্পাদি হইতে যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের গুরুবারের পূর্ব্বে ৬ মনু, ২৭ যুগ, তিন পাদ গত হইয়াছে। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের দিন গুরুবার হইতে কলিযুগপাদ আরম্ভ।

—শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার]

১১। গুরুদিবসাচ্চ ভারতাৎ পূর্ব্বং। ৩। গী।
* * * ।
* বুধাহ্যজার্কোদয়াচ্চ লঙ্কায়াং। ২। গী।
[লঙ্কায় বুধবারে মেষ রাশিতে সূর্য্যোদয় হইতে কল্পারম্ভ।]

১২। আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য।

১৩। বিষুবৎক্রান্তিবলয়ঃ সংপাতঃ ক্রান্তিপাতঃ স্যাৎ।
তদ্ভগণা সৌরোক্তা ব্যস্তা অযুতত্রয়ং কল্পে।

বরাহের এরূপ চাতুরী সত্ত্বেও আর্য্যভটের মত প্রায় ৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত-প্রতাপ ছিল। ভোজরাজ ও পুরাণকারগণের সময় হইতে প্রাচীন ভ্রান্ত মত পুনঃ বলীয়ান্ হয় এবং আর্য্যভটের গ্রন্থের পঠন-পাঠন রহিত হয়। ভোজরাজের পূর্ব্বে ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের প্রথিতনামা টীকাকার চতুর্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী ব্রহ্মগুপ্তের মত খণ্ডন করিয়া আর্য্যভটের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন[১৪]। আর্য্যভটের প্রাচীন টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা ভট-প্রকাশিকা লেখেন। তাহাতে আচার্য্যের মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইনি জনৈক জ্যোতিষী। ইনিও ভোজরাজের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার গ্রন্থেরও প্রচার স্থগিত হইয়াছে; তাহার স্থলে ভাস্করের প্রায় ২০০ শত বৎসর পরবর্ত্তী পরমাদীশ্বরের রচিত ভ্রান্তমত-সম্বলিত ভটদীপিকা প্ররোচিত হইয়াছে।

আর্য্যভট পৃথিবীর ব্যাস ১০৫০ যোজন লিখিয়াছেন—সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে উহা ১৬০০, ভাস্করের মতে উহা ১৫৮১$\frac{১}{২৪}$ যোজন। আর্য্যভটের যোজনের পরিমাণ ৩২০০০ হস্ত, মনুষ্যের উচ্চতা ৪ হাত, হস্তের পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি।

আর্য্যভটের ধর্ম্মবিশ্বাস উদার ছিল। তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সকল দেবতার প্রতিই ভক্তিবিনম্র ও বিশ্বাসবান্ ছিলেন। তবে ঋষিগণের ন্যায় তাঁহার চরম লক্ষ্য পরমব্রহ্মই ছিলেন। দশগীতিকার প্রারম্ভে তিনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও সকল দেবতাকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন এবং শেষে তাহার ফলশ্রুতিতে পাঠকের প্রতি মোক্ষপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। গণিতপাদের প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও গ্রহগণকে নমস্কার করিয়া সত্য জ্ঞানের বর্ণন করিয়াছেন এবং গোলপাদের শেষে তাঁহার গ্রন্থের পরিপন্থীর প্রতি আয়ু ও যশের লোপকারী বলিয়া অভিশাপ করিয়াছেন। কারণ, তিনি লিখিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ সনাতন ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তেরই প্রতিরূপ[১৫]। ইহার দ্বারা তিনি যে বেদমধ্যস্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, বেদই ব্রহ্ম, তন্মধ্যস্থ জ্যোতিষই সিদ্ধান্ত।[১৬]

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

অয়নচলনং যদুক্তং মুঞ্জলাদ্যৈঃ স এবায়ং।
তৎপক্ষে তদ্গণা কল্পে গোঽঙ্গর্ত্তু নন্দগোচন্দ্রা ।
যদ্যেবমনুপলব্ধোঽপি সৌরসিদ্ধান্তোক্তত্বাৎ
আগমপ্রামাণ্যেন ভগণপরিধিবৎ কথং তৈনে াক্তঃ।—ভাষ্য।

১৪। ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং।

১৫। আর্য্যভটীয়ং নাম্না পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং সদসদ্‌যৎ।
সুকৃতায়ুষোঃ প্রণাশং কুরুতে প্রতিকঞ্চুকং যোঽস্য ।৫০। গো।

১৬। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অর্থ কেহ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। পঞ্চসিদ্ধান্তকার বরাহ ইহাকে দুরবিত্রষ্ট অর্থাৎ "লোহার কড়াই" বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধুনাতন কালের "বার্হস্পত্য" নামক জনৈক Hindustan Reviewর লেখকই ইহার যথার্থ অর্থ প্রচার করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইঁহার পরে পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী উহার টীকা লেখেন।

"আর্য্যভট" সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে "লঘু-আর্য্যভটীয়" নামক গ্রন্থোক্ত ভূভ্রম-বাদমতের বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ এবং কালক্রিয়াপাদের দুই একটি বিষয়েরও সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না ;—

(১) আর্য্যভটীয়ে শ্লোকের সংখ্যা তিনি ১২৩ লিখিয়াছেন। তিনি গ্রন্থখানির কোন্ সংস্করণ বা কোন্ পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। Dr. Kern এর সংস্করণে (১৮৭৪ খ্রীঃ) ১৩+৩৩+২৫+৫০=১৩+১০৮=মোট ১২১টি শ্লোক আছে। দশগীতিকাপাদের ১৩টি শ্লোক বাদ দিলে মোট ১০৮টি শ্লোক পাই। গ্রন্থখানির "আর্য্যাষ্টশতকম্" নামের সহিত এই সংখ্যার বেশ সামঞ্জস্য আছে। তবে দশগীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ ও গণিতপাদ, এই চারিটি পাদ হইতে মনে হয় যে, এগুলি একই গ্রন্থের চারিটি ভাগ মাত্র। সে যাহাই হউক্, এসিয়াটিক সোসাইটীতে Government Colleotionএ এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি আছে। ইহা নির্ভুল না হইলেও বড় অসম্পূর্ণ নহে। তাহাতে শ্লোকের সংখ্যা আছে—১৩+৩৩+২৭(?)+৫০=মোট ১২৩। কিন্তু তৃতীয় ভাগ কালক্রিয়াপাদের প্রথম দুইটি শ্লোকের সংখ্যা আছে মাত্র, কিন্তু ঐ সংখ্যায় কোন শ্লোক বা বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই। কেবল দশগীতিকা ও গণিতপাদের যথাক্রমে উল্লেখ আছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন, জানিতে পারিলে ভাল হয়।

(২) "গ্রহগণের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ তাহাদের অমুদৈর্ঘমণ্ডল পূরণ দ্বারা নিরূপণ করিবে", গ্রন্থ হইতে এরূপ ভাব মোটেই প্রকাশ পায় না। "মণ্ডল" অর্থ যে বিম্ব নহে, এ কথা ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। মণ্ডল পূরণের সময় দ্বারা স্ব স্ব কক্ষ্যার অমুদৈর্ঘ্য নিরূপণ করিবার কথা মাত্র গ্রন্থে আছে।

(৩) ব্রহ্মচারী মহাশয় 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' বরাহমিহিরের রচিত গ্রন্থ বলিয়াছেন এবং এই প্রবন্ধে এবং তাঁহার অন্যতম প্রবন্ধে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রমাণগুলি যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত সূর্য্যসিদ্ধান্ত সঙ্কলন মাত্র, বরাহমিহির ইহাতে কেবল পুরাতন সিদ্ধান্তের মতগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে তাঁহার নিজেরও কোন কোন মত সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহা তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় আমরা যাহা জানিতে পারি, তদ্ব্যতীত এই পুরাতন সিদ্ধান্তখানির আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহাই "পুরাতন সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামে পরিচিত। অধুনা আর একখানি সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রচলন আছে। ইহার সহিত পঞ্চ-সিদ্ধান্তোক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্থানে স্থানে অমিল থাকায়, ইহা আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। কিন্তু ইহাও বরাহমিহিরকৃত নহে। খ্রীষ্টীয় ৭।৮ শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত।

(১) পৃথিবী একটি গ্রহ, (২) পৃথিবী অচলা নহেন, (৩) পৃথিবী দৈনিক আবর্ত্তনশীল এবং (৪) সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণশীল—এই কয়টি বিষয় ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে আর্য্যভটীয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনশীলতা সম্বন্ধে (অর্থাৎ তাহা ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হওয়া সম্বন্ধে) বিশেষ কোন মতভেদ নাই। তবে পৃথিবীর গ্রহত্ব এবং সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রমাণগুলি নূতন না হইলেও এইরূপ জোর করিয়া প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ব্যতীত* কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন নাই। প্রমাণগুলি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, তবে যথেষ্ট নহে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় যে ভূভ্রমমতের খণ্ডন আছে, তাহাতে সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মতের খণ্ডনই যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। অতএব এ প্রমাণের তত মূল্য নাই। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। তাঁহার খণ্ডনের ধরণ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহার সময়েও (৬২৮ খ্রীঃ) যেন এই উভয় (ব্রহ্মগুপ্তের মতে ভ্রান্ত) মতই (অর্থাৎ দৈনিক আবর্ত্তন ও সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত) প্রচলিত ছিল। আর আর্য্যভটের প্রতি ব্রহ্মগুপ্তের বিদ্বেষ এবং অযাচিত কটুবাক্য প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, আর্য্যভটীয় শাখার (School of Aryyabhata) দ্বারাই ঐ মতের প্রচার হইয়াছিল। আর্য্যভটীয়ের অনেক টীকা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল। সেই সকল টীকা আবিষ্কৃত হইলে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে।

উপরোক্ত কারণে এবং এই বিষয় সম্বন্ধে যদি কাহারও নিকট আর কোন নূতন তথ্য পাওয়া যায়, এই জন্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটির প্রকাশ খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি নূতন না হইলেও† বঙ্গভাষায় তাহার প্রচার হয় নাই এবং হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার

---

* ভারতী, আষাঢ় ১৩০০।

† অনুসন্ধিৎসু পাঠক আর্য্যভট সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখিতে পারেন,—

(১) "আর্য্যভটীয়ম্"—Dr. Kern's Edition, 1875.
(২) আর্য্যভট সম্বন্ধে প্রবন্ধ—Dr. Kern's Collected Works.
(৩) Rodet, Calcul du Aryyabhata.
(৪) Colebrooke, Essays, Vol. II, pp. 364-365 ; pp. 420-429.
(৫) Colebrooke, Preface to the translation of Lilavati.
(৬) Dr. Thibaut—পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ভূমিকা।
(৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1908.
(৮) Bulletin, Calcutta Mathemetical Society, Vol. III.
(৯) ভারতবর্ষ, ১৩২৩-২৪।
(১০) ভারতী, ১৩০০।—"পৃথ্বী"র শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্তকৃত সমালোচনা, এবং অন্যান্য জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
(১১) ভারতী, ১৩০১।—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের "হিন্দু-জ্যোতিষীগণের বিবরণ" দ্রষ্টব্য।

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গালা-দেশে মুসলমান অধিকারের পত্তন। তখন হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় ফারসী ও আরবী নাম এবং শব্দের প্রবেশের সূত্রপাত।

মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আরব জাতির জাতীয়তার উন্মেষের যুগে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আদিতে উময়্য়-বংশীয় খলীফহ্ সুলয়্মান যখন দমস্ক নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন ইরাক্ ও অল্-জজীরহ্ (মেসোপোটামিয়া) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হজ্জাজ ভারতে ইস্লাম প্রচারের জন্য মহম্মদ্ ইব্ন্-ক়াসিমের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানে আরব মুসলমানেরা ৭১২ সালে সিন্ধু প্রদেশ জয় করে; এবং ওই প্রদেশ কিছু কাল আরবদের হাতেই থাকে। কিন্তু আরবদের অধিকার এ দেশে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয় নাই; এমন কি, ইহাদের আগমনবার্ত্তা ভারতের অন্য প্রদেশের লোকেরা বোধ হয় ভাল করিয়া জানিতেই পারে নাই। ভারত-বিজয়ের উদ্দেশ্য লইয়া দেখা দেয়, তুর্কী ও আফগান জাতীয় মুসলমানেরা। বগ্দাদের ‹অব্বাস-বংশীয় খলীফহ্-দের ক্ষমতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, সল্জূক্ ও অন্যান্য জাতীয় তুর্কীরা পারস্য, ইরাক্ ও পশ্চিম এশিয়া-খণ্ডে আসিতে থাকে, এবং ক্রমে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে ঐ সকল দেশে এই তুর্কীরা বিশেষ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়, আরব ও পারসীকেরা ইহাদের কাছে অবনতি স্বীকার করে। বিভিন্ন তুর্কী-গোষ্ঠী খোরাসান ও আফগানস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং অর্দ্ধসভ্য আফগানদিগকে আপনাদের বশে আনয়ন করে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি, ৯৬২ সালে অল্প্-তগীন্ নামে এক তুর্কী সেনানী আফগানস্থানের গ়জ়্নহ্ বা গ়জ়্নী নামক স্থানের গড় দখল করেন, এবং আফগানস্থানে এক তুর্কী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প্-তগীনের পর সবুক্-তগীন্ এবং তৎপুত্র বিখ্যাত মহ্মূদ রাজা হন। সবুক্-তগীন্ই প্রথম ভারত-বিজয়ের বিষয়ে মনোযোগী হন। তিনি পঞ্জাবের ব্রাহ্মণ রাজা জয়পালকে কয়েকবার পরাজয় করেন। মহ্মূদ্ (মহ্মূদ্ গ়জ়্নবী নামে বিখ্যাত) ষোল বার ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সকল আক্রমণ লুণ্ঠনের অভিযান ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু মহ্মূদের শৌর্য্য ও তাঁহার তুর্কী এবং আফগান সৈন্যের অপ্রতিহত পরাক্রমের কাছে উত্তর-ভারতের সমবেত শক্তি দাঁড়াইতে পারে নাই। মহ্মূদ্ দক্ষিণে সোমনাথ ও পূর্ব্বে কালঞ্জর পর্য্যন্ত সেনা আনয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র পঞ্জাব প্রদেশ নিজ অধিকারে রাখেন। গ়জ়্নীর তুর্কী সুলতানদের সময় হইতে 'তুর্কী' শব্দ ভারতে মুসলমান-বাচক হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, বিশিষ্টরূপে মুসলমান ধর্ম্মের ও মুসলমান ভাবের সহিত ভারতের ধর্ম্মের ও ভাবের প্রথম সঙ্ঘাত, তুর্কীরাই ভারতে আসাতে ঘটে। বহু কাল ধরিয়া পঞ্জাবে, রাজপুতানায় মধ্যদেশে, বাঙ্গালায়, যত দিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন পশ্চিমা মুসলমান জাতির সহিত হিন্দুদের ঘনিষ্ঠ

পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই, তত দিন মুসলমান অর্থে 'তুর্ক্' বা 'তুরুক' শব্দই ব্যবহৃত হইত; এখনও এই অর্থে তামিলে 'তুলুক্ক' শব্দ প্রচলিত ; কারণ, দক্ষিণের লোকেদের মুসলমানদের সহিত ততটা সম্পর্কে আসিতে হয় নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘোর-প্রদেশের সূর-বংশীয় আফগানেরা 'অলাউ-দ্-দীন জহান্-সোজের নেতৃত্বে ঘজ়নী ধ্বংস করে। আফগানস্থানে আফগান ঘোরী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের তৃতীয় রাজা মুইজ়্জ়ু-দ্-দীন মুহম্মদ ঘোরী তিরৌরীর যুদ্ধে দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি রায়-পিথৌরা বা পৃথ্বীরাজকে পরাজয় করেন। মুহম্মদ ঘোরী নিজে আফগান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনায় বহু তুর্কী সেনানী ও সৈনিক ছিল। এই সকল তুর্কী সেনানীদের মধ্যে অন্যতম কুতুবু-দ্-দীন অয়্বক্ দিল্লীতে প্রথম মুসলমান রাজবংশের স্থাপন করেন। আর এক সেনাপতি ইখ্‌ৎয়ারু-দ্-দীন মুহম্মদ্ বখ্‌ৎয়ার খলজী বিহার (মগধ) জয় করেন ও নবদ্বীপ (উত্তররাঢ়) আক্রমণ করেন, এবং লক্ষ্মণাবতী নগর ও প্রদেশ (বরেন্দ্র) মুসলমান-শাসনের অধীনে আনেন। খলজী-গোষ্ঠীয়েরা সম্ভবতঃ তুর্কীজাতীয় ছিল, দীর্ঘকাল আফগান দেশে বাস করা হেতু পরে ইহারা ভাষায় ও আচারে আফগান হইয়া পড়ে। বখ্‌ৎয়ার সম্ভবতঃ তুর্কী-ভাষীই ছিলেন। প্রথম ভারতজয়ী মুসলমানেরা মুখ্যতঃ তুর্কী, ও পশ্‌তো-ভাষী আফগান, এই দুই জাতীয় ছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অনেক ঈরানী ও কিছু আরবও ছিল। উত্তর-ভারতবিজয়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে এশিয়া-মাইনরে, ইরাকে, পারস্যে, খোরাসানে ও আফগানস্থানে, সল্‌জুক্ ও অন্য জাতীয় তুর্কীদেরই বেশী প্রাধান্য ছিল ; ভারতেও বহু কাল ধরিয়া তুর্কীরাই প্রবল থাকে। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে দাস-বংশীয়েরা সকলেই তুর্কী ছিলেন ; খলজী-বংশীয়েরা তুর্কী-জাতি-সম্ভূত ছিলেন ; কিন্তু ইহাঁরা আচার-ব্যবহারে ও ভাষায় আফগান বা পাঠান বনিয়া গিয়াছিলেন। তঘ্‌লক্ রাজারা তুর্কী ছিলেন ; সয়্যিদ রাজারা খুব সম্ভবতঃ ভারতীয় মুসলমান ছিলেন। সয়্যিদ-বংশের পরে লোদী ও সূর বংশীয়েরা আফগান (পাঠান) ছিলেন, কিন্তু ইহাঁরা অনেকটা হিন্দুস্থানী হইয়া পড়েন। মোগল-বংশের প্রথম রাজা বাবর তুর্কী বলিতেন, তুর্কীতে তিনি তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ভারতের মোগল সম্রাট্‌গণ দুই তিন পুরুষেই হিন্দীভাষী হইয়া পড়েন। বাঙ্গালার মুসলমান শাসকদের মধ্যে, বঙ্গ-বিজয়ের পর প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত যাঁহারা রাজত্ব করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তুর্কী ছিলেন ; কিন্তু স্বদেশের সহিত সংযোগ না থাকায় তুর্কী ও আফগান, আরব ও হাবশী, সকলেই অল্পে অল্পে ভারতীয় মুসলমান হইয়া দাঁড়ান, এবং হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা গ্রহণ করেন।

পশ্‌তো, তুর্কী, ফারসী ও আরবী—এই চারি ভাষা মুসলমানদিগ-কর্ত্তৃক এ দেশে আনীত হয়। তুর্কীরা ও পশ্‌তো-ভাষী আফগানেরাই ভারতে খুব বেশী আসে, এবং মুসলমান-যুগের ইতিহাসের অনেকটা অংশ প্রধানতঃ ইহাদের লইয়া। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুর্কী

ও পশ্‌তোর প্রভাব ভারতের দেশী ভাষাগুলির উপর প্রায় কিছুই পড়ে নাই। তুর্কীর গোটাকতক শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় আসিয়াছে; যেমন—তুর্ক, তোপ, তকমা, খাঁ, বেগ, বেগম, উজবক, বাবুর্চী, উর্দু, চকমকী, কাবু, কোঁৎকা, মুচলকা। কিন্তু খুঁজিলেও পশ্‌তোর শব্দ দু চারটার বেশী বোধ হয় মিলিবে না। ইহার কারণ এই যে, এ দেশে তুর্কী ও পশ্‌তো যখন চলিত, তখন এই দুই ভাষা ঘরোয়া ভাষা হিসাবেই বিজেতা তুর্কী ও পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল;—ভারতের মুসলমান বিজেতাদের পোষাকী বা দরবারী ভাষা গোড়া হইতেই ফারসী ছিল। ফারসী-ভাষী মুসলমান অধিক পরিমাণে ভারতে না আসিলেও, ফারসীর ছাপ সিন্ধী, পঞ্জাবী, হিন্দী, বিহারী, বাঙ্গালা ও মরাঠীতে যতটা পড়িয়াছে, ততটা আর কোনও বিদেশী ভাষার নয়।

আধুনিক মুসলমান জগতে মুসলমান-সভ্যতার বাহনরূপে চারটি ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; সে চারিটি ভাষা হইতেছে আরবী, ফারসী, পশ্চিমী তুর্কী ও উর্দু। পশ্‌তো, বলোচ প্রভৃতি, মুসলমান জাতির ভাষা হইলেও মুসলমান-জগতে কখনও উচ্চ স্থান পায় নাই, এবং বহু কাল ধরিয়া পাইবেও না। পশ্‌তো-ভাষী আফগানেরা দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত জাতি বটে, কিন্তু সভ্যতায় ইহারা কখনও উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আফগানেরা তুর্কী সহযোগী ও প্রভুদের নেতৃত্বে ভারত-জয়ে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সভ্যতায় বড় বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহাদের সাহিত্য বড় হইয়া গড়িয়া উঠে নাই; অভিজাত শ্রেণীর আফগানেরা ফারসী ভাষা, সাহিত্য ও রীতি-নীতিই গ্রহণ করিতেন। এ বিষয়ে আফগান ও তুর্ক একমত ছিল। পারস্যে, আফগানস্থানে, ইরাকে তুর্কীদের ক্ষমতার পত্তন হইতেই তুর্কীরা সুসভ্য পারসীক জাতির অনুকরণ আরম্ভ করে। ফারসী ভাষা তখন আরবী ভাষার শব্দ-সম্পদের এবং ইস্‌লামী চিন্তা ও ভাবরাজ্যের পূর্ণ অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বগ্‌দাদের নবীন আরবী সাহিত্য ও চিন্তা অনেকটা পারসীক জাতিরই কৃতিত্বের ফল। তখন তুর্কীরা পশ্চিম-এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে নাই; এবং তখন পারস্যে, খোরাসানে ও তুর্কীস্থানে, কোথাও তুর্কী ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা হয় নাই। তুর্কীতে এমন কোনও বই ছিল না, যাহা শিক্ষিত মুসলমান তুর্কী পড়িয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন। এ দিকে প্রাচ্য মুসলমান-জগতে তুর্কী ক্ষমতার অভ্যুদয়ের যুগেই ফারসীতে একটা বড় দরের নূতন সাহিত্য তৈয়ারী হইয়া উঠিয়াছে। রূদাগী, দকীকী, ফির্‌দৌসী প্রমুখ মহাকবি ফারসী ভাষায় নূতন শক্তি দান করিয়াছেন। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের চর্চ্চার জন্য এই যুগে আরবী ভাষার বিশেষ প্রচলন থাকিলেও ধীরে ধীরে প্রাচ্যখণ্ডে, পারস্য খোরাসান, আফগানস্থান ও তুর্কীস্থানে, ফারসী আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ফারসী ভাষা দশম শতাব্দীর শেষের দিকেই তুর্কী ও আফগানদের পোষাকী ভাষা বা সাধু ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে যখন উত্তর হইতে বর্ব্বর মোঙ্গোল ও তাতারগণ নামিয়া আসিয়া খোরাসান, পারস্য ও ইরাকে পারসীক-আরব বা মুসলমানী সভ্যতার প্রায়

এক প্রকার বিলোপ সাধন করিল, বগ্‌দাদ নগর ধ্বংস করিয়া দিল, তখন হইতে এই নবীন মুসলমানী সভ্যতার বাহন আরবী ভাষার চর্চ্চা পারস্যে ও অন্যত্র অনেকটা কমিয়া গেল। মোঙ্গোল আক্রমণের পূর্ব্বে পারস্য দেশেও আরবীতে বই লেখা হইত; এখন হইতে দেশ ভাষা ফারসীর প্রসার বাড়িয়া গেল। কেবল স্বদেশে নহে, আফগানস্থানে ও তুর্কীদের মধ্যেও ফারসী প্রসৃত হইয়া পড়িল। শাসকবর্গ ও অভিজাত শ্রেণী এবং জনসাধারণ, ঘরে তুর্কীই ব্যবহার করুন বা পশ্‌তোই ব্যবহার করুন, সাহিত্যালোচনায় ও রাজকার্য্যে ফারসী ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ভারতে যখন মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের সংস্পর্শ ঘটিল, তখন প্রথম হইতেই যে সকল হিন্দু, রাজার জাতির সহিত মিশিত বা রাজার চাকরী লইত, তাহাদিগকে এই পোষাকী ভাষাই শিখিতে হইত।

খাঁটী আরব মুসলমান ভারতে অল্পই আসে। বাঙ্গালায় হাব্‌শী রাজারা কিছু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহাঁদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ আরবী বলিতেন, কিন্তু ভারতে মুসলমান-যুগে আরবী-ভাষী মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আরবী-ভাষী লোক বেশী না আসিলেও আরবীর অনেক শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দগুলি সরাসরি আরবী হইতে আসে নাই, এগুলি আসিয়াছে ফারসীর মধ্য দিয়া। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে যখন পারস্যদেশ মুসলমান আরবদের অধীন হইল, এবং পারস্যের লোকেরা যখন মুসলমান হইতে আরম্ভ করিল, আরবী লিপি গ্রহণ করিল, তখন হইতেই আর্য্যবংশ-সম্ভূত, সংস্কৃতের স্বস্থকুলজাত পারসীক বা ফারসী ভাষা, শেমীয় ভাষা আরবীর আওতায় পড়িল; ৭৫০ সালে যখন বগ্‌দাদে এক নবীন মুসলমান সভ্যতার উত্থান হইল, তখন পারস্যের মনীষা এই নবীন সভ্যতাকে অবলম্বন করিয়া আরবী ভাষার সেবা ও উন্নতিতে নিয়োজিত হইল। পারস্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্মের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পারসীক ভাষার জীবনী শক্তি অবলুপ্ত হইল; ফারসী নিজের পায়ে যেন দাঁড়াইতে না পারিয়া আরবীকে আশ্রয় করিল,—দর্শন, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান সম্পর্কীয় সমস্ত শব্দ নবপুষ্ট উন্নতিশীল আরবীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। উচ্চ ভাবের কথা ভিন্ন সাধারণ বহু শব্দও ফারসী অনাবশ্যকরূপে আরবী হইতে গ্রহণ করিয়া অঙ্গীভূত করিতে লাগিল। আরবী সাহিত্যের আদর্শে এক নূতন মুসলমানী ফারসী সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। ফারসী, আরবীর শব্দ ও ভাব সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসিল; এখন যেমন যে কোনও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় অবাধে চালাইতে পারা যায়, ফারসীতে তেমনি যে কোন আরবী কথা গ্রহণ করিতে পারা যায়। এমন কি, ফারসী আরবীর এতটা অনুকারী হইয়া পড়িয়াছে যে, আরবীর অনেক বাক্য-রচনা-রীতি, প্রত্যয় বিভক্তি ফারসী লইয়া বসিয়াছে। আধুনিক ফারসীতে শতকরা ৬০-এর উপর শব্দ আরবী; অতি সাধারণ ঘরোয়া কথা বলিতে গেলেও আরবীর শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন ফারসীর চলে না। ফলতঃ ইংরেজীর পক্ষে যেমন লাটিন, বাঙ্গালার পক্ষে যেমন সংস্কৃত, ফারসীর পক্ষে আরবী সেইরূপ হইয়াছে। এই জন্য ফারসী ভাষা যখন ভারতে আসিল,

তখন আরবীর অনেক শব্দই আসিয়া গেল। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আরবীর চর্চ্চা থাকিলেও, এই শব্দগুলি একেবারে আরবী হইতে ধার করা হয় নাই। স্পেনের লোকেরা আরবী-ভাষী মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়, বিজেতা আরবদের সংস্পর্শে আসিয়া স্পেনীয়েরা অনেক আরবী কথা গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় বিশেষ্য বিশেষণের সঙ্গে ال 'অল্' উপসর্গ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; স্পেনীয় ভাষায় যে সকল আরবী শব্দ পাওয়া যায়, আরবী-ভাষীর মুখ হইতে শুনিয়া গৃহীত বলিয়া সেগুলিতে এই উপসর্গ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফারসীতে যখন আরবী শব্দ আসে, তখন এই উপসর্গ ধরা হয় না। ফারসীর ভিতর দিয়া পাওয়া বলিয়া আমাদের হিন্দী ও বাঙ্গালায় যে আরবী শব্দ মিলে, তাহাতেও 'অল্' উপসর্গ নাই। যেমন স্পেনীয় alcayde, alcoran, alcorban, alcacer, Alhambra, atabal, Alcala, Alborge ইত্যাদি; এই আরবী পদগুলির ভারতীয় রূপ যথাক্রমে—কাজী (বাঙ্গালা) বা ক়াজ়ী (হিন্দুস্থানী), কোরান, কোর্বান্, ক়স্র্ (উর্দু), হমর্ (উর্দু), তবলা (বাঙ্গালা), কিল্লা বা ক়লহ্ (উর্দু), বুরুজ (বাঙ্গালা)।

বাঙ্গালায় ফারসী (ও আরবী) কথার বেশী করিয়া আমদানী আরম্ভ হয় মোগল আমল হইতে। মোগল আমলের পূর্ব্বে তুর্কী ও পাঠান শাসকদের সঙ্গে বাঙ্গালা-ভাষী সাধারণ হিন্দু প্রজার তেমন যোগ ছিল না। কারণ, মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অংশবিশেষ মাত্র মুসলমান-শাসনে ছিল। "খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমি কোন কালেই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। পশ্চিমোত্তর বঙ্গের রাজ-চ্ছত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারের চেষ্টায় পাঠান সামন্তবর্গ বারংবার বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। বঙ্গবিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলিজীর সময়ের শতাধিক বর্ষমধ্যেই বাঙ্গালার মুসলমান নরপতিগণ দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন; ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দুরাজবংশধর বিরাজ করিতে-ছিলেন। (তারিখ বারণী। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় স্বাধীন রাজা দনুজরায় বলবন্ বাদশাহের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে তোগলক্‌শাহের শাসনকালে সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রামে প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগের উল্লেখ দেখা যায়। মুসলমান ইতিহাসে সপ্তগ্রামের এই প্রথম উল্লেখ।) পরবর্ত্তী সময়েও কিছু কাল মুসলমানরাজের অধিকার ও প্রভাব স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাধীন পাঠানরাজবর্গ সমগ্র বঙ্গের একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি চিরদিনই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে; সেখানে ইস্‌লামের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিতেই সক্ষম হয় নাই। আভ্যন্তরীণ হিন্দু সামন্তগণও অনেক সময়ে মুসলমানকে উপেক্ষা করিয়া শাসনক্ষমতা অব্যাহত রাখিয়াছেন।" [কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস—অষ্টাদশ শতাব্দী, নবাবী আমল।] পাঠানেরা সমগ্র বঙ্গদেশ কোন কালে জয় করিতে পারে নাই। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তেয়ার-উদ্-দীন মুহম্মদ বখ্‌তেয়ার খিলজী নদীয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করেন,

কিন্তু প্রথম প্রথম কেবল গৌড়-লখনাবতীতেই মুসলমান-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা হয়। সুলতান গিয়াস্‌-দ্‌-দীন (১২১১-১২২৬) সম্ভবতঃ উত্তররাঢ় আক্রমণ করেন, এবং গৌড়ে মুসলমান-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; কথিত আছে, তিনি তীরহুত, কামরূপ ও বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গের) রাজাদিগকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। ইখ্‌তিয়ারু-দ্‌-দীন য়ুজ্‌বক্‌ ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ (আনুমানিক) নবদ্বীপ জয় করেন; রুক্‌নু-দ্‌-দীন কৈকাউস শাহের সেনানী উলুঘ্‌-ই-আজম্‌ জফর খাঁন বহ্‌রাম যিৎগীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণরাঢ়ের ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম জয় করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে শম্‌সু-দ্‌-দীন য়ুসুফ্‌ শাহের রাজ্যকালে পাণ্ডুয়া জয় করা হয়। [এই সমস্ত তথ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।] দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্গালা (মেদিনীপুর, যাজনগর বা উড়িষ্যা) বহুকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল; পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে (বীরভূম, বাঁকুড়া ও কোচবিহার প্রভৃতিতে) মুসলমান-ক্ষমতা কখনও সুদৃঢ়রূপে প্রসৃত হইতে পারে নাই। পাঠানদের শাসনকালে বাঙ্গালার 'ভুঁইয়া' রাজারাই প্রকৃত পক্ষে দেশের শাসক ছিলেন; ইঁহাদের 'জমিদার' নাম মোগল যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মোগল আমল হইতেই সুবেদারের শাসন সুদৃঢ় হইল, রাজধানী দিল্লী-আগরার সহিত সুবে বাঙ্গালার সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইল। রাজার জাতি, রাজার ভাষা ও রাজার আইন-কানুনের সহিত বাঙ্গালীর বিশেষ করিয়া পরিচয়ের সুযোগ ঘটিল।

রাজার জাতি এখন আর এক দল বিদেশী তুর্কী, পাঠান বা মোগলকে লইয়া নহে; তুর্কী, মোগল, পাঠান সকলেই ১৭শ শতকের মধ্যে হিন্দুস্থানী বনিয়া গিয়াছে। যে সকল নবাগত তুর্কী, মোগল, ঈরানী ও পাঠান এবং আরব এখন ভারতে আসিতেছে, তাহারাও ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। বিজেতৃবংশসম্ভূত বলিয়া তুর্কী, মোগল, পাঠান ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অভিজাত-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের মাতৃ-ভাষা এখন আর বিদেশী তুর্কী বা পশ্‌তো নহে; উত্তরভারতের ভাষা হিন্দুস্থানী ইহাদের মাতৃভাষা হইয়া গিয়াছে। মোগল আমল হইতে বহু মুসলমান ও রাজপুত এবং অন্য শ্রেণীর পশ্চিমা হিন্দু বাঙ্গালা দেশে রাজকার্য্য উপলক্ষে চাকরী লইয়া বাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল। এইরূপে দুইটি ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষার উপর পড়িবার অবকাশ ঘটিল; একটি মুসলমান শিক্ষিতবর্গের সাহিত্য-চর্চ্চার এবং রাজার দপ্তরের ভাষা—ফারসী; আর একটি বাঙ্গালার পশ্চিম হইতে আগত হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মাতৃভাষা—হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। মুসলমানদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের ও স্মৃতি-বিধি-নিয়মের ভাষা আরবী, উচ্চশিক্ষিত মুসলমান মোল্লা মৌলবীদের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল।

১২০৬ সালে দিল্লীতে মুসলমান-শাসনের প্রতিষ্ঠা। মুহম্মদ ঘোরী ও কুতুবু-দ্‌-দীনের ধর্ম্মান্ধ বর্ব্বরকল্প আফগান ও তুর্কী দল এই সময় হইতে ভারতে বসবাস আরম্ভ করে। ১৬০৫ সালে আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয়। এই ৪০০ বৎসরের মধ্যে "ভারতীয় মুসলমান" জাতি

ও সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর-ভারতে (মধ্যদেশে) উপনিবিষ্ট তুর্ক ও আফগান (ও পরে মোগল) এবং দেশী লোকেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া এক মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। দিল্লীর আশে-পাশে শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন যে সকল প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত ছিল ও আছে, এবং যেগুলিকে নবাগত মুসলমানগণ 'হিন্দী' বা হিন্দ্-দেশের ভাষা বলিত,—যেমন পূর্ব্বী-পঞ্জাবী, ব্রজভাখা, মেবাতী,—সেই উপভাষাগুলি মিলাইয়া এবং তাহাতে ফারসী (আরবী এবং তুর্কী) শব্দ প্রয়োজন-মত আনিয়া শাসক ও শাসিতবর্গের মধ্যে কথা-বার্ত্তার ভাষা হিসাবে একটি ভাষা দাঁড়াইয়া যাইতে থাকে। ইহার উদ্ভবকাল হইতে এই ভাষা হিন্দী বা হিন্দোস্তানী (অর্থাৎ ভারতের বা হিন্দুর দেশের) ভাষা বলিয়াই খ্যাত হয়; এবং দিল্লীর বাদশাহদের 'উর্দূ' বা ছাউনীর বাজারের ভাষা বলিয়া মোগল-যুগের শেষভাগে ইহাকে 'উর্দূ-এ-মু‹অল্লহ্' বা 'উর্দূ' নাম দেওয়া হইতে থাকে। পরে 'হিন্দোস্তানী' বা 'হিন্দী' আধুনিক কালে মুসলমান বা ফারসী-জানা হিন্দু লোকের হাতে পড়িয়া যখন খুব বেশী করিয়া আরবী ও ফারসী শব্দে পূরিত হয় ও ফারসী লিপিতে লিখিত হয়, তখন 'উর্দূ' নামেই পরিচিত হয়। 'হিন্দোস্তানী', 'হিন্দী' বা 'উর্দূ'র উদ্ভব ত্রয়োদশ শতকে; তুর্কী, পশ্‌তো ও ফার্সী-ভাষী মুসলমানগণ যখন স্বদেশের সহিত সংযোগ হারাইল, তখন এই 'হিন্দোস্তানী' ক্রমে তাহাদের মাতৃভাষা হইল। এখন হইতে প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে 'হিন্দোস্তানী'র পত্তন; কিন্তু এই সাত শত বৎসরের মধ্যে প্রথম ৫০০ বৎসর ইহাতে কোনও সাহিত্য রচিত হয় নাই। ইহা বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে Lingua Franca স্বরূপ ছিল, এবং সহজবোধ্য বলিয়া ক্রমে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারকারী হিন্দুদের মধ্যেও রাষ্ট্রভাষা ("খড়ী-বোলী") হিসাবে দাঁড়াইয়া যায়। তিন চার পুরুষেই ইহা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমানদের ঘরোয়া ভাষা হইয়া পড়িল। কিন্তু কিছু লিখিতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে ফারসী ব্যবহৃত হইত; এবং যদি কোনও মুসলমান, দেশীয় ভাষায় কিছু লিখিতে চাহিতেন, তখনই পাঁচটা উপভাষার মিশালে সৃষ্ট এই চলতি হিন্দোস্তানী বা হিন্দীতে না লিখিয়া উত্তর-ভারতের ব্রজভাখা বা অবধীর মত হিন্দুর সাহিত্যিক ভাষাগুলিই অবলম্বন করিতেন। আকবরের নামে ব্রজভাখার পদ পাওয়া যায়; মালিক মুহম্মদ জায়সী 'পদুমাবত' কাব্য অবধী ভাষায় লেখেন। এই হিন্দোস্তানী ভাষা এক দিকে তুর্কী বা ঈরানী জাত্যভিমানী মুসলমানদের লজ্জা ও অবজ্ঞার বিষয় ছিল; অন্য দিকে নবীন মিশ্রভাষা বলিয়া হিন্দুর কাছে সাহিত্য-রচনার জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলমানদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ভাব ও চিন্তাপ্রণালী এই ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই বিস্তৃতি লাভ করিল। যখন এই মিশ্রভাষা উত্তর-ভারতের অভিজাত মুসলমান-সমাজের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল, যখন ফারসী আয়াস করিয়া শিখিতে হইত এবং বিশুদ্ধ ব্রজভাখা বা অবধীতে মুসলমান-চিত্তের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব ছিল না, তখন ইহাতে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হইল। হৈদর-আবাদের দক্ষিণী মুসলমানদের মধ্যে এই নূতন হিন্দোস্তানী বা উর্দূ সাহিত্যের উদ্ভব।

প্রথম প্রথম হিন্দোস্তানী কবিতার ভাষাকে 'রেখ্‌তহ্‌' বা ফার্সী-'ছড়ান' হিন্দী বলা হইত। উর্দু ভাষার আদি-কবি ৱলী ('বাবা-ই-রেখ্‌তহ্‌' নামে প্রসিদ্ধ) সপ্তদশ শতকের লোক। হিন্দোস্তানী ভাষা মুসলমান-শাসনের ফল। ইহা সর্ব্বজনবোধ্য বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন প্রান্তের লোকেদের কথা-বার্ত্তার ভাষা হইয়াছে; ইহাকে হিন্দুরাও উত্তর-ভারতের সাধুভাষা standard language বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; ইহা 'খড়ী বোলী'; ব্রজভাষা, অৱধী, ভোজপুরিয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলির আর প্রভাব নাই—সেগুলি এখন 'পড়ী বলী'। ইহার প্রচার মুসলমান-ক্ষমতাকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু মুসলমান প্রভাবে পড়িয়া এমন সুন্দর একটি বস্তু অনাবশ্যকরূপে বহুল পরিমাণে আরবী ও ফারসী-মিশ্র হইয়া ভারতীয় হিন্দুর কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছিল। গত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক গিলক্রাইস্‌ট্‌ সাহেবের প্রযত্নে এই ভাষা যাহাতে হিন্দুরও আদরের ভাষা হয় সেই চেষ্টা হইতে থাকে; ইহাতে হিন্দুর উপযোগী প্রথম পুস্তক লল্লুজী-লালের 'প্রেমসাগর' রচিত হয়, এবং তখন হইতে সংস্কৃত শব্দ বিশেষ পরিমাণে ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে। গত শতাব্দে হিন্দোস্তানী দুই মূর্ত্তি ধরিয়া বসে—(১) ফারসী অক্ষরে লেখা আরবী-ফারসী-শব্দ-বহুল 'উর্দু'; (২) নাগরী অক্ষরে লেখা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল 'হিন্দী'। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; কিন্তু এই মূর্ত্তিতে ইহা বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, আসাম, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে উর্দুর প্রতিযোগী এক বিরাট সাহিত্যের ভাষা হইয়াছে। হিন্দোস্তানী বা খড়ী-বোলীর প্রাচীন রূপ এখন উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন প্রদেশের জন-সাধারণের মৌখিক আলাপের ভাষা Lingua Franca হইয়া প্রচলিত আছে; এই ভাষা না বেশী আরবী-ফারসী-মিশাল, না বেশী সংস্কৃত-মিশাল; ইহার ব্যাকরণ উর্দু ও হিন্দী অপেক্ষা সরল; বরং ইহা ব্যাকরণ মানিয়া চলে না; ইহাতে দেশীয় তদ্ভব কথার পরিমাণই অধিক, এবং পণ্ডিতী সংস্কৃত শব্দের চেয়ে আরবী-ফারসী শব্দেরই প্রাচুর্য্য। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা এই "বাজার-হিন্দী"কে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইবে; মৌলবীর আরবী-পূরা উর্দু বা পণ্ডিতের সংস্কৃত-ভরা হিন্দীকে অবলম্বন করিয়া নহে।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালা দেশ মোগলদের অধীন হয়। এই সময় হইতে হিন্দোস্তানী-ভাষী লোক পশ্চিম হইতে বেশী করিয়া বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইহাঁদের সহিত মিশিয়া এবং সুবেদারের ও পরে নবাবের দপ্তরে কাজ করিবার জন্য ফারসী পড়িয়া, শহরে দরবারে আদালতে গতায়াত করিয়া, মোল্লা, আলেম ও ধর্ম্মপ্রচারকদের প্রভাবে আসিয়া বাঙ্গালী অনেক নূতন ফারসী ও আরবী কথা শিখিল। নূতন নূতন ভাব ও বস্তুর আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আরবী ফারসী নাম বাঙ্গালায় আসিয়া গেল। এই সকল কথার অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় স্থায়িরূপে রহিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী আমলে বাঙ্গালীর জীবনে মুসলমানী প্রভাব যতটা আসিয়াছিল, এতটা আর কোনও কালে

নহে। এই যুগে লেখা বাঙ্গালা বই বা চিঠি-পত্র দেখিলেই এই কথা বুঝা যায়। মোগল-রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সকল বই লেখা হইয়াছিল, সেগুলি পাতার পর পাতা পড়িয়া গেলেও একটি ফারসী কথা মিলিবে না; সমগ্র 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' দুই তিনটির বেশী ফারসী শব্দ নাই; 'শূন্যপুরাণে'র সহিত সংযুক্ত নিরঞ্জনের রুষ্মায় মাত্র কতকগুলি মুসলমানী নাম পাওয়া যায়। মোগল-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট ফারসী শব্দ খুব বেশী হইবে না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের বাঙ্গালায় অনেক ফারসী শব্দ আসিয়া গিয়াছে। আবার মুসলমান ধর্ম্মের চরিত-উপাখ্যান লইয়া বাঙ্গালার মুসলমানদের জন্য সপ্তদশ শতক হইতে যে সকল বই আরবী-ফারসী-জানা আলেমদের দ্বারা লিখিত হইতে থাকে—যেমন জঙ্গনামা আমীর-হামজা প্রভৃতি বই—সেগুলির ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ এত বেশী যে, তাহাকে বাঙ্গালার উর্দূ বলা চলে। কিন্তু এই সকল বইয়ের আরবী ফারসী শব্দ এবং চলিত বাঙ্গালায় প্রাপ্ত আরবী ফারসী শব্দ একেবারে বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে।

এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইতেছে—আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর লইয়া; কিন্তু এই প্রকারে যে সকল আরবী ও ফারসী শব্দ ভোল ফিরাইয়া খাঁটী বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে লইয়া এখন আলোচনা করিব না। 'আরব, মোগল, আদালত, জমিদার, শেরেস্তা, খদ্দের (খঁদ্দার), মফস্বল, মজুর, ক্রোক, হেফাজৎ, জাহাজ, আক্কেল, হুঁকা, ফোয়ারা, আকছার, আতর' প্রভৃতি যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে, যেগুলির উচ্চারণ ও রূপ বদলাইয়া এমন একটি আকার আসিয়া গিয়াছে, যাহার 'সংস্কার' অসম্ভব, সেগুলির বানান সম্বন্ধে কোনও কথা তোলা ঠিক হইবে না। এই রকমের শব্দগুলিকে মূল ফারসী ও আরবী রূপ ধরিয়া ৎঅরব্ عرب, মুঘ্ল্ مغل, ৎঅদালৎ عدالت, জ়মীন্‌দার زمین‌دار, সর্‌রিশ্‌তহ্ سررشته, খরীদার, খরীদ্দার خریدار, মুফস্‌সল্ مفصّل, মজ়্দূর مزدور, কুর্ক্ قرق, হিফাজ়ৎ حفاظت, জহাজ় جهاز, ৎঅক্‌ল্ عقل, হুক্কৎ حقّة, ফর্‌রারাহ্ فوّاره, অক্‌ৎর্ اکثر, ৎইত্‌র্ عطر, লেখা চলিবে না। তবে এই শব্দগুলির মূল রূপ অনুসন্ধিৎসুর জন্য অভিধানে ও ভাষাতত্ত্বের বইয়ে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আমার বক্তব্য হইতেছে, ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে আরবী ও ফারসী নামের বানান লইয়া, এবং বাঙ্গালা অভিধান ইত্যাদিতে আরবী ফারসী শব্দের যথাযথ রূপটি বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা লইয়া। যথাযথ লিপ্যন্তর করার উপযোগিতা সম্বন্ধে বাহুল্য করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। অনেক আরবী ফারসী নাম অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মত বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল নাম বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মুখে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির (phonetics এর) অনুযায়ী রূপ

লইয়া থাকে। যতই 'বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি'তে সেই সকল নাম বাঙ্গালা অক্ষরে রূপান্তরিত হউক না কেন, তাহাতে আরবী ও ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী মুসলমান এবং হিন্দু জনসাধারণের জিভের আড় ভাঙ্গিবে না। মোল্লা এবং মৌলবীরা 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন' লইয়া যতই বাদানুবাদ করুন না কেন, বিশুদ্ধ আরবীর উচ্চারণ বাঙ্গালী জনসাধারণের মুখে অসম্ভব।* কিন্তু তাহা মানিয়া লইলেও, শিক্ষিত লোক যে সকল বই লেখেন, তাহাতে যথাযথ মূলানুসারী বানান যাহাতে লেখা হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে আরবী লিপি পাঠে অক্ষম বা অনভ্যস্ত মুসলমানদের জন্য কোরানের সুরা বা বচন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হয়। এইরূপ লিপ্যন্তরে প্রায়ই বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইবার জন্য কোনও চেষ্টা থাকে না। আরবী ও ফারসীতে এমন কতকগুলি ধ্বনি আছে, যেগুলি বাঙ্গালীর পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন নয়, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে তাহাদের জানাইতে পারা যায় না। ফুটকি বা অন্য কোন চিহ্ন লাগাইয়া না লইলে বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে তাহাদিগকে যথাযথ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। পশ্চিমের দেবনাগরী হরফের সেটের মত বাঙ্গালা হরফের সেটে বিন্দুযুক্ত হরফ পাওয়া যায় না; কিন্তু বিন্দুযুক্ত হরফ কতকগুলি না হইলে চলে না। যেখানে বিন্দুযুক্ত হরফ—যেমন খ় ফ় জ়—মিলে না, সেখানে হরফের পাশে ইংরেজী ফুল-স্টপ বসাইলে কাজ চলিবে; যেমন খ. ফ., জ.; কিম্বা 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে উপায় অবলম্বন করা হয়,—হ্রস্ব উকার (ু) যুক্ত অক্ষরে উ-কারের লেজটুক বাদ দেওয়া—সেই উপায়েও অতি সহজে যে কোনও ছাপাখানায় আবশ্যকমত হরফ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারা যাইবে; যেমন খু ফু ধু—খ় ফ় ধ়। ইহাতে ছাপাখানাওয়ালাকেও বিব্রত করা হইবে না, অথচ অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

---

* হিন্দু পাঠকবর্গের খুব সম্ভব জানা নাই যে, কিছু কাল হইল, এ দেশে মুসলমানদের মধ্যে নমাজ পড়িবার সময় আরবী শ্লোকগুলির উচ্চারণ কিরূপ করা উচিত, সেই বিষয়ে মতান্তর ও বিরোধ ঘটিয়াছিল। বিশেষ মতভেদ হয় আরবীর ض অক্ষর লইয়া; (এই অক্ষরের মূল উচ্চারণ আমাদের জিভে হওয়া অসম্ভব; ইহা একপ্রকার উষ্ম 'দ' [দ্ব়] কানে 'দ' বা 'দ্বা' (dw, দোয়া)র মত শুনায়—এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য)। কোরানের প্রথম অধ্যায় ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর মত মুসলমানদের নিকট নিত্যপাঠ্য অংশগুলির মধ্যে অন্যতম; এই অংশে ضالين শব্দটি আছে। এ দেশী উচ্চারণ অনুসারে ইহাকে 'জাল্লীন্' পড়া হয়; ض-এর উচ্চারণ ভারতে ও পারস্যে z (জ়)। কতকগুলি মৌলবী ফতোয়া দেন, যাহারা আরবী উচ্চারণের অনুরূপ 'দোয়াল্লীন্' না পড়িয়া হিন্দোস্তানী বা ঈরানী কায়দায় 'জাল্লীন' পড়ে, তাহাদের নমাজ বাতিল হইবে। এই 'দোয়াল্লীন' ও 'জাল্লীন'এর মীমাংসা সর্ব্বসম্মতিক্রমে হইয়া উঠে নাই। এই সম্বন্ধে ২৪ পরগণা টাকী নারায়ণপুরনিবাসী খাদেমল-ইস্লাম মোহাম্মদ রুহল কুদ্দুস কর্ত্তৃক সংগৃহীত "দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

একেবারে নিখুঁত লিপ্যন্তর-প্রণালী আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে ; এবং এই নিখুঁত প্রণালী সহজ-বোধ্যও হইবে না। বাঙ্গালা এবং আরবী ফারসী—এই দুই শ্রেণীর বর্ণমালা ও উচ্চারণ-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাঙ্গালা লিপ্যন্তরের বর্ণ ঠিক করা উচিত। এমন একটি প্রণালী উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, যাহার সাহায্যে অভিজ্ঞ পাঠক দেখিবা মাত্র মূল রূপটি ধরিতে পারেন, এবং অনভিজ্ঞ পাঠক একটু চেষ্টা করিলেই মূলের উচ্চারণ অনেকটা বজায় রাখিতে সক্ষম হন।

আরবী ও ফারসী কথার রোমান লিপ্যন্তর লইয়া ইউরোপের পণ্ডিতদের মধ্যে মতের মিল নাই। সংস্কৃত বর্ণমালার রোমান লিপ্যন্তর বিষয়ে ১৮৯৪ সালে জেনেভার সভায় ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিত একমত হন। আরবীর সম্বন্ধেও এই সভায় একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রচলনের চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা সর্ব্বগ্রাহ্য হয় নাই ; যদিও ইংলণ্ডের রয়াল-এশিয়াটিক্-সোসাইটী ও অন্য দুই একটি বিদ্বন্মণ্ডলী তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপের যে সকল পণ্ডিত সংস্কৃতের ধার ধারেন না, তাঁহারা এক প্রকারের লিপ্যন্তর চালাইতে চাহেন, আবার যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা এমন একটি পদ্ধতির পক্ষপাতী, যাহাতে সংস্কৃত-রোমান বর্ণমালার সহিত আরবী-রোমান বর্ণমালার গোল না বাধে। যেমন আরবীর ص ض ط বর্ণ ; প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে লিখিবেন ṣ ḍ ṭ ; কিন্তু সংস্কৃতের ষ ড ট কে ṣ ḍ ṭ রূপে লেখা হয়। দুই ভাষার সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর ধ্বনিকে একই হরফে লিখিলে লোকের মনে ধারণা হইতে পারে, বুঝি ص ض ط এবং ষ ড ট একই ধ্বনিবাচক। এইরূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ص ض ط কে s̲ z̲ বা d̲, এবং t̲ বা t̤ রূপে,—ṣ ḍ ṭ হইতে একটু স্বতন্ত্র উপায়ে লিখিবেন। আবার স্থানভেদে আরবী বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে ; মোরোক্কো, আল্‌জিরিয়া ও তুনিস্, ত্রিপোলী, মিসর, সিরিয়া, ইরাক্, মধ্য-আরব ও দক্ষিণ-আরবের উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় ; এবং তুর্কী, ঈরানী ও হিন্দুস্থানীদের (ভারতবাসীদের) মুখেও আরবী ধ্বনিগুলি বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। বানান ও উচ্চারণের মধ্যে যেখানে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, সেখানে বানান ধরিয়া লিপ্যন্তর করা উচিত, কি উচ্চারণ ধরিয়া, তাহা অবস্থা দেখিয়া বিচার করিতে হয়। যাহা হউক, বাঙ্গালার পক্ষে মোটামুটি কাজ-চালান গোছের একটা প্রণালী সকলে যদি অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট।

বাঙ্গালা অক্ষরে আরবী ও ফারসী নাম লেখার ব্যাপারে, আরবী ফারসী বর্ণগুলির এবং যে যে ধ্বনি তাহারা নির্দ্দেশ করে, আগে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। ফারসী ও তুর্কী বর্ণমালা আরবী বর্ণমালা হইতে পৃথক্ নয় ; কেবল তুর্কী ও ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে না থাকার দরুন তাহাদের জন্য নূতন কতকগুলি হরফ তৈয়ারী করা হইয়াছে। আরবীই যখন মূল, তখন আগে আরবীর হরফ ও ধ্বনি লইয়া আলোচনা করা যাক্।

আরবী (ও ফারসীর) উচ্চারণতত্ত্ব (Phonetics) আলোচনা করিবার জন্য আমি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের লেখা আরবী ব্যাকরণবিষয়ক যতগুলি বই পাইয়াছি, দেখিয়াছি। তদ্ভিন্ন দুই জন আরবী-ভাষীর সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়া প্রত্যেক বর্ণের ধ্বনি শুনিয়াছি। এই দুই জনেরই মাতৃভাষা আরবী; ইঁহারা কেহই হিন্দী বা ইংরেজী ভাল জানেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজন কলিকাতা-প্রবাসী বণিক্, ইঁহার বাড়ী মধ্য-আরবে নজ্‌দ্ প্রদেশে (নজদ্ আঁরবজাতির কেন্দ্র ও আদি-বাসভূমি)। তদ্ভিন্ন ইনি ইরাকের (মেসোপোটামিয়ার, সহিত সংশ্লিষ্ট, স্থানীয় আরবীর উচ্চারণও জানেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মিসরের অধিবাসী, কেরো নগরে ইঁহার বাড়ী; ইনি এখন কলিকাতা চিৎপুর রোডের নাখোদা মসজিদের ইমাম। ফারসী উচ্চারণ আলোচনা করিবার জন্য ঈরানী কাহারও সহিত আলাপ করিবার আবশ্যকতা ছিল না; তবে ঈরানী লোকের মুখে ফারসী আবৃত্তি ও ফারসীতে কথোপকথন শুনিয়াছি।

আরবী

আরবী ভাষা হিব্রু, সিরীয়, প্রাচীন-বাবিলনীয় ও হাব্‌শী ভাষার সহিত সম্পৃক্ত। এই ভাষাগুলিকে Semitic 'শেমীয়' ভাষা বলে। বাঙ্গালা, ওড়িয়া, ভোজপুরিয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, মরাঠীর সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ, শেমীয় ভাষাগুলির পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য তাহার চেয়েও ঘনিষ্ঠতর। শেমীয়-ভাষীদের এক শাখা ফিনিশীয়েরা খ্রীঃ পূঃ ৯০০র পূর্ব্বে মিসর দেশের চিত্রলিপির কতকগুলি চিত্র অবলম্বন করিয়া ধ্বনিদ্যোতক বর্ণমালার উদ্ভব করে। খ্রীঃ পূঃ ৮৯৪ সালে পালেস্তীনের অন্তর্গত মোআব জনপদের রাজা মেশা কর্তৃক উৎকীর্ণ লিপি এই শেমীয় বা ফিনিশীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। এক দিকে আরবী, অন্য দিকে গ্রীক, রোমান, রুষ প্রভৃতি, এবং অপর দিকে ভারতীয় ও ভারত-সম্পৃক্ত তাবৎ বর্ণমালা এই ফিনিশীয় বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শেমীয় ভাষাগুলির বিশেষত্বের উপর লক্ষ রাখিয়া এই বর্ণমালা গঠিত হয়। ইহাতে স্বরবর্ণের স্থান নাই, ইহার সমস্ত অক্ষরগুলিই ব্যঞ্জন-ধ্বনি-দ্যোতক। প্রাচীন শেমীয় ভাষায় তিনটি হ্রস্ব স্বর ছিল— a, i, u—আঁ, ই, উ; ইহাদের দীর্ঘ (ā ī ū আঁ ঈ ঊ) লইয়া মোট ছয়টি স্বরধ্বনি ছিল। শেমীয় বর্ণমালায় হ্রস্ব স্বর জানাইবার উপায় ছিল না, অর্থ অনুসারে এই হ্রস্ব ধ্বনি পড়িতে হইত। দীর্ঘ স্বরের মধ্যে y ও w দ্বারা 'ঈ' ও 'ঊ' জানান হইত, এবং দীর্ঘ আঁ, অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনিদ্যোতক আলেফ বা 'অলিফ' বর্ণের সাহায্যে প্রকাশিত হইত (a'=ā)। এই অব্যক্ত কণ্ঠ্য ধ্বনি, পরে স্বরবর্ণে আঁ ই উ'র সামিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব, দ, ক, ত, প্, দ'এর মত প্রাচীন শেমীয় ভাষায় অলিফ্ স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনরূপে স্বীকৃত; আরবীতে এই অব্যক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির নাম হম্‌জ়হ্। (ইহার সম্বন্ধে আরবীর অলিফ্ বর্ণ বিচারের কালে আলোচনা করা হইয়াছে)। সাধারণতঃ শেমীয় ভাষায় তিন ব্যঞ্জন (বা তিন

অক্ষর) জুড়িয়া এক একটি ধাতু ; এই তিন ব্যঞ্জনের সহিত নানা স্বরযোগে ইহাদের অর্থের বিভেদ প্রকাশিত হয়, এবং কতকগুলি উপসর্গ ও প্রত্যয় এই তিন অক্ষরে যুক্ত হয়। যেমন 'কৃত্‌ব্‌' (KTB كتب) এই তিন অক্ষরের ধাতু, ইহার অর্থ 'লেখা' ; 'কতব' (KaTaBa كَتَبَ)=সে লিখিয়াছিল, 'কিতাবু' (KiTa'Bu كِتَابُ)=যাহা লেখা হইয়াছে, বই ; 'কুতিব' (KuTiBa كُتِبَ)=লিখিত হইয়াছে ; 'মক্‌তুবু' (maKTuWBu مَكْتُوبُ)=যাহা লিখিত হইয়াছে ; 'কাতিবু' (Ka'TiBu كَاتِبُ) = যে লেখে, লেখক। ক্‌'ন্‌ * (K'N كان) ধাতু অস্তিত্ব জ্ঞাপক ; তাহা হইতে কান (Ka'aNa كَانَ) =সে ছিল ; কাইনু=(Ka'-'i-Nu كَائِنُ) = যে থাকে ইত্যাদি। হ্রস্ব বর্ণদ্যোতক চিহ্ন (যেমন আরবীর ´ ¸ ˉ এবং হিব্রুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু ও রেখা) আগে শেমীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল না ; আরবীর যে সকল প্রাচীনতম লেখা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহাদের রেওয়াজ নাই। স্বরবর্ণের রেওয়াজ না থাকিলে বিদেশী ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরবী বা অন্য কোনও ভাষা যথাযথ পড়িতে শেখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে. কিন্তু যাহারা ভাষা জানে, তাহাদের অভ্যাস থাকিলে ততটা গোল হয়না। যেমন বাঙ্গালীর কাছে 'হর দন তর গয়ল সন্ধ্যঅ হল পঅর কর অমঅরয়' বা 'নহ মঅতঅ নহ কন্যঅ নহ বধর সন্দরয় রৱপসয় হয় নন্দনবঅসনয় অরবশ' লিখিয়া দিলে, একটু জানা থাকিলে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে' বা 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি' পড়া মুস্কিল নহে। কিন্তু স্বরবর্ণ না দিলে নানা পাঠ ফের ঘটিবার পথ খোলা থাকে ; কৈথী অক্ষরের 'ববুঅজমরগয়বড়বহভজদ' (বাবু অজমীর্‌ গিয়া, বড়া বহী ভেজ্‌ দো)'-কে 'বাবূ আজ্‌ মর্‌ গিয়া, বড়ী বহু ভেজ্‌ দো' পড়ার মত নানা বিভ্রাট সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা পদে পদে। সেই জন্য, যখন হিব্রু ও আরবীতে বেশ বড় দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তখন স্বরধ্বনিগুলিকে সঠিক জানাইবার জন্য হিব্রুর vowel point ও আরবীর ফত্‌হহ্‌, কস্‌রহ্‌, দ্বম্মহ্‌, তন্‌বীন, সুকূন প্রভৃতি চিহ্নের উদ্ভব হইল। এইগুলি ভারতীয় বর্ণমালার মাত্রার মত ব্যবহারে আসিল। অর্থাৎ 'হর দন তর গয়ল' ইত্যাদিকে—

অ ই　ই ্　অ ্　অ ্ অ　অ　অ　অ অ　　অ অ　অ উ ্
'হ র　দ ন　ত র　গ য় ল　স ন্ধ্য অ　হ ল' বা 'ন হ　ব ধ র

উ অ ই　উ　অ ই ্　অ ্　উ ্ অ ই
স ন্দ র য়　র ৱ প স য়,　হ য়্‌　অ র ব শ' রূপে লেখার প্রণালী প্রচলিত হইল।

* অব্যক্ত ধ্বনি (ء হম্‌জহ্‌) মাথায়-বসা কমা ' চিহ্ন দ্বারা জানান হইতেছে।

এক্ষণে আরবীর হ্রস্ব স্বর ধ্বনিগুলিকে লইয়া আরম্ভ করা যাক্। পরে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির একে একে বিচার করা যাইবে।

আরবীর হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটী; হ্রস্ব আঁ (َ), হ্রস্ব ই (ِ) এবং হ্রস্ব উ (ُ)।

َـ এই চিহ্নের আরবী নাম 'ফৎহুহ্', এদেশে সাধারণতঃ ইহাকে 'জবর্' বলে। প্রাচীন আরবীতে ইহা হ্রস্ব আঁএর ধ্বনি জানাইত। এই হ্রস্ব আ, এবং প্রাচীন যুগের সংস্কৃতের হ্রস্ব আ অর্থাৎ বিবৃত অ-কারের উচ্চারণ একই। অর্থাৎ ইংরেজী artistic, ফরাসীর patte এর a, সাধারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে (প্রথম অক্ষরের উপর ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত) 'সীতা' শব্দের 'আ'কারের মত। আধুনিক আরবীতে সংস্কৃত 'অ'কারের মত আরবী ফৎহুহের সংবৃত ধ্বনি (ইংরেজী but, hut, herএ u ও e র মত) আসিয়া গিয়াছে; এবং বহু স্থলে َـ কে হ্রস্ব 'এ'কারবৎ উচ্চারণ করা হয়। রোমান লিপিতে এই ধ্বনি a বা e দিয়া লেখা হয়। বাঙ্গালায় 'অ'কার লিখিলে চলিবে; তাহাতে এই ধ্বনির ইতিহাসের সহিত সংস্কৃত অ-কারের ইতিহাসের সাদৃশ্য কতকটা রক্ষিত হইবে।

ِـ ইহা হ্রস্ব ইকারের ধ্বনি দ্যোতক চিহ্ন, ইহার আরবী নাম 'কস্রহ্'; এ দেশে 'জের' নামই বেশী প্রচলিত। রোমান লিপিতে ইহা i দ্বারা লিখিত হয়। বাঙ্গালায়ও 'ই' বা 'ি' লিখিতে হইবে। আধুনিক আরবীতে স্থানে স্থানে ইহার উচ্চারণ হ্রস্ব একারবৎ হইয়াছে। বাঙ্গালা কথায় অনেক সময়ে এই একার উচ্চারণ অনুসারে 'জের্'কে এ-কার লেখা হয়। কিন্তু প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ধরিয়া 'ই' লেখাই ভাল।

ُـ ধম্মহ্ বা জম্মহ্ (ضمّه) চিহ্ন, ফারসী ও ভারতীয় নাম 'পেশ্'। ইহা হ্রস্ব 'উ' কার দ্যোতক = রোমানের u; ইহাকে 'উ, ু' লেখাই ঠিক, আধুনিক হ্রস্ব 'ও'র উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া 'ও' লেখা ঠিক নহে।

َـ ِـ ও ُـ র পর যথাক্রমে ا , ي ও و অক্ষর থাকিলে 'আ' 'ঈ' 'ঊ' লেখা উচিত।

ًـ ٍـ ٌـ তন্‌বীন্ চিহ্নত্রয়ের জন্য 'অন্' 'ইন্' 'উন্' লেখা চলে।

ا = অলিফ্। কথা বলিতে আরম্ভ করিলে বা থামিয়া আবার বলিতে লাগিলে, যদি প্রথমেই ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ না আসে, এবং স্বরধ্বনি উচ্চারণের প্রযত্ন করা হয়, তাহা হইলে এই আদ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণের পূর্ব্বেই কণ্ঠস্থ বাগ্‌যন্ত্রের সাড়া পড়িয়া যায়, বাগ্‌যন্ত্র ঈষৎ মৃদুভাবে প্রশ্বাস দ্বারা আহত হয়, তাহাতে এক অস্পষ্ট অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি উদ্ভূত হয়। 'অলিফ্' অক্ষর' আরবী ও অন্যান্য শেমীয় ভাষাতে এই অব্যক্ত কণ্ঠ ব্যঞ্জন-ধ্বনি প্রকাশ করে। বাহ্য প্রযত্ন ঘটিলে এই ধ্বনি 'হ' বা অন্যান্য কণ্ঠধ্বনিতে সহজেই প্রকটিত হইয়া উঠে। আধুনিক আরবী লিপিতে এই অব্যক্ত কণ্ঠ্যধ্বনি বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য ء হম্‌জহ চিহ্নের প্রচলন আছে; যেমন أَ إِ أُ , آ إ أ ; ء হম্‌জহ্ চিহ্ন আরবীর বিশেষ রূপে নিজস্ব কণ্ঠ্যধ্বনি ع 'অয়ন্' অক্ষরের সংক্ষিপ্ত রূপ; 'অয়ন্ ع হইতে জাত

ʼ চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা হম্‌জ়হ্ বা ব্যঞ্জন বর্ণ অলিফের কণ্ঠ্য প্রকৃতি বিশেষ করিয়া জানান হয়। গ্রীকেরাও এই অব্যক্ত কণ্ঠ ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন; গ্রীক বৈয়াকরণদের মতাবলম্বনে লাটিন ব্যাকরণকারেরা এই অব্যক্ত ব্যঞ্জনকে spiritus lenis অর্থাৎ 'মৃদু বা অঘোষ প্রশ্বাস' বলিতেন,—এই 'মৃদু প্রশ্বাস' এতই মৃদু, এতই সংবৃত, এতই আভ্যন্তর প্রযত্নের ফল যে, কানে ইহাকে প্রায় ধরাই যায় না। একটু তীক্ষ্ণ ভাবে উচ্চারিত হইলে ইহা বিবৃত ঘোষ ধ্বনি 'হ' এ পরিণত হইয়া যায়। গ্রীক মতানুসারী লাটিন ব্যাকরণকারগণ 'হ' ধ্বনিকে spiritus asper অর্থাৎ 'ঘোষ প্রশ্বাস' বা 'মহাপ্রাণ' বলিতেন। এই অঘোষ কণ্ঠ্য উচ্চারণ বা ধ্বনি যে কেবল আরবীতে আছে, তাহা নহে; মালয় শ্রেণীর ও পাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের বহু ভাষায় ইহা মিলে, এবং ফরাসীর তথাকথিত 'মহাপ্রাণ হ' (h aspirate 'আশ্ আস্পিরাৎ')ও এই ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মৃদু হইতে মৃদুতর হ-ধ্বনি (ইহাকে এক প্রকার 'হ-শ্রুতি' বলা চলে) প্রাচীন আরবীতে। অলিফ্ অক্ষরের ও ʼ যুক্ত أ إ অলিফের ধ্বনি। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ আরবীতে ا কে স্বরবর্ণের বাহন স্থানীয় অক্ষর ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। أ إ آ কে সাধারণতঃ অ, ই উ উচ্চারণ করে, ইহা কণ্ঠ্য ধ্বনির দিকে লক্ষ রাখা হয় না। বাঙ্গালায় যদি অ আ'র পরে ই ঈ ইত্যাদি না লিখিয়া, অ 'আ অি অী (অিয়্) অু অূ (অূব্) অে অৈ অো অৌ' লেখা হইত, তাহা হইলে 'অ' এই অক্ষরকে স্বরবাহী ব্যঞ্জন বলা চলিত। অলিফ্ সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালায়, এবং কতকটা আধুনিক বাঙ্গালায়ও—'য়' অক্ষর এইরূপ স্বরবর্ণের বাহন মাত্র; 'য়মৃত য়াগি, য়িহার, য়ুত্তম, য়াখিয়া, হওয়া, য়েক' প্রভৃতি বানানে স্পষ্ট দেখা যায়।

এখন অলিফের বা হম্‌জ়হ্-যুক্ত অলিফের বা হম্‌জ়হের ব্যঞ্জন ধ্বনি বাঙ্গালায় কেমন করিয়া লেখা যায়? গ্রীকে কথার আদিতে spiritus lenisএর (=অলিফ্ বা হম্‌জ়হের) ধ্বনি থাকিলে, অর্থাৎ সাদা কথায়, গ্রীকে স্বরাদ্য শব্দে, আজকাল স্বরের মাথায় বা পাশে ['] চিহ্ন দিয়া, লেখা হয়; ঘোষ 'হ' ধ্বনি কথার আদিতে থাকিলে ['] লেখা হয়; সুপ্রাচীন গ্রীকের হ-ধ্বনি দ্যোতক H বর্ণকে দুই খণ্ডে কাটিয়া ˧ ও ⊢ রূপ হইতে যথাক্রমে আধুনিক গ্রীক লেখার ['] ও ['] চিহ্নদ্বয়ের উদ্ভব। যেমন—গ্রীক 'Apollon আপোল্লো,' Arrianos = আরিয়ান্, এবং 'Omeros - হোমর, 'Ellas = হেল্লাস, 'Erodotos=হেরোদোতস।

গ্রীকের ['] চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আধুনিক আরবী ও শেমীয় ভাষা-তত্ত্বের বইয়ে অলিফের (হম্‌জ়হের) এই অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি রোমান লিপ্যন্তরে ['] দিয়াই লেখা হয়; যেমন تأمّل ta'ammul ত'অম্মুল্; توأم তব'অম্, ملاك mal'akūn মল্'অকুন্। বাঙ্গালায়ও ['] চিহ্ন ব্যবহার করিলে চলিবে। কিন্তু সাধারণ আরবী যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তদনুসারে অলিফের অব্যক্ত ধ্বনি গ্রাহ্য না করিলেও

চলে ; কারণ, প্রাচীন আরবী ধরিয়া লিখিতে গেলে اكبر انور কে 'অক্‌বরুন্, 'অন্‌ররুন্ লিখিতে হয়। অলিফ্ বা হম্‌জ়হের ধ্বনি প্রাচীন আরবীতেও সব জায়গায় অটুট থাকিত না, ইহা সাধারণতঃ পূর্ব্ব হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ করিয়া দিত। যেমন رَأْسٌ ra-'-sun র'সুন্=رَاسٌ রাসুন্ ; قُرْآنٌ qur-'a'-nun কুর্-'অ'-নুন = قُرَانٌ কুর্-'আনুন্ (কোরান) ; ذَابٌ ধ্বি'ব্ — ذِئْب , ذِيب ধ্বীব্ ; سَأَلَ সু-'-ল্ سُئِلَ , سُول = সূল ; হম্‌জ়হ্ দীর্ঘ ধ্বনি আ এবং ঈ (ي) ও উ (و) তে পরিণত হয়। এই হেতু অলিফের স্বরমূর্ত্তি ধরিলেই চলিবে ; অর্থাৎ أ إ أ কে 'অ 'ই 'উ না লিখিয়া খালি অ ই উ লিখিলেই হইবে। কিন্তু যেখানে বিশেষ করিয়া হম্‌জ়হের ধ্বনি নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, সেখানে ['] চিহ্ন ব্যবহার করিলে ভাল হয় ; যেমন دَاؤُدُ দা'উদ, ماء মা' فائده ফা'ইদহ্ (অর্থাৎ ফাই-দহ্ নহে), علاء 'অলা', امْرُؤُالْقَيْس 'ইম্‌রু'উ-ল্-কয়্স্ ইত্যাদি।

কতকগুলি কথায় দীর্ঘতা জ্ঞাপক অলিফ্ লেখা হয়না, দীর্ঘ আ-কারের ধ্বনি খাড়া জ়বরের দ্বারা (।) জানান হয়। বাঙ্গালায় সে সকল কথায় আ লেখা উচিত ; যেমন اللّٰه অল্লাহ্ ('অল্লাহ) الرحمٰن অর্-রহ্‌মান্ ('অর্-রহ্‌মান্), ابرٰهيم ইব্‌রাহিম্, اسمٰعيل ইস্‌মা'ঈল্, اسحٰق ইস্‌হাক্, عثمٰن 'উথ্‌মান্ (ওস্‌মান্)

অলিফ্ মদ্দহ্, آ = বাঙ্গালা দীর্ঘ আ। আরবীতে ا বা ـا র্ উচ্চারণ স্থানে স্থানে এ-কারবৎ হয় ; তখন ইহাকে অলিফ্ ইমালহ্ বলে ; এবং ইহাকে এ-রূপে লেখা যায়— أَمِين এমিন, تاء তা' কিম্বা তে।

ى অলিফ্ মক্‌সূরহ্ = আ ; شمس الهدى শম্‌সু-ল্-হুদা, يحيى য়হ্‌য়া مولى মব্‌লা, মওলা বা মৌলা।

وصله রস্‌লহ চিহ্ন (ٱ)—পূর্ব্ব পদ স্বরান্ত হইলে সাধারণতঃ অলিফের উচ্চারণ হয় না। বাঙ্গালা অক্ষরে এই লুপ্ত অলিফকে [-] হাইফেন্ দিয়া জানান যাইতে পারে। شَمْسُ الدِّين শম্‌সু-দ-দীন্, বা শম্‌সু-দ্দীন্ ; শমস-উদ্-দীন নহে।

পুরাণ আরবীতে কর্ত্তৃকারকে উ (বা উন্), কর্ম্মকারকে অ (বা অন্), এবং সম্বন্ধ কারকে ই (বা ইন্) প্রত্যয় হইত ; যেমন—শম্‌সু, বা শম্‌সুন্—সূর্য্যঃ ; শম্‌স, বা শম্‌সন্ = সূর্য্যম্ ; শম্‌সি বা শম্‌সিন্ = সূর্য্যস্য। আরবীর বাক্য-পদ— যথা شَمْسُ الدِّين শম্‌সু + অদ্-দীনি = সূর্য্যঃ তদ্ধর্ম্মস্য ; عَبْدُ اللّٰه 'অব্‌দু + অল্-লাহি (= দাসঃ তদ্দেবস্য) ; نُورُ الدِّين অন্‌রুরু + অদ্-দীনি (= জ্যোতিঃ তদ্ধর্ম্মস্য) ইত্যাদি।

স্বরবর্ণ 'উ'-কারান্ত পদের পরে থাকার দরুন 'অল্' ও 'অদ্' এর অলিফ্ লুপ্ত হয়. (এই লোপ বস্লহ্ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়) ; ‘অব্দু + অল্-লাহি = ‘অব্দু-ল্লাহি, অন্‌রুরু + অদ্-দীনি = অন্‌রুরু-দ্দীনি ; পরে পদান্তস্থ ই-কারের লোপে—‘অব্দুল্লাহ্, অন্‌রুদ্দীন্।

আধুনিক আরবীতে কর্তৃ-কর্ম্ম-সম্বন্ধ এই তিন বিভক্তিরই উপসর্গ (উ অ ই) লোপ পাইয়াছে। এক 'শম্স্' পদ দিয়া 'শম্সু, শম্স, শম্সি' তিনের কাজ চালাইতে হয়। প্রাচীন আরবীর কর্তৃপদ 'শম্সু-(অ)দ্-দীনি', আধুনিক আরবীতে কেবল 'শম্স্ অদ্-দীন্' ; 'অল্' উপসর্গের পূর্ব্ব পদ এখন ব্যঞ্জনান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই সন্ধি দ্বারা 'অল্' বা 'অদ্' এর অ-কার লোপের আবশ্যক নাই। প্রাচীন আরবীর عبدالله ‘অব্দু-(অ)ল্-লাহি, আধুনিক আরবীতে عبدالله ‘অব্দ্-অল্লাহ্, তদ্রূপ ‘অব্দ্-অর্-রহ্মান্ ইত্যাদি। এইপ্রকার মুসলমানী নাম ভারতবর্ষে সাধারণত পুরাণ আরবীর 'উ'-কারান্তরূপ অবলম্বন করিয়াই লেখা হয়। তবে আধুনিক আরবী ধরিয়া লেখাও চলে। কিন্তু 'অল্' (ও অলের রূপভেদ 'অদ্', 'অর্' 'অৎ' 'অন্' প্রভৃতিতে), পূর্ব্বপদের কর্তৃজ্ঞাপক উ-বিভক্তি যোগ করিয়া 'উল্, উদ্, উর্' প্রভৃতি লেখা ভুল। নীচে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

	বাঙ্গালা বিশুদ্ধ বানান		অশুদ্ধ বানান
	প্রাচীন আরবী অনুসারে	আধুনিক আরবী অনুসারে	
تاج الدين	তাজু-দ্-দীনি, তাজু-দ্দীন্ [Tāju-d-Din(i)] ;	তাজ্ অদ্দীন্ [Taj ad-Din] ;	তাজ উদ্দীন [Taj Ud-din]
نورالحق	নূরু-ল্-হক্ক্ [Nūru-l-Haqq(i)] ;	নূর্ অল্-হক্ক্ [Nūr al-Haqq] ;	নুর উলহাক্ [Nūr Ulhuque]
سراج الاسلام	সিরাজু-ল্-ইস্লাম্ [Sirāju-l-Islām (i)]	সিরাজ্ অল্-ইস্লাম [Siraj al-Islam]	সিরাজ উলিস্লাম্ [Siraj ul-Islam]
مظهرالحق	মজ্হরু-ল্-হক্ক্ [Mazharu-l-Haqq]	মজ্হর অল্-হক্ক্ [Mazhar al-Haqq]	মজহরোল্ হাক্ [Mazharul Haque]

অলিফের ও ফৎহহের উচ্চারণ আজকাল আরবী ও তুর্কী-ভাষীদের মুখে হ্রস্ব এ-কারের মত শুনায় ; সেই জন্য এই উচ্চারণ শুনিয়া লেখা রোমান বানানে অলিফের ও ফৎহহের স্থলে e পাই ; যেমন انور অন্‌বর Anwar = Enver, شوكت শব্কৎ Shawkat = Chefket বা Shevket, جوهر জব্হর্ Jawhar = Djevher, فضل ফদ্ল্ বা ফজ্‌ল্ Fadl, Fazl = Fedhl ইত্যাদি।

আধুনিক আরবীতে خ ر ص ض ط ظ غ ق আগে বা পরে থাকিলে ফৎহহ,

ফৎহুহ্-অলিফ্ ا- যথাক্রমে বাঙ্গালার হ্রস্ব ও দীর্ঘ অ-কারের (=ইংরেজীর aw র) মত উচ্চারিত হয়। এই হেতু بغداد رمضان প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় 'বোগদাদ' 'রোমজান'-রূপে অনেক সময়ে লেখা হয়। আরবীর ص স়াদ্ ض দ়াদ্, ط ত়া, ظ থ়া বা জ়া অক্ষরের নাম এই জন্য সোদ্ বা সোআদ, জোআদ, তোয়, জোয়্ রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিতে এই উচ্চারণ-বিশেষত্ব না ধরিলেও চলিবে।

ب=বা' (বে)।—বাঙ্গালা ব ; ابن বা بن ইব্ন্; বিন্; بدر বদ্‌র্, عبد ‘অব্দ্, جبّار জব্বার, محبوب মহ্‌বূব্। রোমান b.

ت=তা' (তে)। আমাদের বাঙ্গালা দন্ত্য ত। রোমানের t. ইহা কোথাও কোথাও দন্তমূল হইতে উচ্চারিত হয়। 'ত' লিখিলেই চলিবে। تارخ তারিখ়, تهور তহব্বুর, فتّاح ফত্তাহ্, كراست করামৎ।

ث=থ়া' (থে়)। আরবীর এই ধ্বনিটি ভারতীয় কোনও ভাষায় নাই। ইহা ইংরেজী think, thought, loveth কথার দন্ত্য-স-ঘেঁষা উষ্ম th—আমাদের মহাপ্রাণ থ (ত+হ, ত্‌হ) নহে। খাঁটী বদুইন্ আরবদের মধ্যে, মধ্য ও দক্ষিণ আরবে এই বিশুদ্ধ থ় উচ্চারণ বজায় আছে ; মিসরের লোকেরা কিন্তু ইহাকে 'ত' রূপে উচ্চারণ করে, তুনিসের আরবী-ভাষীদের মুখে ইহা ts বা পূর্ব্ববঙ্গের চ় (ৎস্)এর ধ্বনি লইয়াছে, এবং সিরিয়ার স্থানে স্থানে ইহা দন্ত্য-স (s)-বৎ ধ্বনিত হয়। তুর্কী, ঈরানী ও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই ধ্বনি দন্ত্য-স-য়ে পরিণত হয়। এই ধ্বনি আধুনিক গ্রীকে ও স্পেনীশে মিলে। রোমান বানানে ইহাকে নানা রূপে লেখা হয়। th, th, t, t, θ (এটী গ্রীক অক্ষর), þ (এটী অ্যাঙ্গ্‌লো-স্যাক্‌শন অক্ষর); এই সবগুলি ইহার থ় ধ্বনির পরিচায়ক। তুর্কী, ফারসী ও ভারতীয় উচ্চারণ অনুসারে আবার ث কে s, s, s ṡ লেখে। ثএর বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ জানাইতে বাঙ্গালায় থ় (থ.) লেখা চলিতে পারে ; ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলে, খালি 'স' লিখিলেই চলিবে ; তবে যাঁহারা খুঁটীনাটীর পক্ষপাতী, এবং এই 'স'কে س ও ص এর 'স' হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইতে চাহেন, তাঁহারা স́ সঁ স. স়্ বা স.. লিখিতে পারেন। কিন্তু _ ́ . দেওয়া হরফ তৈয়ারী করিয়া না লইলে পাওয়া যাইবে না, এবং লেখায় বা ছাপায় স..বড়ই বিশ্রী দেখাইবে। সঁ লিখিলে মন্দ হয় না। ثاني থ়ানী (সঁানী বা সানী), ثناء থ়না' (সঁনা', সনা), حديث হ়দীথ় (হ়দীসঁ, হদীস্), ثالث থ়ালিথ় (সঁালিসঁ, সালিস্), نثار নিথ়ার, (নিসঁার, নিসার), غياث ঘ়িয়াথ় (ঘ়িয়াসঁ, ঘ়িয়াস্)।

ج=গীম্, জীম্। এই অক্ষরের প্রাচীন আরবী উচ্চারণ ছিল 'গ'; جعفر جمع سراج جلجل প্রভৃতির প্রাচীন উচ্চারণ গৎফর্, গম্‌ৎঅ, সিরাগ, গুল্‌গুল্। আরব পণ্ডিতেরা যখন

প্রাচীন কালে বিদেশী কথা আরবী অক্ষরে লিখিতেন, দেখা যায় যে, বিদেশী 'গ' ধ্বনি জানাইবার জন্য বহু স্থলে তাঁহারা ج অক্ষর লিখিয়া গিয়াছেন: যেমন গ্রীকের Galenos (গালেনোস্), আরবীতে جالينوس ; (eu)angellos (এবাঙ্গেল্লোস্), انجيل ; Georgios (গেওর্গিওস্) جرجس ; theologia (থেওলোগিআ) ثولوجيا ; geographia (গেওগ্রাফিআ) جغرفيا ; eisagogia (এইসাগোগিআ) ايساغوجي ইত্যাদি; ফারসীর گرگان—আরবীতে جرجان ; گرزگان—আরবী جوزجان ; আবার সংস্কৃত 'নারিকেল'—আরবীতে نارجيل (তামাক খাইবার নল, হুঁকা)। হিব্রুতে যেখানে 'গিমেল্' (=গ) অক্ষরের প্রয়োগ, আরবীতে সেখানে ج পাই—Gabriel ও جبرائيل ; Goliath ও جالوت ; Gog Magog ও ياجوج مجوج ইত্যাদি। আরবীর ج গ্রীকে 'গাম্মা' (= গ) অক্ষর দিয়া লেখা হইত— আরবী বংশ বা গোষ্ঠী جُرْهُم— গ্রীক ঐতিহাসিকের গ্রন্থে Gorama; আরবীর ج কে পুরাণ স্পেনীশে ch, j এবং g রূপে পাওয়া যায়, এই ch, j ও g র উচ্চারণ কণ্ঠ্য খ ছিল; جبل Gebel (উচ্চারণ 'জেবেল' নহে, খেবেল্) الخنجر alfange, الجوهر aljofar, الج elche (=এল্খে), جلاب julepe. আরবীর جوهر শব্দ উচ্চারণ ধরিয়া লেখায় ফারসীতে گوهر রূপ ধরিয়াছে।

তা ছাড়া, শেমীয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ج বর্ণের প্রাচীন ধ্বনি 'গ' ছিল। 'ক্বারী' বা কোরান পাঠকগণ আরবীর প্রাচীন উচ্চারণ বজায় রাখিতে যত্নশীল থাকেন; ইহাঁরা কিন্তু ج কে 'জ' উচ্চারণ করেন। কিন্তু বস্রহ্ নগরের বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও অভিধানকার খলীল্-ইব্ন্-অহ্মদ্-অল্‌ওমানী (যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন, ও 'কিতাবু-ল্‌অয়্ন্' অভিধান লিখেন) ج কে ق (জিহ্বামূলীয় ক) এর শ্রেণীর বর্ণ বলিয়াছেন।

গ-উচ্চারণ এখনও উত্তর মিসর এবং মধ্য ও দক্ষিণ-আরবের বহু স্থানে অটুট আছে। কিন্তু 'জ'-ই ইহার সাধারণ ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পারস্যের লোকেরা যখন খ্রীষ্টীয় সাত আট শতকে আরবী লিপি গ্রহণ করে, তখন ইরাক্ প্রদেশে (উত্তর আরবে) স্থানে স্থানে ج অক্ষর বা ধ্বনি 'জ'য়ে পরিণত হইয়াছিল; কারণ, ফারসীতে সর্ব্বত্রই ج এর উচ্চারণ 'জ'। সিরিয়ার লোকেরা ج কে জ, এবং বহু স্থলে ঝ (zh) উচ্চারণ করে; মক্কা প্রদেশেও 'জ', মোরোক্কোতে 'জ', এবং আরব দেশের বহু স্থলে জ-কার-ঘেঁষা 'গ্য' বা 'দ্য' এর মত ধ্বনিই শুনা যায়; আবার ইরাক্বে (বস্রহ্ অঞ্চলে) এখন 'য়' এর মত ধ্বনিও শুনা যায়। দেখা যাইতেছে, কণ্ঠ্য বর্ণ 'গ', তালব্য স্থানে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ করিলে পর আধুনিক আরবীতে ইহার 'গ্য' 'দ্য' 'জ', 'জ়', 'ঝ' (zh), 'য়', এমন কি, কুত্রাপি 'শ' ইত্যাদি নানা উচ্চারণের উদ্ভব হইয়াছে। হজরৎ মুহম্মদের সময়ে, ক্বুরয়্শ্-গোত্রীয়

আরবদের মধ্যে সম্ভবতঃ ج এর ধ্বনি 'গ্য' বা 'দ্য' (এক প্রকার 'জ'-ঘেঁষা ধ্বনি) রূপে প্রচলিত ছিল; আধুনিক কালের ক্বারী-গণের মুখে এই উচ্চারণ রক্ষার প্রচেষ্টা বিশুদ্ধ 'জ' ধ্বনি আনিয়া ফেলিয়াছে।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, আরবীর বহু ভাখায়, এবং তুর্কী ফারসী পশ্‌তো ও উর্দুতে ج অক্ষর জ-ধ্বনি প্রকাশক ; অতএব বাঙ্গালায় ج র জন্য 'জ' লেখাই উচিত। তবে যাঁহারা প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ ধরিয়া লিখিতে চান, তাঁহারা 'গ' লিখিতে পারেন। ইউরোপে ج কে সাধারণতঃ j, dj, dsj, d̲j̲ রূপে লেখা হয়; কেহ কেহ বা g, কিম্বা ǵ, অথবা ğ লেখেন; এই শিখাযুক্ত ǵ, ğ লেখায় ইহার প্রাচীন কণ্ঠ্য উচ্চারণ কতকটা জানান হয়। জর্ম্মান লেখকেরা অনেকে জর্ম্মান বানান অনুসারে ج কে dsch (= জ) রূপে লেখেন, আবার কেহ বা স্লাভ ভাষার রীতি ধরিয়া dž (=dzh,জ) লেখেন। ج এর উদাহরণ—جلال জলাল (গলালুন্, প্রাচীন আরবীতে), جدّہ জদ্দহ্, جهاد জিহাদ (গিহাদুন্), جمال জমাল, مسجد মস্‌জিদ্, نجد নজ্‌দ্ (নগ্‌দুন্), نجم নজ্‌ম্, مجيد মজীদ্, هجري হিজ্‌রী حجّاج হুজ্জাজ ইত্যাদি।

ح = হা' (হে)। ইহা আমাদের হকারের চেয়ে 'ভারী' ধ্বনি—পূর্ব্ব-বঙ্গে স্থানে স্থানে 'টাকা' 'মোকর্দ্দমা' 'হাকিম' 'দেখ' 'জখম' 'রাখাল' প্রভৃতি শব্দের 'ক' বা 'খ' এর যে গুরু হ-বৎ উচ্চারণ শুনা যায়, ইহার ধ্বনি কতকটা সেইরূপ। ইহার আওয়াজ এতই গুরু যে, যেন বুকের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে বোধ হয়। আরবীর ه অক্ষর সাধারণ-'হ'-দ্যোতক, ইহাকে 'হ' লেখা উচিত। কিন্তু ح র বিশেষত্ব বাঙ্গালায় বিন্দুযুক্ত (হ়) লিখিলে এক রকম জানাইতে পারা যায়। ح র উচ্চারণ এতই গুরু যে, স্পেনের ও পোর্টুগালের লোকেরা ইহার উচ্চারণের চেষ্টা করিতে গিয়া ইহাকে f-তে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে; আরবী حتّى, حرّ পোর্তুগীসে fata, forro ; البحيرة = albufeira, محمّد mafomet, المحلّة = almofalla. পারস্যে ও ভারতবর্ষে ح এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা হয় না, সাধারণ 'হ'-এর মতই করা হয়। রোমান লিপিতে ইহাকে h̲ বা ḥ রূপে লেখা হয়।

উদাহরণ—حميد হ়মীদ, احمد অহ়্‌মদ্, محمود মহ়্‌মূদ্, فتح ফৎহ়্, حكيم হ়কীম, رحمت রহ়্মৎ, صبح সুব্‌হ়্, ريحان রয়্‌হ়ান্ ইত্যাদি।

ح কে আলাদা করিয়া লেখা উচিত ; সুব্‌হ়ান্ (শোভান, সুভান) নহে।

خ = খ়া' (খ়ে)। গলার ভিতর হইতে এই ধ্বনি বাহির হয়, ইহা আমাদের মহাপ্রাণ ক্‌হ (ক্+হ) = খ নহে, জর্ম্মানের ও স্কচের ch এর মত এই خ খ় উষ্ম ধ্বনি। পূর্ব্ব-বঙ্গের স্থানে স্থানে এই ধ্বনি বাঙ্গালা কথায় ক এবং খ এর বিকারে পাওয়া যায়—সিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালী এবং চাটিগাঁয় ক ও খ'র এই খ় উচ্চারণ খুবই সাধারণ। কিছু কাল পূর্ব্বে একখানি বাঙ্গালা পত্রিকায় দু ছত্র ফারসী কবিতায় এই ধ্বনি 'খ্‌হ' রূপে লিখিত

দেখিয়াছিলাম। কিন্তু খ্ লেখাই ভাল। خ বর্ণের রোমান রূপ kh, kh, h, বা h ; কখনও x বা গ্রীক χ অক্ষর দিয়া লেখা হয় ; এবং জর্মান পণ্ডিতেরা বহু স্থলে ch লেখেন। خليل খলীল, اخلاق অখ্‌লাক্, اختيار ইখ্‌তয়ার, سيرالمتاخرين, সয়রু-ল্-মুত'অখ্‌খ্‌রীন্, زمخشري জমখ্‌শরী, خوارزم খ্‌ৱারিজ্‌ম্, خيّام খয়্যাম ইত্যাদি।

د = দাল। বাঙ্গালা দ—জিভের আগা দিয়া উপরের পাটীর দাঁতের উপর আঘাত করিয়া উচ্চারণ করা হয়। যথা—دانيال দানিয়াল, داؤد দা'উদ্, دين দীন, دبير দবীর, صادق স়াদিক্, احد অহদ্, هدايت হিদায়ৎ ইত্যাদি।

ذ = ধ্বাল। অর্থাৎ ইংরেজী this, that, them এর th ; ইহা আমাদের দ বা মহাপ্রাণ ধ নহে ; ইহা কতকটা ধ ও জ় (z) মিলাইয়া সৃষ্ট ধ্বনি—উপরের পাটীর দাঁত দিয়া জিভ চাপিয়া ইহাকে উচ্চারণ করিতে হয় ; ইহা অঘোষ ث থ় এর ঘোষ রূপ। ذ এর ধ্বনি প্রাচীন ফারসীতে ছিল ; আধুনিক গ্রীক ও স্পেনীশেও এই ধ্বনি মিলে। খাঁটী আরবী উচ্চারণ অনুসারে লিখিতে গেলে ذ কে ধ্ব (বা ধ়) লেখা উচিত। সিরিয়া দেশের আরবীতে কিন্তু ذ কে জ় উচ্চারণ করে ; এবং মিসরে د ذ দুইয়েরই উচ্চারণ দ। তুর্কী ফারসী ও হিন্দুস্থানীতে ذ = জ়; ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ জানাইতে হইলে জ় (জ়্) লেখা চলে ; কিন্তু ذ ز ض ظ, আরবীর ভিন্ন ধ্বনি দ্যোতক এই চারি অক্ষরের পারস্যে ও এ দেশে এক উচ্চারণ (z) দাঁড়ানর দরুন, খালি জ় দ্বারা এই চারি বর্ণকে লিখিলে মূল অক্ষরের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইবে না। ফারসীর ধ্বনি আলোচনা কালে এ বিষয়ে বিচার করা যাইবে। রোমান-লিপ্যন্তর-পদ্ধতিগুলিতে ذ র অনুরূপ বর্ণ dh, dh, d, đ (অ্যাঙ্গ্লোস্যাকশনের), বা গ্রীকের দেল্‌তা অক্ষর ; জ় ধ্বনি অনুসারে z, z বা ż এর প্রয়োগ মিলে। ذوالفقار ধ্বু-ল্-ফিক়ার (জ়ু-ল্-ফিক়ার, জু-ল-ফিকার) ; بذل الرحيم বধ্ব লু-র-রহ়ীম্ (বজ়্লু-র-রহীম), ذكر ধ্বিক্‌র্, ذوالقعده ধ্বু-ল-ক়অ্‌দহ্।

ر = রা' (রে)। আমাদের দন্ত্য 'র' ; رحم রহ়্ম, عرب 'অরব, بشير বশীর্, عبدالرّب 'অব্দু-র্-রব্ব্। রোমান r.

ز = জ়া' (জ়ে)। সাধারণ দন্ত্য z = জ় ; زين الدين জ়য়নু-দ্-দীন, عزيز 'অজ়ীজ়, رزّاق রজ়্‌জ়াক্। রোমান z.

س = সীন। সংস্কৃতের দন্ত্য-স, বাঙ্গালা 'শ্রী, স্নেহ, স্থান' প্রভৃতি কথার 'স' ধ্বনি, ইংরেজী hissing s বা ss : বাঙ্গালায় 'স' দিয়া লেখাই উচিত : سراج সিরাজ্। سبحان সুব্‌হ়ান্, يوسف য়ূসুফ়, حسن হ়সন, سيّد সয়্যিদ, راس রাস্ ইত্যাদি। রোমান্ s.

ش = শীন। ইংরেজীর sh, ফ্রেঞ্চের ch, জর্ম্মানের sch : সংস্কৃতের ও বাঙ্গালার শ; তবে আরবী (ও ফারসীর) ش বাঙ্গালার 'শ' এর মত মৃদুভাবে উচ্চারিত হয় না, বেশ জোর দিয়া, কতকটা সংস্কৃতে মূর্দ্ধণ্য-ষ এর মত (যেন শ্‌শ্‌) উচ্চারিত হয়। রোমান বানানে sh (ইংরেজীর), sch (জর্ম্মানের), ch (ফরাসীর) এবং š—এই কয় উপায়ে এই ধ্বনি জানান হয়। شیخ শয়্খ্‌, শেখ্‌. شرق শর্‌ক্‌, اشرف অশ্‌রফ্‌, شمشیر শম্‌শীর্‌, شہامت শহামৎ, شہید শহীদ্‌ ইত্যাদি।

ص=স়াদ (সোআদ)। এই ধ্বনি আমাদের দন্ত্য-স নহে, ওষ্ঠদ্বয় প্রলম্বিত করিয়া এই ধ্বনি বাহির করিতে হয়। অধরোষ্ঠ বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারণ করা হেতু ইহাতে একটু ঈষদ্ব্যক্ত ওষ্ঠ্য উ বা ও ধ্বনির দ্যোতনা আসিয়া পড়ে। এই জন্য ইহার আরবী নাম স়াদ সাধারণত স্বআদ বা সোআদ রূপে পঠিত হয়। কেহ কেহ এই ধ্বনিতে আবার ত (t)-এর অস্তিত্ব দেখেন; তাঁহাদের মতে ইহার বিশুদ্ধ ধ্বনি ts (আমাদের পূর্ব্ব বঙ্গের চ়)-এর মত; এই অক্ষরের অনুরূপ হিব্রুর অক্ষরের নাম tsade বা tzade=ts, tz. প্রাচীন ভারতীয় ও ঈরানীয় নামের চ-ধ্বনি, আরবীতে এই অক্ষর দিয়া লেখা হইয়াছে দেখা যায়; চীন چین =صین, চরক=صنق স়নক়, চন্দ্রগুপ্ত=صندر قوبت স়ন্দর্‌ ক়ুব্‌ৎ। সে যাহা হউক, বাঙ্গালায় ইহাকে (স়) লিখিলে বেশ চলিতে পারে। উত্তর আফ্‌রিকায় ও পারস্য প্রভৃতি দেশে ইহার ধ্বনি দন্ত্য স (s) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রোমান লিপিতে ইহার জন্য ṣ, ç বা s̱ লেখে। صبیر স়বীর, صدّیق স়িদ্দীক়, صفدر স়ফ়্‌দর্‌, اصغر অস়্‌ঘর্‌, صمد স়মদ্‌, مخلص মুখ্‌লিস়্‌, ناصر নাসি়র।

ض = দ়াদ (দ়োআদ)। ইহার উচ্চারণ আরবীভাষী ছাড়া অপর লোকের মুখ দিয়া বাহির হওয়া কঠিন। এমন কি, আরব দেশেও ইহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ বিরল; লোকে ظ অক্ষরের সহিত ইহাকে গোলমাল করিয়া ফেলে। খলীফ়হ্‌ ওমর নাকি বলিয়াছিলেন যে, তিনিও ইহার ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না। ذ জ়াল অর্থাৎ জ়-উচ্চারণ করিবার সময় উপরের পাটীর দাঁত দিয়া জিভ চাপিতে হয়, কিন্তু ض এর বেলায় জিভকে বিস্তৃত করিয়া তদ্দ্বারা উপরের দন্তমূলে আঘাত করিয়া দ-মিশ্র উষ্ম জ়-এর উচ্চারণের চেষ্টা করিতে হয়। ইংরেজী breadth কথার dth কে যদি একই অবিভক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিরূপে উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে নাকি ض এর বিশুদ্ধ আরবী ধ্বনি বাহির হইবে। এই ধ্বনি ذ ধ় এর নিকট সম্পৃক্ত ধ্বনি; ইহা সহজেই দ, ধ়, দ্‌জ়্‌ (dz) বা জ় (z) এ পরিণত হয়। মিসরে প্রাচীন দ় বজায় আছে, কিন্তু অন্যত্র এই অক্ষর কোথাও দ, কোথাও বা ধ়, এবং বহু স্থলে জ় রূপেই উচ্চারিত হয়। দক্ষিণ-আরবে আবার ইহার এক প্রকার কণ্ঠ্য বা মূর্দ্ধণ্য ল-কারবৎ ধ্বনি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মালয় উপদ্বীপের লোকেরা ইহাকে dl বা d বা l এ পরিণত করে; فضل, حاضر, رضا মালয় উচ্চারণে যথাক্রমে pedul, hadlir, redla বা

rela ; স্পেনীয়েরা ض অক্ষরের ধ্বনি আরবী-ভাষীদের কাছে শুনিয়া d (=দ বা ধ্ব) দিয়া লিখিয়া গিয়াছে — القاضي=alcayde, الارض=alarde. আমি নিজের কানে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে* ইহা এক-বর্ণ-হিসাবে উচ্চারিত 'ধ্ব্ব' (dhw)-বৎ লাগে। এই ধ্বনি ذ ধ্ব এর নিকট সম্পৃক্ত ঘোষ উষ্ম ধ্বনি ; ذ এর উচ্চারণে জিভ দাঁতে ঠেকাইতে হয়, ض এর উচ্চারণে জিভ দন্ত্য-মূলে ঠেকাইতে হয়। ذ এর সহিত এই সম্পর্ক বা সাদৃশ্য থাকার দরুন ইউরোপে ইহাকে কেহ কেহ ḍ, বা ḏ, বা ẟ (গ্রীক দেল্‌তা অক্ষরের নীচে বিন্দু দিয়া) লেখেন। কিন্তু সাধারণতঃ ḍ লেখাই রীতি। যদিও ইহার মূল উচ্চারণ z এর মত নয়, তথাপিও এই উষ্ম বর্ণ পারস্যে ও ভারতে z এ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ض এর z ধ্বনি ধরিয়া রোমান লিপ্যন্তরে ẓ, z̤ প্রভৃতি বর্ণ ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ আরবীর ধ্বনি অনুসারে লিখিতে হইলে আমি ض কে ধ্ব্‌ রূপে লিখিতে চাই। ইহাতে ذ ধ্ব এর সহিত ইহার নৈকট্য বুঝান যাইবে। তবে যদি কেহ রোমান ḍ এর অনুকরণে ḍ (দ.) লেখেন, তাহাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। ض এর ফারসী ও ভারতীয় z উচ্চারণ জানাইবার জন্য আমি জ্ব লিখিতে চাই। উদাহরণ—رضا রধ্বা (বা রজ্বা), ضياءالحق ধ্বিয়া'উ-ল্‌-হক্‌ক্‌ (জ্বিয়া'উ-ল্‌-হক্‌ক্‌). ضميرالدين ধ্বমীরু-দ্‌-দীন (জ্বমীরু-দ্‌-দীন), فضل ফধ্ব্‌ল (ফজ্ব্‌ল্‌) ইত্যাদি।

ط = ত্বা' (বা ত্বো, ত্বোয়্‌)। ইহাকে মূর্দ্ধণ্য-ট-কার-ঘেঁষা একপ্রকার তালব্য-ত বলা চলে ; জিভ চওড়া করিয়া দন্তমূল বা তালু ও দন্তের সংযোগস্থলের একটু উপরে আঘাত করিলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়, উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় বিবৃত থাকে। ইহাতে w এর একটু আমেজ আসিয়া যায়। এই অক্ষর অসমীয়ার ট ও ত উচ্চারণের মত। ইহা আবার কোথাও বা দ-কারবৎ উচ্চারিত হয়। রোমান লিপিতে ইহাকে ṭ বা t̤ রূপে লেখে। বাঙ্গালায় ত় (অভাবে ত) লিখিলে চলিতে পারে। পারস্যে ও ভারতে ط ও ت এর কোনও পার্থক্য রক্ষিত হয় না। طاهر ত়াহির, لطيف লত়ীফ, عطا 'অত়া' سلطان সুলত়ান, عطار 'অত়্‌ত়ার ইত্যাদি।

ظ = থ্বা', জ্বা' (জ্বো, জ্বোয়্‌)। ইহার উচ্চারণ-স্থান ط এর মত। উষ্ম z বা s এর মত করিয়া ط উচ্চারণের চেষ্টায় ظ ধ্বনির উদ্ভব। দন্ত্য ت ত' এর সহিত সম্পৃক্ত অঘোষ উষ্ম থ যেমন ث (থ্ব), তদ্রূপ তালব্য ط তএর উষ্ম থ হইতেছে ظ। ظ বর্ণের ث এর সহিত সম্পৃক্ত, এই জন্য ইহাকে ইউরোপে কখন ṯh. বা θ̱ লেখে। আমি এই ধ্বনি যেমন শুনিয়াছি, তাহাতে ইহাকে একযোগে উদ্ধৃত thw বা dhw এর মত বোধ হয় ; এই ধ্বনিতে w অংশটী বিশেষ প্রবল মনে হয়। মালয় উপদ্বীপে ইহার ধ্বনি tl বা dhতে দাঁড়াইয়াছে। ফারসী ও ভারতীয় উচ্চারণে এই উষ্মবর্ণ zএর ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আরবী-ভাষীরা ইহাকে zএর মত উচ্চারণ করে না। ইউরোপে ইহার সাধারণ রূপ ḏh বা ẓ। বাঙ্গালায় আমি ইহার

মূল-উচ্চারণ দ্যোতক গ়্ অক্ষর ব্যবহার করিতে চাই ; এবং ٪ ধ্বনি অনুসারে জ়্ লিখিতে চাই ; দুই বিন্দুযুক্ত জ় লিখিলে ; জ়এর এবং ذ ض জ়ু ও জ়ং-এর সঙ্গে গোল হইবে না।

উদাহরণ—ظاهر গ়াহির (জ়াহির). ظلم গ়ুলম্ (জ়ুলম্), ظفر গ়ফর (জ়ফর্) معظم মু‹অগ়্গ়িম্ (মু‹অজ়্জ়িম). مظهر মগ়্হর (মজ়্হর্), حافظ হ়াফিগ়্ (হ়াফিজ়্) ইত্যাদি।

ع = ‹অয়্ন্। এই অক্ষরের ধ্বনি বিশেষ ভাবে শেমীয় ভাষার ধ্বনি। আরবী যাহার মাতৃভাষা নহে, তাহার পক্ষে ইহার উচ্চারণ অসাধ্য বা দুঃসাধ্য। পারস্য ও ভারতে এই ধ্বনির অনুকরণ চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত ঠিক ধ্বনিটী বাহির হয় না ; ‹অয়্ন্ থাকিলে হয় পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ করা হয়, না হয় হঠাৎ গলা চাপিয়া বাক্য সমাপ্তি করা হয়। ع অক্ষর কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন ধ্বনি দ্যোতক ; ইহা হম্জ়হ্, হ়া, ঘ়য়্ন্ ও ক়াফের সহিত সম্বদ্ধ। ইহাকে গলার নালী চাপিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, অনেকটা গলার ভিতরে উচ্চারিত 'য়'র মত শুনায়। এই ধ্বনি কথায় বর্ণনা করিতে পারা যায় না ; উটের ডাকের ধ্বনির সহিত এই ধ্বনি তুলিত হয়। রোমান লিপ্যন্তর পদ্ধতিতে ইহাকে ['], [ʿ], বা [ʽ] রূপে লেখে; রোমান বর্ণমালায় ইহার অনুরূপ কোনও ধ্বনি নাই, এবং ইউরোপের কোনও ভাষার ধ্বনির সহিত ইহার সাদৃশ্য না থাকায় এই ব্যবস্থা। কখনও কখনও যে স্বর ধ্বনির সহিত ‹অয়ন্ অক্ষর যুক্ত থাকে, তাহার নীচে একটী ফুট্‌কী দিয়া জানান হয় ; যেমন ạ, ị, ụ ; তদনুকরণে হিন্দীতে অ় আ় ই় ঈ় উ় ঊ় প্রভৃতি লিখিত হয়। কিন্তু এই রকম করিয়া কেবল বিন্দুর সাহায্যে জানাইবার চেষ্টা করিলে, ব্যঞ্জন ع ধ্বনির অস্তিত্ব ভাল করিয়া দেখান হইল না। বাঙ্গালায় ইহার জন্য ['] লেখা যায় ; কিন্তু '] লিখিলে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, এবং হম্জ়হের চিহ্ন ['] র সহিত গোল বাধিতে পারে। এই কারণে আমি ইহাকে ‹ চিহ্ন দ্বারা জানাইতে চাহি। বাঙ্গালা ঋ-ফলা (ৃ) দ্বারা, বা ব-অক্ষরের মাত্রা ও দুই দিক্ বাদ দিয়া সৃষ্ট ‹ হরফ দিয়া, কিম্বা গণিতশাস্ত্রের আপেক্ষিক লঘুত্বজ্ঞাপক < চিহ্ন দিয়া, বা ইংরেজীর v অক্ষরের সাহায্যে, সহজেই সর্ব্বত্র এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। যেমন علي 'Ali বা 'Aly = ‹অলী ; عبد 'Abd = ‹অব্দ্, عرب 'Arab = ‹অরব্, عشق 'išq('ishq) = ‹ইশক্, عزت = ‹ইজ়্জ়ৎ

عنايت = ‹ইনায়ৎ, عثمان = ‹উগ়্মান (‹ওস্মান্), شاعر = শা‹ইর, يعقوب = য়‹কূব্, سعيد = স‹ঈদ্, معراج = মি‹রাজ, معز = মু‹ইজ়্জ়্, لعل = ল‹ল, رفيع الدين = রফী‹উ-দ্-দীন্ (রফী‹-অদ্-দীন্), جامع = জামি‹, جمع = জম্‹অ বা জম্‹।

غ = ঘ়য়্ন্। উষ্ম ঘ়। এই ধ্বনি খ় (خ) র ঘোষ রূপ, অতএব ইহাকে গ় না লিখিয়া ঘ় লেখাই উচিত। [উষ্ম ঘ় ভিন্ন কণ্ঠ্য স্পৃষ্ট গ় ধ্বনি আছে আমাদের বাঙ্গালা গ জিহ্বামূলীয়; এই কণ্ঠ্য গ় হইতেছে ক় ق ধ্বনির ঘোষ রূপ, এবং ইহা غ হইতে পৃথক্]। বাঙ্গালায় যে

সকল আরবী ও ফারসী কথা আসিয়াছে, সে গুলিতে غ থাকিলে সাধারণতঃ গ'য়ে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ আরবে ইহা ع রূপে উচ্চারিত হয়; আলজিরিয়ায় ইহার উচ্চারণ ڤ ক্ব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় গ. অপেক্ষা ঘ় লেখা ভাল মনে করি; তদ্দ্বারা ইহার উষ্ম প্রকৃতি তথা ঘ-এর সহিত সম্বন্ধ দ্যোতিত হইবে। غيب ঘ়য়্ব্, غلام ঘ়ুলাম, غياث ঘ়িয়াছ় (ঘ়িয়াস), غازي ঘ়াজ়ী, مُغْنِي মুঘ়নী, غني ঘ়নী, داغ দাঘ়। রোমান বানানে ইহা gh, gh, g, g, g রূপে, এবং গ্রীক অক্ষর γ দিয়াও কখন কখন ইহাকে লেখা হয়।

ف = ফা' (ফে)। উষ্ম ফ, f, সংস্কৃতের ও হিন্দীর প্ হ ph = ফ নহে। আজকাল বাঙ্গালায় ফএর উষ্ম f উচ্চারণ খুবই শুনা যায়। আরবীতে প-এর ধ্বনি নাই, তাই 'প' এর জন্য ف ফ বা ب ব লিখিত হয়। فضل ফজ়্ল, غفار ঘ়ফ্ফার, فريد ফরীদ্, ظفر জ়ফর, شريف শরীফ্, يوسف য়ূসুফ্ ইত্যাদি।

ق = ক্বাফ্। কণ্ঠ্য ক্ব (ক্ব)। গলার ভিতর হইতে নির্গত ধ্বনি। মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় ইহার ধ্বনি 'গ' য়ে পরিণত হইয়াছে; মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ার স্থানে স্থানে ইহার উচ্চারণ 'জ' 'চ' বা 'জ়' হইয়া গিয়াছে, যেমন قائد চা'ইদ, سرق সির্চে, قريب জ়রীব্, قدام জিব্লে ইত্যাদি; আবার দক্ষিণ-আরবে ইহাকে غ য় এর মত উচ্চারণ করে। ইহার রোমান মূর্ত্তি k, ḳ, q. বাঙ্গালায় ক্ব লেখা উচিত; قطب ক্বুত্ব্, قمر ক্বমর, قاسم ক্বাসিম্, خالق খ়ালিক্ব, فقير ফক্বীর, باقي বাক্বী, اقبال ইক্ব্বাল।

ک = কাফ্। আমাদের বাঙ্গালা ক-এর ধ্বনি। ভাষা আরবীতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে; মোরোক্কোর স্থানে স্থানে ইহা হম্জ়হের সামিল হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; আবার সিরিয়ায়, মধ্য-আরবে ও মেসোপোটামিয়ায় ইহা 'চ' 'জ' বা 'ৎস' (পূর্ব্ববঙ্গের চ়) বা 'ক্ষ' রূপ ধরিয়াছে: كتاب চিতাব্, كاتب চাতিব্, كلام চলাম, سلام عليكم স়লাম্ 'অলেচু, حكيم হ়জ্জীম, كامل জামিল ইত্যাদি। তালব্য-চ-রূপে উচ্চারিত 'ক'কে আরবেরা 'কশ্কশহ্' উচ্চারণ বলে। রোমান বানানে k রূপই সাধারণ; কেহ কেহ c লিখেন। বাঙ্গালায় 'ক' লেখাই উচিত। اكبر অক্বর্, كبير কবীর, كامل কামিল্, مالك মলিক্, مكان মকান ইত্যাদি।

ل = লাম্। আমাদের দন্ত্য ল। আধুনিক আরবীতে কুত্রাপি মূর্দ্ধণ্য ৺ঠ হইয়া গিয়াছে। ت, ث, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ن এই কয়টী শম্সী বা 'সৌর' অক্ষর যদি বিশেষ্য ও বিশেষক ال উপসর্গের পরে আসে, তাহা হইলে ال এর ل সেই সেই অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ب, ج, ح, خ, ع, غ, ف, ق, ک, م, و, ه, ي, এই ক্বমরী বা 'চান্দ্র' বর্ণগুলির পূর্ব্বে থাকিলে لএর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। الطاف অল্ত়াফ়, لطف লুত়্ফ্, كامل কামিল, الله অল্লাহ, اسرائيل ইস্রা'ঈল, ইত্যাদি। রোমান l.

م=মীম্‌। ম ; রোমান m ; مالك মলিক, مُحَمَّد মুহম্মদ, نجم নজ্‌ম্‌, قاسم ক়াসিম।

ن=নূন্‌। দন্ত্য ন। نظام নিজ়াম (নিজ়াম), نور নূর, قرآن ক়ুর্'আন্‌, حسين হুসয়ন্‌, النبي অন্‌-নবী। ن যদি ب ব অক্ষরের পূর্ব্বে থাকে, তাহা হইলে ম রূপে উচ্চারিত হয়, এবং তখন বাঙ্গালায় ম-কার লেখা উচিত ; ফার্সী شنبه শুম্বহ্‌, استنبول ইস্তম্বোল ইত্যাদি।

و=বার। ব (ৱ) w, অন্তঃস্থ ব-কারের ধ্বনি। এই অক্ষরের দ্বারা স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনিই নির্দ্দিষ্ট হয়। অসমীয়ার 'ৱ' (অন্তস্থ ব) অক্ষর দিয়া ব্যঞ্জন و জানানই ভাল ; ওয়া (oya), ওআ, ওা (oa), ও, উ (o, u) দিয়া লিখিলে ইহা ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা হয় না। ব্যঞ্জন ধ্বনি—وكيل ৱকীল্‌, واحد ৱাহিদ্‌, وزير ৱজ়ীর, ولايت ৱিলায়ৎ ولي ৱলী, انور অন্‌ৱর, اول অৱ্‌ৱল, تهور তহৱ্‌ৱুর।

হম্‌জ়হ্‌ ফৎহহ্‌-র পরে থাকিলে, ـَو=অৱ্‌ ; ইহাকে সাধারণতঃ au রূপে রোমান লিপিতে লেখা হয়, আবার aw রূপেও লেখা দেখা যায়। কেহ কেহ ō (দীর্ঘ ও) করিয়াও লেখেন। বাঙ্গালায় অৱ্‌, অও বা ঔ—তিনের এক লেখা চলে ; مولى মৱ্‌লা, মওলা, বা মৌলা (mawla, maula) ; جوهر জৱ্‌হর্‌, জৌহর ; شوكت শৱ্‌কৎ, শৌকৎ ; قوم ক়ৱ্‌ম্‌, ক়ওম্‌, ক়ৌম্‌ ; اول অৱ্‌ৱল, অওৱল্‌, ঔৱল্‌।

স্বরবর্ণ و—পেশ চিহ্নের (ُ) পরে থাকিলে, ـُو=ঊ ; অর্থাৎ uw=ū (ঊ) ; محبوب মহ্‌বূব, ودود ৱদূদ, منصور মন্‌সূ়র।

ه=হা' (হে)। আমাদের 'হ', রোমান লিপিতে h ; هدايت হিদায়ৎ, مظهر মজ়্‌হর্‌, خواجه খ়্‌ৱাজহ্‌, هند হিন্দ্‌, الله অল্লাহ্‌। হা-ই-মুখ্‌তফী—পদান্তস্থ অনুচ্চারিত হা—আরবী কথার প্রাতিপাদিক রূপ এবং ফারসী রূপে, ও ফারসী কথায় পাওয়া যায়। ইহাকে হ্‌ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেই ঠিক হয়। এই অন্ত্য 'হ' দ্বারা পূর্ব্ব ব্যঞ্জন বর্ণের পর হ্রস্ব 'আ'কারের উচ্চারণ আসে। বিকল্পে ইহাকে 'আ' লেখাও চলে। তবে আমি 'হ্‌' লেখার পক্ষপাতী। যেমন ملكه মলিকহ্‌ (বা মলিকা) سلطانه সুল্‌তানহ্‌ (বা সুল্‌তানা), فاطمه ফাতি়মহ্‌ (বা ফাতি়মা) ; [ফারসী دانه দানহ্‌ বা দানা, بنده বন্দহ্‌ বা বন্দা ইত্যাদি]। যেখানে অন্ত্য ه উচ্চারিত হয়, সেখানে হ লেখা অবশ্য কর্ত্তব্য ; الله অল্লাহ্‌। ة হা-তা—আরবীর উচ্চারণ অনুসারে হ্‌ বা ত্‌ (ৎ)। جنة জিন্নহ্‌, জিন্নৎ ; دولة দৱ্‌লহ্‌ দৌলৎ।

ى=য়া' (ইয়া) (বা য়ে) ; সংস্কৃতের য, বাঙ্গালায় ইঅ বা ইয় ; রোমানে y, জর্ম্মান উচ্চারণ অনুসারে j. এই বর্ণ و এর অনুরূপ। ব্যঞ্জন প্রয়োগ ي=য়—يحيى য়হ্‌য়া, يوسف য়ূসুফ্‌, هدايت হিদায়ৎ, خيام খ়য়্‌য়াম, سيد সয়্‌য়দ্‌, ضياء জ়িয়া' (জ়িয়া), كفايت কিফায়ৎ।

َـی = অয়্ (ay, aj, ey), বা ঐ ai (বা দীর্ঘ এ) : خیر খয়্‌র্ (খৈর), زین জ়য়্‌ন্ (জৈন্), حسین হুসয়ন্ (হুসৈন, হুসেন), حیدر হয়্‌দর (হৈদর)।

ِـی = ঈ ; علی ‘অলী, مجید মজীদ, کریم করীম, باقي বাক়ী।

ফারসী (পারসী)

ভারতবর্ষে ফারসী কেতাবী ভাষা, মৌলবী ও আলেমগণের উপজীব্য মাত্র, কিন্তু ইহা পারস্য-দেশের জীবন্ত ভাষা। আধুনিক পারস্যের ফারসীতে নানা পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে, হাফিজ়, স‘দী (সাদী) ও ফির্‌দৌসীর ভাষা হইতে নবীন ফারসী উচ্চারণে এবং ব্যাকরণে অন্য রকমের হইয়া পড়িয়াছে। তিন চার শত বৎসর পূর্ব্বে ফারসীর যে উচ্চারণ ছিল, ভারতে মৌলবীরা সেই উচ্চারণ ধরিয়া ফারসী পড়েন। উর্দুতে অধুনা যে সকল ফারসী কথা গৃহীত হয়, সেগুলি পুরান ফারসীর ঢঙেই উচ্চারিত হয়। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে যে সকল ফারসী নাম পাওয়া যায়, তাহা এই পুরান উচ্চারণ ধরিয়া লেখাই ভাল।

ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি আরবীতে নাই, তজ্জন্য নূতন অক্ষর তৈয়ারী করিয়া ফারসীতে সেইগুলি প্রকাশিত হয়। এই অক্ষরগুলি হইতেছে پ چ ژ گ.

َـ ِـ ُـ=অ, ই, উ। ফারসী লিপিতে সাধারণতঃ এই তিন হ্রস্ব স্বর-চিহ্ন লেখা হয় না। ফারসীতে হম্‌জ়হের উচ্চারণ নাই। অলিফ্ ফারসীতে স্বরবর্ণ মাত্র। কথার আদিতে ا=অ (হিন্দীর অ, ইংরেজীর hut but এর u) ; অন্যত্র ا=আ। আদ্য ও মধ্য آ =দীর্ঘ ‘আ’ ; اسپ অস্প্, هزار হজ়ার, چراغ চিরাগ়, انگور অঙ্গূর ; آب আব্, آتش আতিশ্ বা আতশ্, آرام আরাম, بهمان বহ্‌মান্। اِ, اُ=ই, উ : انگریز ইঙ্গ্‌রেজ়্, اُمّید উম্মেদ্।

ب, ت=বে, তে : ‘ব’ ‘ত’ ; রোমান বানানে b, t : بابر বাবর, آب আব, بهادر বহাদুর, تخت তখ্‌ৎ, زرتوشت জ়র্‌তোশ্‌ৎ।

پ=পে : ‘প’—p : پیر পীর, پیغمبر পয়্‌গ়ম্বর, پارسي পারসী, اسپندیار ইস্পন্দ্‌য়ার, اسپهان ইস্পহান, گشتاسپ গুশ্‌তাস্প্, پهلوان পহ্‌লৱান্।

چ=চীম্ বা চে। ‘চ’ ; রোমান বানানে ch, <u>ch</u>, tch, tsch, tsj, tj, c, ć বা č ; چراغ চিরাগ়, چین চীন, بلوچ বলোচ্, چشتي চিশ্‌তী, منو چهر মিনুচিহ্‌র্।

ژ=ঝ়ে। ‘ঝ়’ রোমান বানানে zh বা ž, ফরাসীর j ; منیژه মনীঝ়হ্।

گ=গাফ্। ‘গ’=g: گیو গীউ, গীৱ ; گرگان গুর্গান্, گوهر গওহর, بزرگ বুজ়ুর্গ্। نگ=ঙ্গ : هوشنگ হোশঙ্গ, اورنگزیب অওরঙ্গ্‌জ়েব্, فرنگي ফিরঙ্গী।

আরবীর অক্ষরগুলির মধ্যে, ث থ় ও ذ ধ় এর ধ্বনি সুপ্রাচীন ফারসীতে ছিল, এখনকার ফারসী এই দুই ধ্বনি হারাইয়াছে। ص ق আরবী বানানে লেখা গুটি কয়েক ফারসী

কথায় পাওয়া যায়। কিন্তু ث ذ ح ص ض ط ظ ع ق এই অক্ষর গুলিকে আধুনিক ফারসীর বহির্ভূত বলা চলে, কেবল আরবী কথাতেই ইহাদের পাওয়া যায়।

ث = থ্। চার পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল; ফারসীর মাতামহী-স্থানীয় অবেস্তার ভাষায় ও প্রাচীন পারসীকের বাণমুখ লিপিতেও এই ধ্বনি মিলে। কিন্তু এখন এই ধ্বনি আর নাই, ইহার স্থানে 'স' বা 'হ' উচ্চারণ করা হয়: کیومرث=کیومرس গয়োমর্থ্—গয়ুমর্স্। ফারসীতে গৃহীত আরবী কথায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য স; এই স-কে রোমান ṡ এর অনুকরণে সঁ লেখা চলে। স়, স়, স়., স়, স', স'—এই রূপ নানা চিহ্ন উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। আমি কেবল দন্ত্য স লেখার পক্ষপাতী।

ج = জ। جنگ জঙ্গ্, آذربیجان অজরবৈজান্, یزدجرد য়জ্দিজিদ্। ج এর 'গ' উচ্চারণ ফারসীতে অজ্ঞাত।

ح—ফারসীতে আরবীর গুরু উচ্চারণ করা হয় না।

خ = খ্। ফারসীতে خو এই সংযুক্ত বর্ণ দ্বারা একটা ধ্বনি নির্দিষ্ট হয়—খ্ব দ্বারা তাহা লেখা চলে (এখানে ব ফলা = অন্তস্থ ব; এই অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ হয় না); خواب খ্বাব্ (= খাব্), خوارزم খ্বারিজ্ম্ (= খারিজ্ম্), خواجه খ্বাজহ্ (= খাজা) ইত্যাদি।

د = দ। ذ = ধ্জ়। পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ফারসীতে এই ধ্বনি ছিল, অবেস্তার ভাষায়ও ইহা মিলে। এখন আরবীর ذ কে 'জ়' উচ্চারণ করা হয়; তদ্রূপ আরবীর ض ظ (দ্বঁ ঠ়) র জ়-বৎ ধ্বনি আসিয়াছে। ফারসীতে এবং তদনুকরণে তুর্কী ও উর্দুতে ذ ز ض ظ এই চারি অক্ষরের একই ধ্বনি, 'জ়' = z; মূল আরবীর উচ্চারণ অনুসারে ইহাদিগকে যথাক্রমে 'ধ্ব, জ়, দ্বঁ, ঠ়' লেখা চলে, তাহাতে গোল থাকে না। কিন্তু ফারসী ও উর্দুর 'জ়' উচ্চারণ অনুসারে লিখিব, অথচ মূল অক্ষরের পার্থক্য বাঙ্গালা বানানে বজায় রাখিব, ইহা বড় মুস্কিলের কথা। রোমান লিপিতে z = জ় অক্ষর থাকায়, এই z কে অবলম্বন করিয়া ż, z̤, z̤̈, z̲, z̨, প্রভৃতি নানা নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিয়া ذ ز ض ظ এর পার্থক্য জানান সহজ। বাঙ্গালায় ত প্রথমতঃ জ-এ ফুট্‌কি দিয়া জ় (= z) সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহার উপরে আরও চিহ্ন দিতে গেলে বড়ই বিকট দেখাইবে—যেমন জ়, জ় জ..। এ ক্ষেত্রে কেবল জ় লেখাই ভাল; তবে যাঁহারা মূল অক্ষর বাঙ্গালায় দেখাইতে চাহিবেন, তাঁহারা এইরূপে লিখিতে পারেন; ز—জ় (যেমন আরবীতে আছে); ذ = জ়ঁ, (জ়ঁ এর মাথায় বিন্দু দিয়া—ث = সঁ এর অনুকরণে); ض = জ়ঁ, এবং ظ = জ়।

ز ذ ض ظ—ইহাদের জন্য কখন যে জ, য, য় বা য্ লেখা হয়, তাহা মোটেই সমর্থন করা চলে না।

ر س ش—র, স, শ—আরবীর মত। 'ছ' (= chh) দিয়া s এর ধ্বনি লেখা উচিত নয়।

ص س—স়, স; তুর্কী ফারসী উর্দুতে س ص এর কোন পার্থক্য নাই; ص র জন্য বাঙ্গালায় ইচ্ছামত স বা স় লেখা চলে।

ض এর বিষয় ذ এর কথায় বলা হইয়াছে।

ط=ত্ ; ফারসীতে ط ও ت র তফাৎ নাই ; বাঙ্গালায় ইচ্ছামত ত্ বা ত লেখা চলে। ظ এর বিষয় পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

ع—ফারসী, তুর্কী ও উর্দ্দুতে ع এর আরবী উচ্চারণ প্রচলিত নাই। কেবল পূর্ব্বের স্বর-ধ্বনিকে দীর্ঘ ও কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত করিয়া ইহার অস্তিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। ভারতবর্ষের মৌলবী ও আলেম-গণ এ বিষয়ে যত্নপর হইলেও সাধারণতঃ ع এর ধ্বনি অপরিচিত ; লোকে ইহাকে অ, আ, ই প্রভৃতি স্বরবর্ণের মত উচ্চারণ করে, ইহার কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন প্রকৃতি রক্ষা করা ভারতবাসীর কণ্ঠে অসম্ভব। কিন্তু আরবী শব্দ ফারসী ও উর্দ্দু উচ্চারণ ধরিয়া লিখিলেও [<] চিহ্ন ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না।

غ, ف—আরবীর মত=ঘ়, ফ়।

ق—আলেমগণ ইহার ক় উচ্চারণ বিষয়ে মনোযোগী হইলেও, পারস্যে ও ভারতে সাধারণতঃ ইহা ک ক এর মত উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালায় ক় লেখাই ভাল।

ک, ل, م=ক, ল, ম—আরবীর মত। ک এর চ-ধ্বনি ফারসীতে অজ্ঞাত।

ن=ন ; আরবীর মত। পুরান ফারসীতে দীর্ঘ স্বরের পরে থাকিলে পদান্তস্থিত ن চন্দ্রবিন্দুর মত উচ্চারিত হইত। এই 'অনুনাসিক উচ্চারণ' (নুন্-ই-ঘুন্নহ্) ভারতেও প্রচলিত। ফারসীর পুরান উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায়ও চন্দ্রবিন্দু লেখা যায় ; যেমন جهان জহাঁ, شیرین শীরীঁ, نوشیروان নূশীর্ৱান্ বা নোশের্ৱাঁ, چون চূঁ। نب=ম্ব।

و—ফারসীতে সাধারণতঃ কোমল দন্তৌষ্ঠ্য উচ্চারণ, v, শুনা যায় ; আরবীতে ওষ্ঠ্য w উচ্চারণই সাধারণ। তুর্কীতেও v উচ্চারণের প্রাধান্য। ভারতে v, w দুইই আছে। ব্যঞ্জন و-কে ৱ লেখাই ভাল।

স্বরবর্ণ و এর উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে 'ঊ' : فیروز ফীরূজ়, هندوستان হিন্দূস্তান্, نوروز নৌ-রূজ়, گوشت গূশ্ৎ ইত্যাদি ; এই উচ্চারণকে معروف মৎরূফ়-উচ্চারণ বলে। و এর দীর্ঘ 'ও' উচ্চারণ আধুনিক ফারসীতে অজ্ঞাত, কিন্তু এই 'ও' উচ্চারণ (আজ কাল পারস্যে যাহাকে مجهول মজ্হূল্ বা 'অজ্ঞাত উচ্চারণ' বলে) পুরান ফারসীতে খুব সাধারণ ছিল। ভারতবর্ষে মজ্হূল্ বা 'ও'-উচ্চারণই বেশী প্রচলিত ; ভারতের মুসলমান ইতিহাসের নামগুলি তদনুসারে লেখাই ভাল ; فیروز=ফেরোজ়, خسرو খ়ুস্রো, هندوستان হিন্দোস্তান্, হিন্দোস্তাঁ।

و,ـَو=আরবী অৱ্ ; ফারসীতে অও, অউ বা ঔ ; আধুনিক ফারসীতে 'ওউ', তুর্কীতে এভ্ (ev)। فردوسي আরবী ধরণে=ফ়িৰ্দৱ্সী (Firdawsi) ; আধুনিক ফারসীতে—ফ়িৰ্দোউসী Firdousi (পুরান ফারসীতে ফ়িৰ্দৌসী Firdausi, বা ফিরদোসী, ফের্দ্দুসী নহে), তুর্কীতে Firdevsi. বাঙ্গালায় ফারসী কথায় ঔ লেখাই ভাল।

ه=হ। হা-ই-মুখ্তফ়ীর সম্বন্ধে আগে বলা হইয়াছে। একাক্ষর ফারসী পদে ه স্থলে হ্ না লিখিলেও চলে ; যেমন که কি, چه=চি, نه=ন, به=বি।

ی = য় ; ব্যঞ্জন ধ্বনি জানাইলে—য় ;

স্বরধ্বনি জানাইলে আধুনিক (মৎরূফ) উচ্চারণ অনুসারে 'ঈ', পুরাতন (মজ্হুল) 'এ' দুইই লেখা চলে ; دلیر দিলের বা দিলীর ; جمشید জমশেদ্ বা জম্শীদ্ ; ایران এরান্ বা ঈরান্ ; شیر শের ; بيروني বেরূনী, বেরোনী, বীরূনী ; بخشي বখ্শী।

یَ—অয়্ বা ঐ (ay, ai) ; (আধুনিক ফারসীতে ei এই) ; رَی রয়্, রৈ ; نَیشاپور নৈশাপোর, کیخسرو কৈ খু্স্রো, بیرم বৈরাম ইত্যাদি।

ফারসীর কস্রহ্-ই-ইজাফৎকে -ই-, বা ভারতে প্রচলিত পুরাতন ফারসীর উচ্চারণ অবলম্বনে -এ- লেখা উচিত। কিন্তু -ই- লেখাই ভাল। ইজাফৎকে পূর্ব্ব পদের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া ঠিক নহে।

যেমন بختیار خالجی বখ্তেয়ার-ই-খলজী, محمود سبکتگین মহ্মুদ-ই-সবুক্তগীন, بادشاہ هندوستان বাদ্শাহ্-এ-হিন্দোস্তান্ ইত্যাদি।

তুর্কী

আরবী শেমীয় ভাষা ; ফারসী ও পশ্তো এবং বলোচ্ তথা উর্দূ, আর্য্যভাষা। তুর্কী ভাষা সংযোগমূলক উরাল-আল্টাই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ;—হঙ্গেরীয় ও ফিন্, মাঞ্চু ও তুঙ্গুস্, মোঙ্গোল ও বুরিয়াৎ ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা। খিরঘীজ্, উজ্বগ্, সার্ত, য়াকুৎ, কাল্‌পাক্, কিপ্‌চাক্ প্রভৃতি তাতার ভাষাগুলি তুর্কীর সমশ্রেণিক ও সমস্থানীয়। আজকাল তুর্কী ভাষার দুই রূপ দেখা যায়—পশ্চিমা বা ওস্মান্লী তুর্কী, এবং পূর্ব্বী বা চাঘ্তাঈ বা উইঘুর তুর্কী। ওস্মান্লী তুর্কী ইউরোপের ও পশ্চিম-এশিয়ার তুর্কীদের ভাষা, বহু আরবী ও ফারসী শব্দ গ্রহণ করিয়া ইহার রূপ অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে, আরবীর ও ফারসীর প্রভাবে ইহাতে একটী উচু দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। চাঘ্তাঈ তুর্কী মধ্য-এশিয়ায় প্রচলিত ; ইহাতে তেমন সাহিত্য রচনা হয় নাই, কিন্তু এই তুর্কীই অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ তুর্কী, এবং তুর্কীর প্রাচীন রূপ ইহাতেই বর্ত্তমান আছে। ভারতের প্রথম মুসলমান বিজেতৃগণের ভাষা এই পূর্ব্বী তুর্কীই ছিল। তৈমুরলঙ্গের মাতৃভাষা ছিল চাঘ্তাঈ তুর্কী ; তৈমুরের ছয় পুরুষ অধস্তন বাদশাহ বাবর এই ভাষা বলিতেন, এবং ইহাতে তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তুর্কী ভাষার ছাপ ভারতে পড়ে নাই ; উত্তর-ভারতের ভাষাগুলিতে কেবল কতকগুলি তুর্কী কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে মাত্র। ফারসী ভাষা তুর্কীরাই প্রথম এ দেশে আনে, সেই জন্য কতকটা তুর্কী ঢঙ্গের ফারসী উচ্চারণ ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছে। তুর্কীর ধ্বনিগুলি ফারসী হইতে বিশেষ পৃথক্ নয়। তুর্কীতে স্পৃষ্ট ও উষ্ম, অঘোষ ও ঘোষবর্ণের পার্থক্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না ; ت د ط ত দ ত্, ف ب پ ফ প ব, چ ج চ জ, ک گ ক গ, ق غ ক্ব ঘ় এর অদল বদল দেখা যায়। স্বর ধ্বনির মধ্যে দীর্ঘ 'আ' বহু স্থলে বাঙ্গালা দীর্ঘ অ-কারের

মত (ইংরেজী aw'র মত) উচ্চারিত হয় ; چاق ماق, বাঙ্গালায় চক্‌মকী। তুর্কীতে বাঁকা 'উ ও, আ'(= জর্ম্মানের ü ö ä) ধ্বনি আছে, সেগুলি কিন্তু আরবী হরফে জানান হয় না ; আমাদেরও ও বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার দরকার নাই। و ও ي র 'ও' এবং 'এ' উচ্চারণ আছে। তুর্কীতে আরবীর ث ذ ص ض ط ظ ع ধ্বনি নাই ; কিন্তু ق খুবই মিলে ; এবং অনেক স্থলে আদ্য ت এর জায়গায় ط লিখে। ফারসীর ژ নাই, এবং نگ র উচ্চারণ 'ঙ', ফারসীর মত 'ঙ্গ' (ঙ্‌গ্) নহে। ভারতের মুসলমান যুগের ইতিহাসে যে তুর্কী নাম পাওয়া যায়, ফারসীর পুরাতন উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায় বর্ণান্তর করিলেই কাজ চলিবে ; যেমন ایبک অয়্‌বক্, الپ ارسلان অল্প্‌ অর্স্‌লান্, هولاگو হুলাগু, سبکتگین সবুক্তগীন্, یلدز য়িল্‌দিজ্‌, تغلق তগ্‌লক্ব, طغرل তুগ্‌রিল, التمش অল্‌তমিশ, ینگین য়িৎগীন্, الوغ উলুগ্‌, خلجي খলজী, چین قلیچ চীন্ ক্লিলীচ, بغره বুগ্‌রহ্‌ ইত্যাদি।

পশ্‌তো (পষ্‌তু, পখ্‌তু)

পশ্‌তো ঈরানীয় ভাষা, ফারসীর সহিত সম্পৃক্ত। ইহাতে কিন্তু বিস্তর ভারতীয় (সিন্ধী ও পশ্চিম-পঞ্জাবী) শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মত ট, ড, ণ, ড় এর মূর্দ্ধণ্য ধ্বনি ইহাতে মিলে ; এবং ইহাতে এমন কতকগুলি ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে, যাহা আরবী ফারসী তুর্কী উর্দুতে মিলে না। কিন্তু পশ্‌তো কথা বা নাম ভারতের ইতিহাসে বেশী পাওয়া যায় না ; সেই জন্য পশ্‌তোর ধ্বনি ও অক্ষর আলোচনার আবশ্যক নাই। যে দুই চারিটী পশ্‌তো নাম পাওয়া যায়, যেমন سور স্থর, لودی লোদী, درّانی দুর্‌রানী প্রভৃতি, সেগুলি প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিখিলেই চলিবে।

উর্দূ (হিন্দোস্তানী)

উর্দু বাক্য লিখিতে গেলে, ফারসী ও আরবী শব্দের হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ পুরাতন ফার্সীর মত) উচ্চারণ অবলম্বন করা উচিত। ذ ز ض ظ কে খালি জ় লিখিলেই ভাল ; তবে خ ق غ ع প্রভৃতি যে সকল বর্ণ শিক্ষিত উর্দুভাষিগণ উচ্চারণের প্রয়াস করেন, সেগুলির বিশেষত্ব বাঙ্গালা হরফে দেখান উচিত। ط, ص কে খালি ত, স, লিখিলে ক্ষতি হয় না। উর্দুর প্রাকৃত শব্দগুলি বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে হিন্দীর দেবনাগরী বানান অনুসরণ করা উচিত, যেমন ہے হৈ, বাঙ্গালায় 'হায়' বা 'হ্যায়' না লিখিয়া 'হৈ' লেখাই ভাল ; তদ্রূপ کیسے কৈসে= কৈসে, 'ক্যায়ছে' নহে ; ٹھٹّھا ঠট্ঠা = ঠট্‌ঠা (ঠাট্টা নহে), پچھتانا পছ্‌তানা = পছ্‌তানা (পছাতা নহে), پھول ফুল = ফূল (ফুল নহে), تین তীন = তীন্ (তিন নহে), نہیں নহীঁ = নহীঁ, پڑھ পঢ় = পঢ়, ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের মতাবলম্বনে আরবী ভাষার ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে নিম্ননির্দ্দিষ্ট উপায়ে সাজাইতে পারা যায়।

ব্যঞ্জন বর্ণ

(* চিহ্নিত বর্ণগুলি আরবীর নহে)

উচ্চারণ-স্থান	অব্যক্ত ঈষৎ-স্পৃষ্ট, সংবৃত, আভ্যন্তর-প্রযত্ন	অঘোষ স্পৃষ্ট বিবৃত	ঘোষ স্পৃষ্ট বিবৃত	অঘোষ উষ্ম বিবৃত	ঘোষ উষ্ম বিবৃত	ঘোষ স্পৃষ্ট সংবৃত	অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম সংবৃত	ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম বিবৃত	উষ্ম sibilants [স-গোষ্ঠিক] বিবৃত		ঘোষ অন্তস্থ (অর্দ্ধ-স্বর) সংবৃত	ঘোষ আনুনাসিক সংবৃত
									অঘোষ	ঘোষ		
কণ্ঠ	ء, أ='	ق=ক়		خ=খ়	غ=ঘ়	ع=<	ح=হ়	ه=হ				
জিহ্বামূল [ও তালু]		ک=ক	ج=গ (প্রাচীন আরবী) *گ=গ									ق غ کএর পূর্ব্বস্থ ن
তালু		*چ=চ	ج=জ						ش=শ	*ژ=ঝ়	ي=য়	
দন্তমূল		ط=ত়		ظ=থ়(জ্ব)	ض=দ্ব় (দ়)				ص=স়			
দন্ত		ت=ত	د=দ	ث=থ়	ذ=ধ়				س=স	ز=জ়	ر=র ل=ল	ن=ন
ওষ্ঠ		*پ=প	ب=ব	ف=ফ [দন্তৌষ্ঠ্য]	و=ব়, w [v দন্তৌষ্ঠ্য]						و=ব়, w	م=ম ب র পূর্ব্বস্থ ن

স্বরবর্ণ

	কণ্ঠ	তালু	ওষ্ঠ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ
হ্রস্ব	َ, اَ = অ	ِ, اِ = ই	ُ, اُ = উ	ِ, َ = [আধুনিক আরবীতে] এ	ٗ [আধুনিক] = ও
দীর্ঘ	آ ,ا = আ	اِی ,يْ ,ىِ = ঈ	اُو ,وْ = ঊ	اَی ,يْ ,يَ = অয়, ঐ [বা দীর্ঘ এ]	اَو = ـَو অব্, অও, ঔ [বা দীর্ঘ ও]

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আরব ব্যাকরণকার ও আভিধানিক পণ্ডিত খলীল-ইব্‌ন্‌-অহ্‌মদ্‌ আরবী বর্ণগুলিকে উচ্চারণ-স্থান অনুসারে এইরূপে সাজাইয়াছেন ;—[১] কণ্ঠ—ع, ح, ه, خ, غ, ق [২] তালব্য বা জিহ্বামূলীয়—ک, ج [৩] স-গোষ্ঠিক—ش, ص, ض, س, ز [৪] দন্ত্য ও দন্তমূলীয়—ط, د, ت, ظ, ذ, ث, ر, ل, ن [৫] ওষ্ঠ্য—ف, ب, م ; এবং [৬] অর্ধস্বর—و, ا, ی

প্রস্তাবিত লিপ্যন্তর-রীতিতে আরবী-ফারসী বর্ণমালার বাঙ্গালা রূপ এই দাঁড়াইতেছে—

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ا ء	’ (হম্‌জহ্)	—
ب	ব	ব
پ	—	প
ت	ত	ত
ث	থ়	স় [স]
ج	জ [গ]	জ
چ	—	চ
ح	হ়,	হ় [হ]
خ	খ়	খ়
د	দ	দ
ذ	ধ়	ঝ় [জ]
ر	র	র
ز	জ়	জ়
ژ	—	ঝ়
س	স	স
ش	শ	শ
ص	স়	স় [স]
ض	দ় [য]	দ্ব় [জ]

মূল অক্ষর	বাঙ্গালা রূপ	
	আরবী উচ্চারণে	ফারসী (তুর্কী) ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণে
ط	ত়	ত় [ত]
ظ	ধ় [য়]	য় [জ়]
ع	‘	‘
غ	ঘ়	ঘ়
ف	ফ়	ফ়
ق	ক়	ক় [ক]
ک	ক	ক
گ	—	গ
ل, م, ن	ল, ম, ন	ল, ম, ন
و	ৱ [ও]	ৱ [ও]
ه	হ	হ
ی	য়	য়
اَ اِ اُ	অ, ই, উ	অ, ই, উ
آ	আ	আ
ىِ وُ	ঊ, ঈ	ঊ, ঈ
ىَ وَ	অৱ্ [অও, ঔ], অয়্ [ঐ]	অৱ্ [অও, ঔ], অয়্ [ঐ]
ی و	—	ও, এ ; ঊ, ঈ
ً ٍ ٌ	অন্, ইন্, উন্	—

প্রস্তাবিত বর্ণান্তর-রীতির প্রয়োগের উদাহরণ স্বরূপ কয়েক ছত্র আরবী, ফারসী ও উর্দু, এবং দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণের নাম বাঙ্গালা বানানে মূলের সহিত দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আরবী

সূরতু-ল্-ফাতিহহ্ (ক্বারী বা কোরান-পাঠকগণের পদ্ধতি অনুসারে বাক্যান্তস্থ হ্রস্ব স্বর অনুচ্চারিত রাখা গেল)।

بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم

مالك يوم الدين * إياك نعبد و إياك نستعين *

اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم * غير المغضوب

عليهم ولا الضالين * آمين *

বি-স্মি-ল্-লাহি-র্-রহ্‌মানি-র্-রহীম্ * 'অল্-হম্‌দু লিল্লাহি রব্বি-ল্-‘আলমীন্ * 'অর্-রহ্‌মানি-র্-রহীম্ * মালিকি য়ৱ্‌মি-দ্-দীন্ * 'ইয়্যাক নৎবুদু, ব'ইয়্যাক নস্তৎঈন্ * 'ইহ্‌দিনা-স্-সিরাত্‌-ল্-মুস্তক্বীম্ * সিরাত্‌-ল্-লধীন 'অন্‌ৎঅম্‌ত ৎঅলয়্‌হিম্ ঘৈর্‌রি-ল্-মগ্‌দূবি ৎঅলয়্‌হিম্ ৱ লা-দ্-দ্বাল্লীন্ * আমীন।

অল্-মুৎঅল্লক্বতু 'ইম্‌রু'ই-ল্-ক্বয়্‌সি—

قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل * بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها * لما نسجتها من جنوب و شمأل

ক্বিফা-নব্‌কি মিন ধিক্‌রা হবীবিন্ ৱ মন্‌জিলি,
বিসক্ব্‌তি' লিল্‌ৱা বয়্‌ন-দ্-দখূলি ফহৌমলি।
ফ-তূদ্বিহ্ ফ-ল্-মক্ব্‌রাতি লম্ য়ৎফু রস্‌মুহা,
লিমা নসজত্‌হা মিন জনূবিন্ ৱ শম্'অলি॥

ফারসী

গ়জ়ল্-ই-শম্স্-ই-তব্রীজ়ী (জলালু-দ্-দীন্ রূমী)

چه تدبیر ای مسلمانان که من خودرا نه میدانم
نه ترسا و یهودیئم نه گبرم نی مسلمانم *

نه شرقیئم نه غربیئم نه بحریئم نه بریئم
نه از ملک عراقیئم نه از خاک خراسانم *

هو الاول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن
بجز موجود یا من هو دگر چیزي نمیدانم *

مکانم لامکان باشد نشانم بینشان باشد
نه تن باشد نه جان باشد که من خود جان جانا نم *

نه از عرشم نه از فرشم نه از جنت نه از دوزخ
نه از آدم نه از حوا نه از فردوس رضوانم *

الایا شمس تبریزی چرا مستی در این عالم
بجز مستي و مدهوشی دگر چیزی نمیدانم *

চি তদ্‌বীর্, অয়্ মুস্‌ল্‌মানান্? কি মন্ খ়ুদ্-রা ন-মীদানম্।
ন অজ়্ তর্সা ৱ য়হূদীয়ম্, ন গব্‌রম্ ন-ঈ মুস্‌ল্‌মানম্॥
ন শর্‌ক়ীয়ম্ ন গ়র্‌বীয়ম্, ন বহ্‌রীয়ম্ ন বর্‌রীয়ম্,
ন অজ়্ মুল্ক্-ই-‘ইরাক়ীয়ম্, ন অজ়্ খ়াক্-ই-খ়ুরাসানম্।
“হুৱ-ল্-অৱ্‌ৱল্, হুৱ-ল্-আখ়িৰ্, হুৱ-জ়্-জ়াহির্ হুৱ-ল-বাত়িন্”;
বিজুজ়্ “মওজুদ্ য়া মন্ হু”—দিগর্ চীজ়ী ন-মীদানম্॥
মকানম্ লা-মকান্ বাশদ্; নিশানম্ বী-নিশান্ বাশদ্;
ন তন্ বাশদ্, ন জান্ বাশদ্, কি মন্ খ়ুদ্ জান্-ই-জানানম্॥
ন অজ়্ ‘অর্শম্, ন অজ়্ ফ়র্শম্, ন অজ়্ জন্নৎ, ন অজ়্ দূজ়খ়্;
ন অজ়্ আদম্ ন অজ়্ হৱ্‌ৱা, ন অজ়্ ফ়িরদওস্-ই-রিজ়্‌ৱানম্॥
ইলায়া-ই শম্‌স্-ই-তব্রীজ়ী, চিরা মস্তী দর্ ঈন্ ‘আলম্?
বিজুজ়্ মস্তী ৱ মদ্‌হুশী-দিগর্ চীজ়ী ন-মীদানম্॥

উর্দু

রুব্‌ৎআয়াৎ-ই-হালী ।

کانٹا ہی ہریک جگر میں اٹکا تیرا
حلقہ ہی ہریک گوش میں لٹکا تیرا
مانا نہیں جس نے تجھہ کو جانا ہی ضرور
بھٹکے ہوے دل میں بہی ہی کھٹکا تیرا

কাঁটা হৈ হর্-ইক্ জিগর্-মেঁ অট্কা তেরা ;
হলক্বহ্ হৈ হর্-ইক্ গোশ্-মেঁ লট্কা তেরা ।
মানা নহীঁ জিস্ নে তুঝ্ কো জানা হৈ জ়রূর্ ;
ভট্কে হুএ দিল্-মেঁ ভী হৈ খট্কা তেরা ।

ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا
آتش پہ مغاں نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے
انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

হিন্দুনে সনম্-মেঁ জল্ৱহ্ পায়া তেরা ;
আতিশ্-প মুগ়ান্-নে রাগ্ গায়া তেরা ।
দহ্‌রী-নে কিয়া দহর্-সে তৎবীর্ তুঝে ;
ইন্‌কার্ কিসী-সে বন্ ন আয়া তেরা ।

ہندو سے لڑیں نہ گبر سے بیر کریں
شر سے بچیں اور شر کی عوض خیر کریں

جو کہتے ہیں یہ کہ ہی جہنم دنیا
وہ آئیں اور اِس بہشت کی سیر کریں

হিন্দু-সে লড়েঁ ন গব্‌র্-সে বৈর্ করেঁ—
শর্-সে বচেঁ, ঔর্ শর্-কে ৎইবজ় খৈর্ করেঁ—
জো কহ্‌তে হৈঁ য়িহ্, কি ‘হৈ জহন্নম্ দুনিয়া’—
ৱুহ্ আএঁ, ঔর ইস্ বিহিশ্‌ৎ-কী সৈর্ করেঁ ।

ہی عشق طبیب دل کے بیماروں کا
یا کہر ہی وہ خود ہزار آزاروں کا

ہم کچھہ نہیں جانتے - یہ اتنی ہی خبر
یک مشغلہ دلچسپ ہی بیکاروں کا

হৈ ‘ইশ্‌ক্‌ তবীব্‌ দিল্‌-কে বীমারোঁ-কা ?
য়া ঘর্‌ হৈ ব্‌হ্‌ খ্‌দ্‌ হজার্‌ আজারোঁ-কা ?
হম্‌ কুছ্‌ নহীঁ জানতে ; পহ্‌ ইৎনী হৈ খবর্‌—
ইক্‌ মশ্‌গলহ্‌ দিল্‌-চস্প্‌ হৈ বেকারোঁ-কা ।

দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণ

১। দাস বংশ—

قطب الدين ايبک কুত্‌বু-দ্‌-দীন অয়্‌বক্‌

آرام আরাম্‌

التمش অল্‌তমিশ্‌

فيروز ফীরোজ্‌, ফেরোজ্‌

رضيه রজ্বিয়হ্‌, রজিয়হ্‌

بهرام বহ্‌রাম্‌

مسعود মস্‌'উদ্‌

محمود মহ্‌মূদ্‌

بلبن বল্‌বন্‌

كيقباد কৈ কুবাদ্‌

২। খল্‌জী বংশ—

جلال الدين فيروز জলালু-দ্‌-দীন ফীরোজ্‌

ابراهيم (ابرٰهيم) ইব্রাহীম্‌

علاء الدين محمد ‘অলা'উ-দ্‌-দীন্‌ মুহম্মদ্‌

شهاب الدين عمر শিহাবু-দ্‌-দীন্‌ ‘উমর্‌

مبارك মুবারক্‌

ناصرالدين خسرو নাসিরু-দ্‌-দীন্‌ খুস্‌রো

৩। তুগ্‌লক্‌ বংশ—

تغلق তুগ্‌লক্‌

محمد মুহম্মদ্‌

فيروز ফীরোজ্‌

ابوبكر অবূ-বক্‌র্‌

نصرت নস্‌রৎ

تيمور তীমূর, তৈমূর

৪। সৈয়্‌যিদ্‌ বংশ—

خضر খিজ্‌র্‌, খিজর্‌

عالم ‘আলম্‌

৫। লোদী বংশ—

بهلول বহ্‌লোল্‌

سكندر সিকন্দর

৬। আফগান (অফ্‌গান্‌) বংশ—

شير شاه শের শাহ্‌

محمد عادل মুহম্মদ্‌ ‘আদিল্‌

৭। মোগল (মুগল্‌) বংশ—

بابر বাবর্‌

همايون হুমায়ূন্‌

اكبر অক্‌বর্‌

جهانگير জহান্‌-গীর্‌

شاه جهان শাহ্‌-জহান্‌

اورنگزيب عالمگير অওরঙ্গ্‌জেব্‌ ‘আলম-গীর্‌

بهادر বহাদুর্‌

جهاندار জহান্‌-দার্‌

فرخ سير ফর্‌রুখ্‌-সিয়র্‌

احمد অহ্‌মদ্‌

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধ রচনা-কালে প্রেসিডেন্সী কলেজের আরবী ও ফারসীর প্রধান অধ্যাপক মৌলবী শ্রীযুক্ত মুহম্মদ হিদায়ৎ হুসয়্ন্ সাহেব আমাকে বহু সাহায্য করিয়াছেন; আরবী ও ফারসী নামগুলির বানান তিনি দেখিয়া দিয়াছেন, এবং নানা প্রকারে আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন।

'অল্-হমদু লি-ল্লাহি-
-ল্-লধী রহব লি-বল্দিনা-ল্-করীম্
শরফ় তমদ্দুনি দীনি ল্-ইস্লামি-ল্-করীম্;
ব ফতহ ‘অলা-লুসিনতিনা-ল্-হিন্দিয়্যহ,
অধ্-ধখাইরত-ল্-বসী‘অত-ল্-অলফাগি-ল্-‘অরবিয়্যহ,
ব-ল্-খজাইনত-ল্-বহীজত মিন-ল্ কলিমাতি-ল্-ফার্সিয়্যহ॥

ঈন্ রিসালহ্-ই-মুহক্কর্-রা
ব-নাম্-ই-নামী-ই-খুদ্দাম্-ই-হকীকী-
ই-মাদরী-বতন্-ই-মহবূব,
ব ‘উলমা-ই-ঊ শান্,
কি অজ় জ়বান-ই-রূশন্-ও-শীরীন্-ই-বঙ্গলহ
মুহব্বৎ ও উল্ফৎ দারন্দ,
জ়ীনৎ বখ্শীদম্॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়